গান্ধীজীর

অর্থনৈতিক দর্শন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক: শ্রীশক্তিরঞ্জন বসু
সম্পাদক, গান্ধী স্মারক নিধি (বাংলা)
১৪, রিভারসাইড রোড,
বারাকপুর (২৪-পরগনা)

কলিকাতা কেন্দ্র:
প্রকাশন বিভাগ, গান্ধী স্মারক নিধি (বাংলা)
১২ডি, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬

প্রকাশকাল: জানুয়ারী, ১৯৬৫

মুদ্রক: শ্রীমণীন্দ্রকুমার সরকার
ব্রাহ্ম মিশন প্রেস
২১১—১, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

গান্ধীজীর অর্থনৈতিক দর্শন

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর ইতিহাসে গান্ধীজীর চিন্তা ও কর্মের অবদান কালের প্রবাহের সঙ্গে ক্রমেই সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হচ্ছে। বাল্যকালের মোহনদাসের মানসপটে সত্য ও অহিংসার বীজ যেভাবে অঙ্কুরিত হয়েছিল, পরিণত বয়সে সেই বিশ্বাসবীজ পরিপুষ্ট ও পরিবর্ধিত হয়ে বিশ্বমানবের মনেও চিন্তার আলোড়ন তুলল। সেইজন্য গান্ধীচিন্তা আজ বিশ্বকোষে এক নতুন অধ্যায়রূপে পরিগণিত হতে চলেছে।

গান্ধীজীর জীবন ও কর্মধারার ব্যাপক বিশ্লেষণ করলে যে কোন গবেষকের নিকটেই এটা স্পষ্ট হবে যে, সত্য ও অহিংসা এই দুই মূল মন্ত্র তাঁর জীবনসাধনাকে কত গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। শুধু তাই নয়। ক্ষেত্রবিশেষে তাঁর জীবন ও কর্মধারাকে নতুন ছাঁচে রূপায়িত করেছে। তাই গান্ধীজীর বাহ্যিক কর্ম ও আচরণের মধ্যে সাধারণ লোকচক্ষুতে হয়ত অনেক সময় নানা অসঙ্গতি ধরা পড়ে। কিন্তু গবেষণার দৃষ্টিতে দেখলে ধরা পড়বে এর অন্তর্নিহিত কারণ। রাষ্ট্রীয় জীবনের নানা আন্দোলনের আবর্তে সারা দেশ যখন ভীষণভাবে মথিত হয়েছে, লোকনেতা গান্ধীজী তখন তাঁর বিবেকের নির্দেশ বা নীতির প্রেরণায় নিজের আরব্ধ কর্মধারাকে আচম্বিতে পরিবর্তিত করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নাই। আর এর ফলে তাঁর সঙ্গীসাথী থেকে দেশের আপামর জনসাধারণ সকলে তাঁকে ভুল বুঝেছে বারে বারে। কেন না গান্ধীজীর ন্যায় ইতিহাসস্রষ্টা তথা যুগপুরুষেরা সর্বদাই অন্তরের নির্দেশে কাজ করে যান। নিজের কোন ভুল বা ত্রুটিকে সংশোধিত করে চলেন অবিরত। আর এইভাবে ব্যক্তিজীবন তথা সমাজজীবনকে পরিশুদ্ধ করে চলেন। পুরানো যুগের স্থলে দেখা দেয় নবযুগের। পুরানো সমাজের বদলে নতুন সমাজ। সভ্যতার রথচক্র-

এইভাবে এক পা এক পা করে অনাদি কাল হতে আজ পর্যন্ত নুতনের অভিযান করে চলেছে প্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে।

অহিংসা গান্ধীর নিকট জীবনমন্ত্র স্বরূপ ছিল। কিন্তু এই অহিংসার অর্থ ছিল ব্যাপক। সৃষ্টি ও জীবজগতেও যেমন অলক্ষ্যভাবে অহিংসানীতিরই প্রকাশ যুগ যুগ ধরে কাজ করে চলেছে, তেমনই মানবসমাজেরও ধারকশক্তি হচ্ছে অহিংসা। যাঁরা মনে করেন ইতিহাস শুধুমাত্র যুদ্ধ-বিগ্রহ, নরহত্যা, পররাজ্যলোলুপতার দ্বারা আপ্লুত, তাঁরা ইতিহাসের প্রকৃত শিক্ষা অনুধাবন করেন নাই। মানবসমাজকে যা রক্ষা করে, মিলিত করে তা-ই ইতিহাস। আর ওই সকল হচ্ছে মুলতঃ অহিংসাশক্তিরই বিকশিত রূপ। সমাজের মুলে কল্যাণদায়িনী শক্তি কাজ না করলে আজকের আমাদের অস্তিত্ব কি করে টিকে থাকত সে সম্বন্ধে চিন্তা করা দরকার।

ভারতের ইতিহাসে বহু প্রাচীনকাল হতেই অহিংসার সাধনা চলে আসছে। কিন্তু তা ছিল প্রধানতঃ ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। হয়ত সামাজিক স্তরেও কিছু প্রয়োগ যে হয়নি তা নয়। কিন্তু ব্যাপকভাবে সমাজজীবনের সকল ক্ষেত্রে সচেতনভাবে অহিংসানীতির প্রয়োগকৌশলের শ্রেষ্ঠত্ব ও কৃতিত্বের অধিকারী বোধহয় গান্ধীজীই প্রথম। কোন দেশের রাষ্ট্রিক তথা সামাজিক পরিবর্তনের জন্য অহিংসপন্থায় কর্মনীতি নির্ধারণ করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন গান্ধীজীই প্রথম। আর সে দেশ কোন ক্ষুদ্রদেশ বা একজাতি বা একধর্ম অধ্যুষিত দেশ ছিল না। বহুধাবিভক্ত এই দেশে জাতির সম্মিলিত শক্তিকে অহিংসপন্থায় আন্দোলনের আকারে প্রাণবন্ত করে তোলা কম কথা নয়। রাষ্ট্রনেতা গান্ধীই নানা বাদবিতণ্ডার ঝড় সত্ত্বেও এই পথে পা ফেলার সাহস দেখিয়েছিলেন। "বিশ্বের মঙ্গলের জন্য অহিংসার পরীক্ষায় যদি ভারতের ৪০ কোটি মানুষের জীবন শেষ হয়ে যায় তাতেও আমার কোন দুঃখ নাই। একটি জাতি নিজেকে লুপ্ত করে দিয়ে বিশ্বসমাজকে যদি কল্যাণের পথে প্রতিষ্ঠিত করে তবে মানুষের ইতিহাসই জয়যুক্ত হল" এমন কথা মানবপ্রেমিক গান্ধী অহিংসার একনিষ্ঠ পূজারী বলেই বলতে পারেন।

অহিংসা নীতির সর্বব্যাপক প্রয়োগক্ষমতায় গান্ধীজী মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। আর তিনি যে মুহূর্তে যা বিশ্বাস করতেন, পর-মুহূর্তেই তা প্রয়োগ করার জন্য তৈরি হতেন। সেজন্যই কি রাজনীতির ক্ষেত্রে, কি সামাজিক ক্ষেত্রে, কি আর্থিক ক্ষেত্রে নূতন নূতন ব্যবস্থা প্রয়োগ শুরু করেছিলেন। প্রচলিত ব্যবস্থা হতে তা বিপরীতগামী হওয়ায় অনেকে গান্ধীজীকে পুরাতনপন্থী, সংশোধনবাদী, কল্পনাবিলাসী বলে আখ্যা দিলেন। কিন্তু গান্ধীজী নিজেকে একজন 'বাস্তব আদর্শবাদী' (Practical Idealist) বলে ভাবতেন। কোন কিছু জনসমক্ষে প্রচার করার পূর্বে নিজের জীবনে বা ক্ষুদ্রাকারে তাঁর সৃষ্ট গঠনকর্মকেন্দ্রসমূহে তা প্রয়োগ করে দেখতেন। নিছক কল্পনার উপর নির্ভর করে কোন কিছু প্রচার করা গান্ধীনীতি-বিরোধী কাজ। আর তথাকথিত রাজনৈতিক সুবিধাবাদীদের ন্যায় গান্ধীজী প্রয়োজন-মত হিংসা বা ক্ষেত্রবিশেষে অহিংসাপ্রয়োগের নীতিতে আস্থাশীল ছিলেন না। সেজন্য তিনি অহিংসাকে ভবিষ্যতের হিমাগারে তুলে রেখে বর্তমানের সমস্যা সমাধানের জন্য হিংসার আশ্রয় লওয়াও পছন্দ করতেন না।

এখানেই গান্ধীজীর সঙ্গে তাবৎ রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌দের মৌলিক ব্যবধান। অহিংসা যেখানে পুরাকালে ছিল কেবলমাত্র পরমধর্ম, গান্ধীজী সেখানে তাঁর আজীবন সাধনার দ্বারা অহিংসাকে নিত্যধর্মে পরিণত করার চেষ্টা করে গেছেন। অহিংসার এই সর্বব্যাপক প্রয়োগের দ্বারা তিনি জাতীয় জীবনকে পদানত, শৃঙ্খলিত অবস্থা হতে মুক্ত করে পূর্ণ স্বাধীনতা বা স্বরাজের বীজ বপন করার কাজই করে গেছেন। গান্ধীনীতি অনুধাবনের জন্য এই সার কথাটি সর্বদা স্মরণ রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

রাষ্ট্রনীতির ন্যায় জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রেও তিনি তাঁর এই অহিংসা নীতির প্রয়োগের কথা ভেবেছিলেন। যেমন ভাবনা, তেমনি কাজ। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে নূতন আর্থিক কাঠামো রচনার গাঁটছড়া বেঁধে দিলেন। তাই দেশবাসী অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে স্বদেশীবস্ত্র, স্বদেশীধর্ম প্রভৃতি কর্মনীতির প্রবর্তন

করলেন। কেবল বিদেশী বস্ত্র বর্জন করার চেষ্টাতেই রাষ্ট্রবিপ্লবী গান্ধী ক্ষান্ত থাকলেন না। তন্মুহূর্তেই ভারতের লক্ষ লক্ষ গ্রামে চরখা চালাবার সংকল্পও নিলেন। তাঁর আঠার দফা গঠনকর্মের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, জাতিকে পুরাতন শৃঙ্খলমুক্তির সঙ্গে সঙ্গে নূতন ভিত্তি রচনার ব্রতও গ্রহণ করানো। গঠনকর্মের মধ্যে তাই সামাজিক, আর্থিক, শিক্ষা প্রভৃতি বিবিধ প্রয়োজনীয় উন্নয়ন কাজের নির্দেশ দেওয়া আছে। জীর্ণ-পুরাতনকে ভাঙার সঙ্গে নবনির্মাণের কাজ গান্ধীজী একসঙ্গে চালিয়ে গেছেন। আর্থিক ক্ষেত্রে অহিংসা নীতিকে কার্যকরী রূপ দেবার মানসে তিনি গঠন করলেন একের পর এক সংস্থা : অখিল ভারত চরখা সঙ্ঘ, অঃ ভাঃ গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘ, গো-সেবা সঙ্ঘ, প্রভৃতি। গান্ধীর অর্থনীতির বাস্তব প্রয়োগশালা ছিল ছোট ছোট এই সংস্থাসমূহ।

বৃহৎ যন্ত্র-কেন্দ্রিত প্রচলিত অর্থব্যবস্থা থেকে পৃথক্ করে বুঝবার সুবিধার জন্য গান্ধীজী নিজে তাঁর এই অর্থনীতিকে বলতেন 'অহিংস অর্থনীতি'। এ কথার গভীর তাৎপর্য আছে। আপাতদৃষ্টিতে হিংসা না করার অর্থে অহিংসা শব্দটি প্রযুক্ত হয়। কিন্তু অর্থনীতির ক্ষেত্রে হিংসার অর্থ কি? প্রাণে না মারলেও বা কোন কিছু হত্যা না করলেও যেখানে কোনরূপ আর্থিক শোষণ চলে গান্ধীজীর দৃষ্টিতে তা হিংসারই সামিল। কেন না দেখা যায়, হিংসার উৎপত্তি প্রধানতঃ দুই ভাবে হয় : আর্থিক শোষণ ও রাষ্ট্রীয় শাসন। গান্ধীজী চেয়েছিলেন, শোষণহীন ও শাসনমুক্ত (নিরপেক্ষ) সমাজব্যবস্থা গঠন করতে। কিন্তু যেখানে শাসনের বাঁধন খুব দৃঢ়, রাষ্ট্রশক্তি বীরদর্পে ব্যক্তির উপর অবাধ আধিপত্য বিস্তারের অধিকার করায়ত্ত করেছে, ব্যক্তির স্বাধীনতা যেখানে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের অদম্য প্রতাপে কুণ্ঠিত হয়ে আছে, সেখানে পুঞ্জীভূত হিংসার দাবানল সঞ্চিত হচ্ছে। আজ হোক কাল হোক, বিস্ফোরণ তার হবেই। জগতে পররাজ্যগ্রাস, হানাহানি, রাষ্ট্রীয় অবরোধ প্রভৃতি সংগঠিত হিংসারই নামান্তর নয় কি? ব্যক্তি-স্বাধীনতার একনিষ্ঠ পূজারী মানবপ্রেমিক গান্ধী তাই চিরাচরিত সুসংগঠিত জবরদস্ত রাষ্ট্রব্যবস্থার পহেলা নম্বর বিরোধী। এ সম্বন্ধে গান্ধীজীর এক বিখ্যাত উক্তি আছে :

"রাষ্ট্রের হাতে ক্ষমতাবৃদ্ধিকে আমি সর্বাপেক্ষা ভয়ের চক্ষে দেখি। কেন না, রাষ্ট্রশক্তি শোষণের মাত্রা খর্ব করে আপাতদৃষ্টিতে কল্যাণকারী হলেও সকল প্রগতির মূলে যা আছে মানুষের সেই ব্যক্তিত্বকে বিনাশ করায় মানবজাতির চরম ক্ষতি সাধন করে। সংগঠিতভাবে ও ঘনীভূতরূপে হিংসার প্রতিনিধি হচ্ছে রাষ্ট্র। ব্যক্তির হৃদয় বলে কিছু আছে কিন্তু রাষ্ট্র একটি হৃদয়হীন যন্ত্রবিশেষ। হিংসা হতে এর জন্ম বলে হিংসামুক্ত একে কখনও করা যাবে না।" ১

কিন্তু গান্ধীজী বাস্তববাদী ছিলেন। জাতীয় জীবন উত্তমরূপে স্বনিয়ন্ত্রিত হলে রাষ্ট্রশক্তির প্রতিনিধিত্বের কোনই প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বাস্তববাদী গান্ধীজী জানতেন সেরূপ আদর্শ রাষ্ট্র এখনই হবে না। সেজন্যই থোরোর সেই ঐতিহাসিক অনুশাসন স্বীকার করে বলতেন, সেই রাষ্ট্রই সর্বোত্তম যা সবচেয়ে কম শাসন করে। এ ত গেল একদিক।

এখন হিংসার সূত্রপাতের অপর এক বৃহৎ ক্ষেত্র হচ্ছে আর্থিক শোষণ। জমিতে জোতদার চাষ করাচ্ছেন মজুর কিষাণ দিয়ে। জমিদার (যদিও এখন আর আইনের দৃষ্টিতে তা নাই) প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা নিচ্ছেন আর উপঢৌকন স্বরূপ এটা সেটা আদায় করে আনে তার গোমস্তা। কারখানার মালিক শ্রমিককে তার শ্রমের বিনিময়ে একটা মজুরি দিয়ে বিদায় করছেন, লভ্যাংশ রাখছেন নিজের তহবিলে। এমনকি হাটে বাজারে আমি-আপনি শ্রেণীর ভদ্রবেশী সম্ভ্রান্তগণ নানা দরদস্তুর ও হুমকি দিয়ে যত কমে পারি ততটা কমে জিনিসের দাম দিই। এইভাবে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে শোষণের সূত্রপাত হয়। বুদ্ধিমান শিক্ষিত লোক আফিসে চাকুরী করেন, কি আদালতে ওকালতি করেন, ডাক্তারি করেন। তাঁদের বুদ্ধির মজুরি এক রকম। আর শ্রমিক মাঠে বা কারখানায় গলদঘর্ম শ্রম করে। তাদের মজুরি তুলনায় অনেক কম। অদ্যাবধি আমাদের সমাজে বুদ্ধিশ্রমের মজুরি বেশী। সেজন্যই বুদ্ধিজীবী শ্রমজীবীকে শোষণ করার সুযোগ পান। শ্রমিকের মজুরিই শুধু কম নয়, তার

১ Studies in Gandhism

সামাজিক মর্যাদাও অনেক কম। অবশ্য ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি বিশেষ শ্রেণীর জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা স্বীকৃত হয়েছে। শোষণ হতে হিংসার উৎপত্তি হয়। পৃথিবীর অধুনাকালের ইতিহাসে ভূরি ভূরি প্রমাণ এর স্বপক্ষে আছে। পাশ্চাত্ত্যের অধিবাসীরা বিজ্ঞানের বলে সাম্রাজ্যবাদ কায়েম করল, দেশ বিদেশের বাজার কুক্ষিগত করল, শোষণের স্রোত প্রবাহিত হল—ফলে নানাদিকে যুদ্ধ, সংগ্রাম প্রভৃতি হামেশাই দেখা দিতে লাগল। আমরা যত বেশী সভ্যতার উঁচু স্তম্ভে আরোহণ করছি বলে মনে করছি ততই যেন বুদ্ধিপূর্বক অপর ব্যক্তি, অপর জাতি বা অপর দেশকে শোষণ করার জন্য ফাঁক খুঁজছি।

গান্ধীজী মানবসমাজ হতে শোষণের মুলোৎপাটন করতে চেয়েছিলেন। কারণ, অহিংস সমাজ গঠনের জন্য শোষণহীন আর্থিক ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক। সেইজন্যই তাঁর খাদি ও গ্রামশিল্পের, বিকেন্দ্রিত শিল্পব্যবস্থার পরিকল্পনা, স্বাবলম্বনের উপর গুরুত্বদান। সেজন্যই আধুনিক কালের উন্নত বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের বিরুদ্ধে তাঁর আজীবন সংগ্রাম, বিশেষ করে সেই সব শিল্প যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটির ও গ্রামশিল্পকে পিষ্ট করে ফেলে। আর এ সকলের মুলে কাজ করত এক মহান্ নীতি। মানুষই ছিল তাঁর দৃষ্টিতে প্রধান বিচার্য বিষয়। তাই ওই একটি কষ্টিপাথরে তিনি যাচাই করে দেখতেন যে-কোন মতবাদের যথার্থতা। দেশের অর্ধনগ্ন, দরিদ্র মুক জনতার প্রতিনিধি বলে যিনি নিজেকে সর্বদাই মনে করতেন আর সেভাবে জীবন যাপনের যাঁর আপ্রাণ চেষ্টা ছিল তাঁকে মানুষের ব্যথা-বেদনা সর্বদাই পীড়া দিত। স্বামী বিবেকানন্দ 'দরিদ্র নারায়ণ'[১] শব্দটি প্রবর্তিত করলেন, আর গান্ধীজী বললেন 'হরিজন'

১ মহান্ দেশপ্রেমিক স্বামী বিবেকানন্দের একটি উক্তি স্মরণে আসছে :

"বাস্তব দৃষ্টিতে স্বাদেশিকতার অর্থ কেবলমাত্র ভাবপ্রবণতা নহে, এমনকি জন্মভূমির প্রতি প্রেমভাব নয়। কিন্তু স্বদেশবাসীর প্রতি সেবা মনোভাবই এর প্রকৃত অর্থ। সারা ভারতবর্ষ আমি পদব্রজে ঘুরে স্বচক্ষে আমাদের জনসাধারণের অজ্ঞতা দারিদ্র্য ও নোংরামি দেখেছি। আমার সমস্ত হৃদয় জুড়ে আগুন জ্বলছে কেমন করে এই দুরবস্থার পরিবর্তন করা যায়। কেউ যেন কর্মের কথা না তুলেন। তারা যদি তাদের কর্মদোষে দুর্গতি ভোগ করেন তবে তাদের সেই দুর্দশার লাঘব করাও আমাদের কর্ম। তুমি যদি ঈশ্বর দেখতে চাও তবে মানুষের সেবা কর। নারায়ণের কাছে পৌঁছাবার জন্য তোমাকে দরিদ্রনারায়ণের সেবা করতেই হবে—তারা হচ্ছে ভারতের অনশনক্লিষ্ট লাখ লাখ জনতা।"

(ঈশ্বরের জন)। আর কবির কথায় বললে, 'সবার পিছে, সবার নীচে' যারা পড়ে আছে তাদের কল্যাণচিন্তাই দীনবন্ধু গান্ধীকে নিত্য নূতন কর্মে প্রেরণা সঞ্চার করত। এই প্রসঙ্গে তাঁর এক বিখ্যাত উক্তির কথা মনে হচ্ছে :

"আমি আপনাদের একটি মন্ত্রপূত কবচ দিব। যখনই কোন বিষয়ে সন্দেহের উদ্রেক হবে তখনই এই পরীক্ষাটি প্রয়োগ করবেন। আপনারা স্বচক্ষে দেখেছেন এমন সর্বাপেক্ষা দরিদ্র, সবচেয়ে অসহায় লোকটির মুখ নিজের স্মৃতিপটে দেখুন, আর নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন যে, আপনারা যে ব্যবস্থার কথা চিন্তা করছেন তাতে তার কোন উপকার হবে কি না! এতে তার কি কিছু লাভ হবে? এর দ্বারা সেই ব্যক্তিটি কি তার নিজের জীবন ও ভাগ্যের উপর স্ব-কর্তৃত্ব ফিরে পাবে? অর্থাৎ, এর দ্বারা কি সেই সব ক্ষুধার্ত ও আধ্যাত্মিকতার আলোকবঞ্চিত কোটি কোটি লোকের জন্য স্বরাজের পথ সুগম হবে?

তখনই দেখবেন আপনাদের সকল সন্দেহ ও আত্মাভিমান দূর হয়ে যাচ্ছে।"

অহিংস সমাজ নির্মাণের দুই প্রধান সর্ত শাসন ও শোষণের নাগপাশ হতে মুক্তি সাধন। গান্ধীজীর সংগ্রাম ছিল তাই এই দুই ফ্রণ্টে সমান তালে। অনেকে বর্তমানে আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের জন্য হিংসার পথ গ্রহণে সম্মত নন। যুদ্ধ পরিহার করে শান্তিপূর্ণ পথে সমস্যা সমাধানের জন্য পৃথিবীর তাবৎ বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি আজ প্রায় সহমত। কিন্তু রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আমরা যদি হিংসার আশ্রয় নিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত না হই তবে আন্তঃরাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে পূর্ণ অহিংসা কেমনভাবে আসবে? মূলে হিংসা থাকলে ফলে কিভাবে অহিংসা আসবে? এই স্ববিরোধ আমাদের দূর করার সময় এসেছে। দ্রষ্টা পুরুষ গান্ধীজী এই সংকটের অনুধাবন বহু পূর্বেই করেছিলেন বলে তদনুযায়ী পন্থা অনুসরণের পূর্বভূমিকা তৈরী করে গেছেন। এইজন্য সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের সকল ক্ষেত্রে অহিংসাত্মক পন্থা গ্রহণ না করলে একাঙ্গীভাবে অহিংসার বিচার টিকতে পারে না। শুধু তাই নয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিংসার পরিণামই তো এটম্ ও হাইড্রোজেন

বোমা। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ছোট বন্দুকের গুলি আর বৃহৎ ক্ষেত্রে আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র—এই দুয়ে প্রভেদ গুণগত নয়, মাত্রাগত। সেজন্য যাঁরা 'Total War' বা সর্বাত্মক যুদ্ধ পরিহার করতে চান তাঁদের আজ নিঃসর্তে 'Total Ahimsa' বা সর্বাত্মক অহিংসা গ্রহণ করতে হবে। নান্য পন্থাঃ। এজন্য আমাদের সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গী, চিন্তা, কর্মপ্রণালী, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষাপদ্ধতি, সমাজসংগঠন—এ সব কিছুরই আমূল পরিবর্তন আসা চাই। বিশিষ্ট গান্ধীবাদী নেতা শ্রীধীরেন্দ্র মজুমদারের কথায়, "কোন চৌবাচ্চায় জল ভর্তি করার সাথে যদি নীচে একটি ফুটা দিয়া অনর্গল জল বেরোয় তবে যে অবস্থা দাঁড়াবে ঠিক সেরূপ শিক্ষাদীক্ষায় অহিংসার প্রয়োগ চললেও যদি আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে হিংসা পুরোদমে চলতে থাকে তবে সেই অহিংসা স্থায়ী হবে না।" [বক্তৃতা]

গান্ধীজীর অহিংসার দর্শন তাই এক পূর্ণাঙ্গ দর্শন। তিনি যে অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতির সূত্র বলেছিলেন সে সকলের মূলে একটি উদ্দেশ্যই কাজ করছে। কোনটিই তাই পৃথক্ ভাবে বিচার করা যুক্তিসঙ্গত হবে না।

ভারতের মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন গান্ধীজী। তাই দেশে পুনর্গঠনের কথা ভাববার সময় স্বভাবতঃই গ্রামীণ ভারতের রূপ তাঁর মানসপটে উদিত হত। গ্রামময় যে দেশ ভারত, সেই অবহেলিত, দুঃস্থ গ্রামবাসীদের বাদ দিয়ে তিনি আর কিছুই যেন কল্পনা করতে পারতেন না। সেজন্য তিনি গ্রামকেন্দ্রিক সভ্যতার বর্ণনা প্রসঙ্গে গ্রামস্বরাজের কথা অহরহ বলেছেন। তবে গান্ধীজীর সেই আদর্শ সমাজব্যবস্থায় গ্রামগুলি কেমনভাবে অবস্থান করবে সে এক প্রধান প্রশ্ন। তিনি যে ধ্যানের ভারতের কল্পনা দিয়ে গেছেন তা এই আদর্শ গ্রামস্বরাজ গঠনের মধ্যেই নিহিত আছে। তিনি যে আধুনিক সভ্যতার অঙ্গস্বরূপ যন্ত্রের একাধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের খড়্গ তুলেছিলেন তার মূল কথাই ছিল এই সব নিরন্ন, অসহায় গ্রামবাসী ও গ্রামসমূহের পুনর্গঠন ; যাতে করে পরিণামে গ্রামগুলি শহরের শোষণকুণ্ডে পর্যবসিত না হয়, যথাযোগ্য সমাদরে উভয়ের মধ্যে

একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপিত করা যায়। গ্রাম-গুলিকে দিনের পর দিন জীর্ণশীর্ণ মানবদেহের নরককুণ্ডে পরিণত করার পরিবর্তে গান্ধীজী চেয়েছিলেন স্বাবলম্বী, স্বাধীন গ্রাম-গণতন্ত্র গঠন করতে যার উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে দেশের বৃহত্তর সমাজ। গ্রামশিল্পকে ধ্বংস করে, গ্রামস্বাস্থ্যকে জাহান্নমে পাঠিয়ে, গ্রাম-সমাজকে নির্মূল করে দিয়ে কেমন করে সুস্থ স্বাধীন স্বাবলম্বী গ্রাম নির্মাণ সম্ভব হবে? সেইজন্যই গান্ধীজী গ্রামজীবন পুনরুদ্ধারের জন্য আমরণ ব্রত নিয়ে সংগ্রাম করে গেছেন।

অপরদিকে যিনি কোনপ্রকার আর্থিক শোষণ বরদাস্ত করেন নাই সেই অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষিত গান্ধীর কাছে এ কথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছিল যে, যন্ত্রসভ্যতার উপর অহিংসার ভিত্তি নির্মাণ কখনই সম্ভব নয়। কিন্তু আত্মনির্ভরশীল গ্রামসমাজের উপর তা সম্ভব। সেইজন্য তিনি বলেছেন:

"আমার কল্পনা অনুযায়ী গ্রামীণ অর্থনীতি শোষণ একেবারে পরিত্যাগ করে; কেন না শোষণই হচ্ছে হিংসার মর্মকথা। সেই জন্য আপনাদের অহিংস হওয়ার আগে গ্রামমুখী মনোভাব গড়ে তুলতে হবে; আর গ্রামমুখী মনোবৃত্তির জন্য চরখায় আপনাকে বিশ্বাস রাখতে হবে।" (হরিজন, ৪-১১-৩৯)

গান্ধীজীর সমাজদর্শন, রাষ্ট্রীয় দর্শন, আর্থনীতিক চিন্তা সম্বন্ধে পরিপূর্ণ বিচার বিশ্লেষণ করার জন্য উপরিউক্ত মৌলিক সূত্রগুলিকে চোখের সামনে রেখে অগ্রসর হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। অবশ্য কেউ যদি এই সব মৌলিক সূত্রগুলির সঙ্গে সহমত না হন তবে তা ভিন্ন কথা। অহিংসার বিকাশের জন্য গ্রামস্বরাজ, গ্রামস্বরাজ নির্মাণের জন্য আর্থিক শোষণ তথা রাষ্ট্রীয় শাসনের পরিহার, আর তজ্জন্য চরখা, গ্রামশিল্প, বুনিয়াদী শিক্ষা, সামাজিক সমতা প্রভৃতি কার্যক্রম যেন একই সূত্রে বাঁধা। যার কেন্দ্রবিন্দু একটি। সেই বিন্দুকে কেন্দ্র করেই গান্ধী-চিন্তার সমগ্রবৃত্ত আবর্তিত হচ্ছে। সেই কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে সত্য ও অহিংসা। আদিকালের পুরনো নীতি কথা, কিন্তু যুগোপযোগী রসায়নে পরিশুদ্ধ ও পরিবর্ধিত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গান্ধীজীর অর্থনীতির মূলসূত্র

(১) অন্ত্যোদয়ের ভাবনা

সত্য, অহিংসা, ন্যায়নীতি, মানবতাবোধ প্রভৃতি গুণের উপর ভিত্তি করে গান্ধীজী যে নূতন সমাজ রচনার কল্পনা করেছিলেন তা অনেকাংশে আধুনিক অর্থকেন্দ্রিক, প্রতিযোগী সমাজব্যবস্থা হতে পৃথক্। আর সে পার্থক্য মৌলিক। যে অর্থনীতির সঙ্গে ন্যায়নীতির কোন সম্পর্ক নাই, যে আর্থিক ব্যবস্থা সমাজে আর্থিক বৈষম্য তথা সামাজিক অসাম্যের সৃষ্টি করে চলে, যে অর্থব্যবস্থায় সমাজের দুর্বলতম লোকটির পূর্ণ বিকাশের কোন সুযোগ নাই, যে ব্যবস্থায় জীবন হতে অর্থ বড়, প্রতিযোগিতাই যে ব্যবস্থার মূল কথা, এমন হৃদয়হীন আর্থিক ব্যবস্থা মানবপ্রেমিক গান্ধী কখনই সহ্য করেন নাই। সেইজন্য আধুনিক সভ্যতার তথাকথিত অনেক কিছু উন্নতির পদ্ধতির বিরুদ্ধে তিনি দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। আর এজন্যই বহুজনে আপাতদৃষ্টিতে গান্ধীজীকে পুরাতনপন্থী, মধ্যযুগের মানুষ বলে অভিহিত করতে কুণ্ঠিত হন নাই।

গান্ধীজী সমাজের সকল মানুষের কল্যাণকামী ছিলেন। সকলের কল্যাণ, সকলের উদয় হোক এরূপ এক সর্বোদয় সমাজ রচনাই ছিল তাঁর কাম্য। সভ্যতার ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মানব-বিকাশের ধারায় প্রথম নীতি ছিল আপনি বাঁচ, নিজেকে বাঁচাও। আপনার উন্নতি বিধান করাই ছিল একমাত্র ধ্যেয়। সমাজের দ্বিতীয় বিধান হল—অধিকতমের কল্যাণ সাধন। সমাজবদ্ধ মানুষ অনুভব করল যে, নিজের পূর্ণ বিকাশ ও উন্নতির জন্যও অপরের সহযোগিতার বিশেষ প্রয়োজন হয়। সেজন্য তখন মানুষের দৃষ্টি বৃহত্তর জনসমষ্টির কল্যাণের প্রতিও আকৃষ্ট হল। কিন্তু অধিকতমের কল্যাণভাবনার মধ্যেও স্বল্পতম কিছু বাদ থেকে যায়। সেইজন্য আধুনিকতম চিন্তা হবে সকলের কল্যাণ বা সর্বোদয়। অর্থাৎ, আমিও বাঁচব, তুমিও বাঁচবে কেবলমাত্র তাই নয়। আমার বাঁচার প্রচেষ্টা যেন সমাজের

অপর প্রতিবেশী, দুর্বলতম মানুষটির বাঁচার পথে বাধকস্বরূপ না হয়। আমার কল্যাণভাবনা যেন অপরের অকল্যাণের উপর নির্ভরশীল না হয়। পৃথিবীর আধুনিক কালের শিল্পায়নের ইতিহাস, ঔপনিবেশিকতার ইতিহাস এইভাবে দুর্বল, অসহায় মানবগোষ্ঠীর শোষণ ও অত্যাচারের উপরেই যে কেন্দ্রিত তা কে না জানে? গান্ধীজী এরূপ আর্থিক উন্নতির বিন্দুমাত্র সমর্থক ছিলেন না। সেইজন্য তাঁর পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থায় আত্মনির্ভরশীলতা, সর্বপ্রকারের শোষণমূলক ব্যবস্থা পরিত্যাগ করার উপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

সর্বোদয়ের এই মহান্ ভাবনা গান্ধীজীর মনে কেমনভাবে এল? এই প্রসঙ্গে সে কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন তাঁর সহকর্মী বন্ধু মিঃ পোলক একবার রাত্রে ট্রেনে পড়ার জন্য রাসকিনের লেখা 'আন্‌টু দিস্ লাস্ট' নামে বইটি দিয়েছিলেন। পরে সেই বইখানি গান্ধীজী গুজরাটিতে অনুবাদ করে নাম দিলেন 'সর্বোদয়'। গান্ধীজীর জীবন ও চিন্তাধারাকে এই বইটি এমন গভীরভাবে প্রভাবিত করল যে তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "প্রভাতে ঘুম ভাঙার সঙ্গে এই প্রতিজ্ঞা নিয়েই উঠলাম যে, জীবনে এই নীতিকে রূপায়িত করতে হবে।"[১] দেখা যায়, গান্ধীজীর আর্থিক ও সামাজিক চিন্তাধারা বহুলাংশে এর দ্বারা গঠিত হয়েছে।

কাকাসাহেব কালেলকার একদা গান্ধীজীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "সর্বোদয় কেমনভাবে হবে?" উত্তরে তিনি বলেন, "অন্ত্যোদয়ের দ্বারা।" অর্থাৎ, সমাজের দীনতম মানুষটির, সবশেষের লোকটির উদয় বা কল্যাণ প্রথমে হওয়া চাই। মহামতি রাসকিন একেই বলেছেন, 'আন্‌টু দিস্ লাস্ট।' তাই সর্বোদয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে সবহারাদের অভিষেকের দ্বারা। গান্ধীজীর আর্থিক চিন্তায় এই অন্ত্যোদয়ের ভাবনাই সর্বত্র রূপায়িত করার চেষ্টা হয়েছে। আর বর্তমান কালের পরিকল্পিত অর্থনীতি তথা প্রগতির মূলে আমরা যদি সবশেষের লোকটির কল্যাণের কথা সর্বপ্রথমে না ভাবি তবে সমাজ

১ গান্ধীজীবনী, ১৮শ অধ্যায়

হতে আর্থিক বৈষম্য কেমনভাবে দূর হবে? সেজন্য সকলের কল্যাণ-মূলক কোন উন্নয়নকর্মের প্রথম পদক্ষেপ শুরু হবে সর্বশেষের ব্যক্তিটির কল্যাণ সাধনের দ্বারা। সরকারী ব্যবস্থাতেও যদি এই অন্ত্যোদয়ের নীতিকে ফলবতী করার চেষ্টা করা হয় তবে পরিকল্পনার এক দশকের অধিক কাল পরেও ভারতের গ্রামীণ জনতার সীমাহীন ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের চিত্র অন্যরূপ গ্রহণ করত। দ্বিতীয় কৃষি-শ্রমিক অনুসন্ধান কমিটীর রিপোর্টই তার উজ্জ্বল প্রমাণ।

রাসকিনের এই গ্রন্থের ভিত্তি হচ্ছে বাইবেলে বর্ণিত একটি নীতিমূলক কাহিনী (Parable)[১]। এই কাহিনীর মূলগত তত্ত্ব হচ্ছে, ভগবানের রাজ্যে কোন ভেদভাব নাই, সকলেই সমান। 'প্রত্যেকের নিকট হতে তার সামর্থ্য অনুযায়ী গ্রহণীয় এবং প্রত্যেককে তার প্রয়োজন অনুযায়ী দেয়'—এই নীতিই হবে আর্থিক ও সামাজিক সাম্যের নীতি। যে কোন দেশের সমাজব্যবস্থার পুনর্গঠনের জন্য যে নীতিটি সর্বপ্রথমে প্রতিপালিত হওয়া উচিত তা হচ্ছে অন্ত্যোদয়ের নীতি। না হলে আর্থিক উন্নয়নের প্রগতিরেখা ঊর্ধ্বমুখী হলেও দেখা যায় সমাজের দুর্বল অংশ, অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকেদের তেমন কোনই উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না। ভারতবর্ষেও ঠিক আর্থিক উন্নয়নের সূচীতে এই সংকট প্রতিফলিত হয়েছে যা বিভিন্ন সরকারী অনুসন্ধান কমিটীর রিপোর্টেই উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় কৃষি-শ্রমিক অনুসন্ধান কমিটীর রিপোর্টে প্রকাশ যে, কৃষি-শ্রমিক পরিবারের মাথাপিছু বার্ষিক আয় ১৯৫০-৫১ সনে যেখানে ছিল ১০৪ টাকা, ১৯৫৬-৫৭ সালে তা কমে হয়েছে ৯৯'৮ টাকা। ১৯৫৬-৫৭ সালে ভারতের জাতীয় আয় মাথাপিছু ছিল ২৯১'৫ টাকা। অর্থাৎ, গড় জাতীয় আয়ের মাত্র ৩৪ শতাংশ ছিল কৃষি-শ্রমিকের আয়। তাছাড়া, শহরবাসীদের আয় প্রথম পরিকল্পনা কালে ৬০০ টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৮০০ টাকা হল। আর দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে তা আরও বৃদ্ধি পেয়ে ১২০০ টাকা পর্যন্ত হতে পারে। অপরদিকে, গ্রামবাসীদের

১ গান্ধীজীবনী, ১৮শ অধ্যায়

আয় ক্রমেই কমে আসছে। প্রথম পরিকল্পনা কালে মাথাপিছু আয় ১০৪ টাকা হতে ৯০ টাকায় দাঁড়ায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনা শেষে আরও কমে ৮০ টাকা হতে পারে। এর চেয়েও মর্মান্তিক বেদনাদায়ক অবস্থা আর কী হতে পারে? সরকার আজ তাই নেহাৎ উপায়ান্তর না দেখে গ্রামের কৃষক ও পল্লীশিল্পের উন্নতির জন্য নতুন পথের সন্ধানে ব্যাপৃত রয়েছে। দেরীতে হলেও অন্ত্যোদয়ের এই অগ্রাধিকার আজ জাতীয় অর্থনীতিতে স্বীকৃত না হলে সংকট যে আরও ঘনীভূত হবে তা নিঃসন্দেহ।

এখন দেখা যাক, 'আনটু দিস্ লাস্ট' গ্রন্থে নতুন সমাজব্যবস্থার জন্য মৌলনীতিগুলি কি কি? গান্ধীজী যে আদর্শ সমাজের কল্পনা করেছিলেন তার মূলেও কি এই যুগান্তকারী নীতিগুলি বিধৃত হয় নাই?

(১) সমষ্টির কল্যাণেই ব্যক্তির কল্যাণ নিহিত।

(২) একজন উকিল ও একজন নাপিতের কাজের মূল্য সমান হওয়া উচিত।

(৩) শ্রমের জীবন, অর্থাৎ ভূমিচাষী ও হস্তশিল্পীর জীবনই যোগ্য জীবন।

প্রথম নীতিটির বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, বর্তমানে যেখানে ব্যক্তির কল্যাণ বা উন্নতির জন্য অপরের হিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয় না, ধনীর ধন যেখানে ক্রমবৃদ্ধিহারে বেড়ে গরীবকে আরও গরীব অসহায়কে আরও অসহায় করে, স্বল্পভূমিবান চাষীকে ভূমিহীন মজুরে পরিণত করে, সেখানে এই মানবধ্বংসী কুনীতির বদলে আমরা চাই একের কল্যাণের ফলে যেন সমাজের অপর কারও কোনরূপ অকল্যাণের সূচনা না হয়। একের হিতে সকলের হিত; একের দুঃখে সকলের দুঃখ। এইরূপ সমাজবিধানই সর্বোদয় সমাজ গঠনের সহায়ক—বিশেষ করে আর্থিক ব্যাপারে। কেন না, আর্থিক ক্ষেত্রে সমাজব্যবস্থায় যদি কোন প্রকারের শোষণ তথা অসাম্য অনুপ্রবেশ করার সহজ রন্ধ্রপথ পায় তবে সর্বোদয় সমাজ গঠনের পথে তা প্রতিকূল হবে। সেইজন্য সর্বদাই আমাদের

শোষণ ও অসাম্য সৃষ্টির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চোরাপথগুলিতে সদাজাগ্রত দৃষ্টি রাখতে হবে।

দ্বিতীয় নীতিটির অর্থ এই যে, উকিলকে মনে করা হয়েছে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ; আর নাপিতকে শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি।

বর্তমান সমাজ দ্বিধাবিভক্ত—বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবী এই দুই ভাগে। বুদ্ধির প্রাধান্য শ্রমের উপরে। বুদ্ধির মর্যাদা সমধিক। তাই না আজ আমাদের এত অবনতি। শ্রমিক ক্লিষ্ট অবনত পিষ্ট জীবন যাপনে বাধ্য হয়। আর বুদ্ধিজীবী শিক্ষক, কেরানী, উকিল, অফিসার প্রভৃতি সকলে তাদের শ্রমের ফসলে সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন যাপনের সুযোগ লাভ করে। যে সমাজে শ্রমের মর্যাদা নাই, শরীরশ্রম ও বুদ্ধিশ্রমের মজুরির সমানতা নাই, সেখানে শ্রমিকের অভ্যুদয়, শিল্পীর উত্থান, কিষাণের আত্মমর্যাদা প্রভৃতি কোথা হতে আসবে? যে কোন অর্থনীতির ছাত্র বুঝতে পারবেন কোনকিছুর উৎপাদনে শ্রমের অপরিহার্যতার কথা। কিন্তু আমরা যদি আজও আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় শ্রমের সেই সমমর্যাদা না দিই তবে রোমান সাম্রাজ্যের ঐতিহাসিক পতনের ন্যায় আমাদেরও জাতি হিসাবে অস্তিত্ব হয়ত চিরস্থায়ী হবে না। ঐতিহাসিক গাবন লিখেছেন, "রোমান জাতি শরীরশ্রমকে অত্যন্ত হীন বলে গণ্য করত।" রোম সাম্রাজ্যের ন্যায় সুসভ্য দেশেও নাগরিকগণের এই শ্রমবিমুখতাই ঐশ্বর্যশালী রোম সাম্রাজ্যের পতনের কারণ।

শোষণহীন সমাজ রচনার জন্য শ্রমের যথাযোগ্য মর্যাদা পাওয়া চাই। গান্ধীজী সেইজন্য যে কোনরূপ উৎপাদক শ্রমকে এই যুগে দেব-আরাধনার ন্যায় পবিত্র কর্ম বলে মনে করতেন। শিক্ষিতের মধ্যে তাই আজ শ্রমের পূর্ণ অভিষেকের প্রয়োজন। গান্ধীজী তাই তাঁর নয়ী তালিম শিক্ষাবিজ্ঞানে উৎপাদক শ্রমকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে গণ্য করার বৈপ্লবিক প্রস্তাব করেছিলেন। আমাদের দেশে স্বাধীনতার পরের অবস্থাই দেখুন। উচ্চশিক্ষিত হওয়া মানে শ্রমের অভ্যাস হতে দূরে সরে যাওয়া। যে দেশের সাধারণ শিক্ষাপদ্ধতিতে কোনরূপ

উৎপাদনমূলক শরীরশ্রমের ব্যবস্থা নাই, সে সমাজে উৎপাদন বৃদ্ধি হবে কোথা হতে? কারণ আজ অবস্থা এমনই দুঃখজনক যে শিক্ষাদেবীর সঙ্গে শ্রমদেবীর কোন সম্বন্ধ না থাকায় শ্রমজীবীরাও তাদের সন্তানসন্ততিদের শিক্ষিত করবার উদ্দেশ্যে ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। না হলে তাদের সামাজিক মর্যাদা আজ কোথায়? কোন স্বাধীন দেশের অবস্থা যদি এরূপ হয় যে, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য অপর দেশের উপর নির্ভরশীল হতে হয় তবে সে স্বাধীনতা কতদিনের স্থায়িত্ব লাভ করবে? কেন না, আর্থিক পরাধীনতা বর্তমানযুগে রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার পূর্বাভাষ। ভারতের বর্তমান অবস্থায় তাই শিক্ষা, আর্থিক ব্যবস্থা প্রভৃতি সর্বস্তরে শ্রমের, বিশেষ করে উৎপাদক শ্রমের (Productive Labour) পূর্ণ অভিষেক হওয়া বাঞ্ছনায়। বুদ্ধি ও শ্রমের একাঙ্গী ব্যবহার হলে হবে না। আজ তো যে শ্রমিক সে যেমন শ্রমের ব্যবহার করে, তেমনই যে বুদ্ধিমান লেখক, উকিল, অফিসার তারা কেবলমাত্র বুদ্ধির কর্ষণ করে; ফলে সমাজে উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় না থেকে এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ ও অশান্তি দেখা দিচ্ছে। সেইজন্য বুদ্ধিজীবীকে শ্রমের ও শ্রমজীবীকে বুদ্ধির কর্ষণ করতে হবে। এতে উভয়ে যেমন লাভবান হবে, সমাজও তেমনি সুখী ও সমৃদ্ধিশালী হবে। এই উভয়ের মিলন, উভয়ের বিকাশ হলে সামাজিক শান্তি অটুট থাকে। গান্ধীজীর দৃষ্টিতে সমাজ সংগঠনে তাই শ্রমের উপর যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। বুদ্ধিপূর্বক শ্রমের তিনি ছিলেন পূজারী।

আর সকলপ্রকার শ্রমের মধ্যে ভূমিচাষী ও হস্তশিল্পীর শ্রমকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। কেন না, মর্যাদাসম্পন্ন স্বতন্ত্র জীবন বিকাশের পক্ষে কৃষিকাজ ও হস্তশিল্পের স্থান সর্বোচ্চ।

রাসকিনের এই তিন মহান্ নীতি গান্ধীজীর আথিক চিন্তাধারাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। তাঁর গঠনকর্ম পরিকল্পনায় তাই খাদি গ্রামোদ্যোগ, আর্থিক সমতা প্রভৃতি কর্মপন্থা রূপায়ণের জন্য গান্ধীজী বিভিন্ন অখিল ভারতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে তাদের উপর যাবতীয় দায়িত্ব অর্পণের ব্যবস্থা করেছিলেন

বিকেন্দ্রিত উৎপাদন

গান্ধীজীর অর্থনীতির দ্বিতীয় মূলসূত্র বলা যায় শোষণহীন উৎপাদন তথা সমাজ রচনা। অবশ্য এখানে বলে রাখা ভাল যে, এই সূত্রগুলি যেভাবে বলা হচ্ছে তা তার নিজস্ব গুরুত্বের কোনরূপ কম-বেশীর ভিত্তি করে নয়। সাধারণভাবে তা কথিত হচ্ছে।

পূর্বেই যেমন উল্লেখ করা হয়েছে যে, গান্ধীজী যে অহিংস সমাজের কল্পনা করতেন তার মূল ভিত্তি নিহিত রয়েছে আর্থিক শোষণ ও রাষ্ট্রীয় শাসনরূপ নাগপাশ হতে মুক্তির মধ্যে। বাস্তবিকপক্ষে আধুনিক কালের যান্ত্রিক প্রগতি, বৃহৎ শিল্প, বৈজ্ঞানিক প্রগতি প্রভৃতির বিরুদ্ধে গান্ধীজী অনেক সময় যে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলেছিলেন তার প্রকৃত কারণ এই ছিল যে, তিনি চাইতেন সকল প্রকার শোষণের মূলোৎপাটন করতে। বিজ্ঞানকে গ্রহণ করার মানে এই নয় যে, আপন দেশের সমাজ ও কৃষ্টির বৈশিষ্ট্য ভুলে গিয়ে নির্বিচারে অন্য দেশকে অনুসরণ করা। ইউরোপেও দেখা যায়, এক দেশের পদ্ধতি অন্য দেশ হতে ভিন্ন। তাই তারা বৈজ্ঞানিক। গান্ধীজী ছিলেন সেইরূপ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ। বিজ্ঞানের বলে এক দেশ অন্য দেশকে বা এক জাতি অন্য জাতিকে নির্বিচারে শোষণ করবে ও শাসন করবে গান্ধীজী ছিলেন তার বিরোধী। বিজ্ঞানের যথাযথ প্রয়োগ তিনি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করলেও বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ বা তজ্জনিত অন্যায় শোষণ কখনই বরদাস্ত করতে পারতেন না। সেজন্যই তিনি আধুনিক নানাবিধ সুখসুবিধা সমূহকে একবাক্যে বর্জন করার কথা বলতেন, যখন দেখতেন তা অপরকে শোষণ করার উপরেই নির্ভরশীল। গান্ধীদর্শন তাই বিজ্ঞানবিরোধী নয়, তা শোষণ ও শাসন বিরোধী।

আধুনিক শিল্পবাদ (Industrialism) মূলতঃ পররাজ্যের সম্পদ শোষণের উপরেই নির্ভরশীল। তাই মানবপ্রেমিক গান্ধী শিল্পবাদের এই নগ্ন বীভৎসরূপের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন :

"আমার ভয় হয় আধুনিক শিল্পবাদ মানবসমাজের নিকট

অভিশাপ স্বরূপ হতে বসেছে। শিল্পবাদ সম্পূর্ণরূপে অপরকে শোষণ করার ক্ষমতার উপরেই বেঁচে থাকে। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষ শিল্পায়িত হলে অবশ্যম্ভাবী পরিণামস্বরূপ যখন সে অপরকে শোষণ করতে শুরু করবে তখন সারা বিশ্বের পক্ষে তা এক ভয়াবহ ব্যাপার হবে। আর অপরকে শোষণ করার জন্যই ভারতকে শিল্পায়িত করার কথা কেনই বা আমি চিন্তা করব?"[১]

এ থেকেই বোধগম্য হয় গান্ধীজীর শোষণের প্রতি সীমাহীন ঘৃণা আর মানবসমাজের প্রতি সীমাহীন প্রেমভাবনা।

আধুনিক কালে আর্থিক শোষণের ফাঁদ এমনভাবে চতুষ্পার্শ্বে ছড়ান রয়েছে যে তার থেকে পল্লীর মূক কিষাণটির কিংবা এককোণে কর্মরত হস্তশিল্পীটির মুক্তি পাওয়া বড়ই দুরূহ। শহর গ্রামকে শোষণ করছে, বৃহৎ যান্ত্রিক শিল্প ক্ষুদ্র গ্রামশিল্পকে শোষণ করছে, বুদ্ধিজীবী শোষণ করছে শ্রমজীবীকে, জমিদার কিষাণকে, শিক্ষিত মর্যাদাসম্পন্ন ধনী শোষণ করে অশিক্ষিত, অবহেলিত গরীব দুঃস্থকে, রাজা প্রজাকে, উন্নত দেশ অনুন্নত দেশকে, মালিক শোষণ করে শ্রমিককে, গ্রাম্য-মহাজন নিরপরাধ গ্রামবাসীকে। এইভাবে আজ প্রায় সর্বত্র চলেছে শোষণের অবাধ বাণিজ্য।

বর্তমানে প্রত্যক্ষ শোষণের স্থলে অপ্রত্যক্ষ শোষণ এসেছে। গ্রামের কাঁচামাল মহাজনের কবলে পড়ে শহরের বড় বড় কলে হাজির হয়। তা পরে পাকামালে পরিণত করে কলওয়ালা সেই সব মহাজনের মারফৎ পুনরায় গ্রামবাসীদের কাছে বিক্রী করে। ফলে লাভ যাচ্ছে কোথায়? চাষী ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে চলেছে, কাঁচামাল বিক্রী করতে বাধ্য হয় তার অভাবের তাড়নায়; আর মাঝখানে মুনাফা লুটছে দালাল, মহাজন ও মিলওয়ালার দল। এইভাবে আমাদের গ্রামগুলি গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সম্পদশূন্য হয়ে পড়েছে। আর এই পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ভারতের শহরগুলি ধনে সম্পদে ঐশ্বর্যে স্ফীতকায় হচ্ছে। গ্রামের অসহায় মানবসমাজের প্রতিনিধি হয়ে গান্ধী দাঁড়ালেন এই মারাত্মক

১ ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১২-১১-৩১

পদ্ধতি বন্ধ করতে। তাই না তিনি গ্রামশিল্প পুনরুদ্ধারের কথা বললেন মরা গ্রামগুলিকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে। কেন? এর একমাত্র সহজ উত্তর এই যে, ভারতবর্ষে গ্রাম না বাঁচলে শহরের প্রাসাদোপম অট্টালিকা নিমেষে ভেঙে পড়বে। আজ এই নির্জলা সত্য যে কোন সমাজশাস্ত্রী বা অর্থশাস্ত্রীর কাছে সুস্পষ্ট।

ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের পর হতে বৃহৎ যন্ত্রকেন্দ্রিক যে শিল্পপ্রথার প্রবর্তন হল তারই ঢেউ আজ বিশ্বব্যাপী আবর্তিত হচ্ছে। এই বিশেষ ধরনের শিল্পায়ণের ফলে বহুল উৎপাদন (mass production), তার ফলাফলস্বরূপ বিশ্বের বাজারে পণ্য বিক্রয়ের প্রতিযোগিতা এবং পরিণামে বিশ্বযুদ্ধের দাবানল বারে বারে মানবসমাজকে বিপর্যস্ত করছে। তাছাড়া, আধুনিক কালের ঔপনিবেশিকতা তথা সাম্রাজ্যবাদের মূল উৎসস্থল কোথায়? ইংরেজ সাম্রাজ্য জগদ্ব্যাপী বিস্তৃত হল কেন? তার কারণ কি এই নয় যে, এই সব অনুন্নত দেশের বাজারে ইংলণ্ডে জাত পণ্যাদি বিক্রয়ের দ্বারা নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করা? বিশ্বব্যাপী এই ব্যবসাকে মজবুত করে বুদ্ধিমান পাশ্চাত্ত্যবাসী সেই সেই দেশের রাজদণ্ড দখল করল ছলে বলে কৌশলে। আর এইভাবে শোষণ আর্থিক নিপীড়ন অসাম্য ও হিংসার এক প্রতিক্রিয়া শুরু হল। বৃহৎশিল্প, বহুল উৎপাদন তথা বিশ্ববাণিজ্যের প্রবর্তনের ফলে পৃথিবীতে ঐক্য, শান্তি ও সমৃদ্ধির মধুভাণ্ড সৃষ্টি হবে প্রাচীন অর্থনীতিবিদ্‌দের এই কল্পনা আজ মায়া-মরীচিকায় পরিণত হয়েছে। রাজনৈতিক পরাধীনতা, আর্থিক শোষণ ও মনুষ্যত্বের অমর্যাদা এই ত্রিবিধ পাপের উৎসস্থল হল আধুনিক শিল্পবাদ।

পাশ্চাত্ত্যের বহু চিন্তাশীল মনীষী আজ এই সর্বগ্রাসী আর্থনীতিক বস্তুবাদের বিপদ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছেন। বিখ্যাত ইংরেজ অর্থনীতিবিদ্ ও শান্তিবাদী উইলফ্রেড ওয়েলক তাঁর এক সারগর্ভ পুস্তিকায় মন্তব্য করেছেন:

“সভ্যতা আজ এমনই এক অবস্থায় পৌঁছেছে যেখানে হয় সভ্যতার, নয় যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটবে।…কারণ, শিল্পবিপ্লব এমন সব অসঙ্গতির সৃষ্টি করেছে যার সমাধান করতে তা অক্ষম। ফলে

আমরা এক যুদ্ধ হতে অন্য যুদ্ধে ঝাঁপ দিয়ে চলেছি এবং এক জীর্ণ ঘুণধরা আর্থিক কাঠামোর উপর নির্ভর করে বেঁচে আছি যা মারাত্মক প্লেগ রোগের ন্যায় জড়বাদী মূল্যমানের বিষ ছড়াচ্ছে।"[১]

মানবতার পূজারী মহামানব গান্ধী তাই এই ভয়াবহ ব্যাধির প্রতিষেধক স্বরূপ শিল্পে যথাসম্ভব বিকেন্দ্রীকরণ তথা স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল সমাজ গঠনের জন্য উদ্যোগী বলেন। এ এক নূতন শিল্পবিপ্লব বলা চলে। শোষণহীন স্বাবলম্বী সমাজরচনার উপযোগী শিল্পব্যবস্থা। স্বাবলম্বন বলতে গান্ধীজী এমন বুঝতেন না যে, জীবনের সকল কিছু প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন গ্রামে গ্রামে করতেই হবে। কিন্তু স্বাবলম্বনের প্রকৃত তত্ত্ব এই যে, খাদ্য ও বস্ত্রের ন্যায় জীবনের মৌলিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহের উৎপাদনের ব্যাপারে সকল অঞ্চলকেই আত্মনির্ভরশীল হতে হবে। অপর অনেক কিছুর জন্য বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে 'পরস্পরাবলম্বন' এই নীতি প্রযুক্ত হবে। কেন না গান্ধীজী এতদূর বাস্তববাদী ছিলেন যে, ভৌগোলিক অবস্থা, কাঁচামাল সরবরাহ প্রভৃতি উৎপাদনের অপরিহার্য প্রাকৃতিক সর্তগুলি তিনি স্বীকার করতে নারাজ হননি। যাই হোক, এ সম্বন্ধে যথাস্থানে বিশদ আলোচনা করা হবে।

তাই এইরূপ এক আদর্শ শোষণহীন সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনের জন্য বিকেন্দ্রীকরণের নীতি আজ বিশ্বের বহুস্থানেই সমাদৃত হচ্ছে। প্রখ্যাত মানবতাবাদী পণ্ডিত আলডুস্ হাক্সলি বলেন,

"উত্তম সমাজ রচনার জন্য রাজনৈতিক পন্থা হচ্ছে বিকেন্দ্রীকরণ তথা দায়িত্বশীল স্বায়ত্তশাসনের পথ।"

["The political road to a better society is the road of decentralisation and responsible self-government"—'Ends and Means']

মানুষ যেমন আপন পায়ে চলবে, তেমনি সমাজ হবে স্বয়ংক্রিয়, আত্মনির্ভরশীল। মানুষের বাঁচার জন্য যা বিশেষ প্রয়োজনীয় তার

১ New Horizons

চাবিকাঠি যেন প্রত্যেক গ্রামসমাজের আয়ত্তে থাকে। এই ছিল গান্ধীজীর স্বাবলম্বী গ্রাম গঠনের লক্ষ্য। তাই তিনি অহেতুক কেন্দ্রীকরণের বিরোধী ছিলেন।

কাঠের পায়ে চলা মানুষ যেমন পরনির্ভরশীল, তেমনই সব কিছুর জন্য শহরাঞ্চলের বৃহৎ শিল্পের উপর আশ্রিত গ্রামগুলির স্বাধীন অস্তিত্ব কোনদিনই আসতে পারে না। স্বাবলম্বী স্বাধীন স্বয়ংক্রিয় সমাজ নির্মাণের জন্য শোষণহীন বিকেন্দ্রিত শিল্পব্যবস্থার আবশ্যকতা অপরিহার্য। গান্ধীজীর শিল্পায়নের যুক্তিকে এই দৃষ্টিতে বিচার করে দেখতে হবে।

অপরিগ্রহ ও অস্তেয়

আধুনিক কালে শিল্পবিপ্লবের পর থেকে বিশ্বের উন্নত ও প্রগতিশীল দেশসমূহে কেন্দ্রিত বৃহৎ বস্ত্রশিল্পের আধারে যে শিল্পপদ্ধতি ও আর্থিক কাঠামো গড়ে উঠেছে তা ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হতে পারে। যেমন, কোথাও বলা হয় ধনতন্ত্র, কোথাও সমাজতন্ত্র, আবার কোথাও বা সাম্যবাদী রাষ্ট্রতন্ত্র। কিন্তু এই সব দেশে অনুসৃত শিল্পপদ্ধতির প্রকৃতি ও মুলগত নীতি একই। সর্বত্রই কেন্দ্রীকরণের একচ্ছত্র আধিপত্য। সেই কেন্দ্রীকরণ গণতান্ত্রিক দেশে বড় বড় ব্যবসায়ী বাণিজ্য সঙ্ঘগুলির করতলগত; আবার সমাজতান্ত্রিক বা সাম্যবাদী দেশে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে সবকিছু পরিচালিত হয়। এই শিল্পপদ্ধতির মূলকথা হল স্বল্প-সময়ে যান্ত্রিক পদ্ধতির সাহায্যে বহুল উৎপাদনের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের মাধ্যমে অধিক মুনাফা আহরণ করা। উৎপাদনের সঙ্গে মানুষের প্রয়োজনের প্রত্যক্ষ কোন সম্বন্ধ না থাকায় অধিক উৎপাদন হলে আর তা ন্যায্য মুল্যে বিক্রয় করা সম্ভব না হলে কোন কোন ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক ভাবে তা সমুদ্রবক্ষে নিমজ্জিত করে ফেলা হয়। বিশ্বের একপৃষ্ঠে সম্পদের বাধ্যতামূলক অপচয় আর অপরপৃষ্ঠে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাবে বাধ্যতামূলক অনাহার অপুষ্টি রোগ শোক ক্ষুধার জ্বালা। নিত্য নূতন অভাব সৃষ্টি করাই আধুনিক শিল্পসভ্যতার এক বৈশিষ্ট্য।

অভাবকে সীমাহীনভাবে বাড়িয়ে চলা আর তার পূর্তির জন্য সম্পদের সীমাহীন শোষণ—বর্তমান শিল্পোন্নত দেশসমূহের প্রগতির রেখা বলে গণ্য করা হয়।

তাই এই শোষণমূলক অর্থনীতি তথা উৎপাদন ব্যবস্থার বিকল্প হিসাবে গান্ধীজী যেমন একদিকে খাড়া করলেন তার বিকেন্দ্রিত শিল্পব্যবস্থা, বহুল-উৎপাদনের (mass production) স্থলে বহুর দ্বারা উৎপাদন (production by the masses) তেমনি অপরদিকে সম্পদ আহরণ এবং তার ব্যবহারের উপরেও স্বেচ্ছাকৃত নিয়ন্ত্রণ আরোপের প্রস্তাব করলেন।

গান্ধী-কল্পিত আদর্শ সমাজে তাই অপরিগ্রহ ও অস্তেয় নীতি পালনের উপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রয়োজনের অধিক সংগ্রহ বা সঞ্চয় না করার নীতিই হল অপরিগ্রহ। অস্তেয়ের অর্থ হল, পরের সম্পদ অপহরণ না করা। এই দৃষ্টিতে পূর্বে শোষণের প্রকারভেদ সম্বন্ধে যা আলোচনা করা হয়েছে তা হতে প্রতিপন্ন হবে যে, বর্তমান সমাজে অপরিগ্রহ তথা অস্তেয় এই দুই মহান্ নীতির প্রতিপালন ব্যক্তি ও গোষ্ঠী জীবনে প্রায় নাই বললেই চলে। চোরে পরদ্রব্য অপহরণ করে, আর মালিক শ্রমিককে শোষণ করে—এই দুই কাজই গান্ধীজীর কাছে সমান ঘৃণ্য। ব্যক্তিগত জীবনে হয়ত দুই চারজন সৎ মহানুভব ব্যক্তি অস্তেয় ও অপরিগ্রহের নীতি আজও মেনে চলেন, কিন্তু তাতে বৃহত্তর সমাজের পক্ষে কোন লাভ হবে না। সেইজন্য সামাজিক স্তরেও আর্থিক কাঠামোকে এমনভাবে সংগঠিত করতে হবে যাতে করে অধিক সঞ্চয় করা সম্ভব না হয়। অস্তেয় নীতি অর্থসংগ্রহের পথকে শুদ্ধ করে আর অপরিগ্রহ অর্জিত অর্থের ব্যবহারের মাত্রাকে সংযত করে। সামাজিক স্তরে অস্তেয় নীতির প্রচলনের উপায় কি? শরীরশ্রম, উৎপাদনমূলক শ্রম, শোষণহীন উৎপাদনপ্রথা কায়েম করা হবে এর প্রকৃষ্ট পথ। অধিকমাত্রায় যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদনের দ্বারা সামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধি পায় আর তাতে অস্তেয় নীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই যন্ত্রের ব্যবহারের ক্ষেত্র সীমায়িত করার কথা গান্ধীজী বলেছেন।

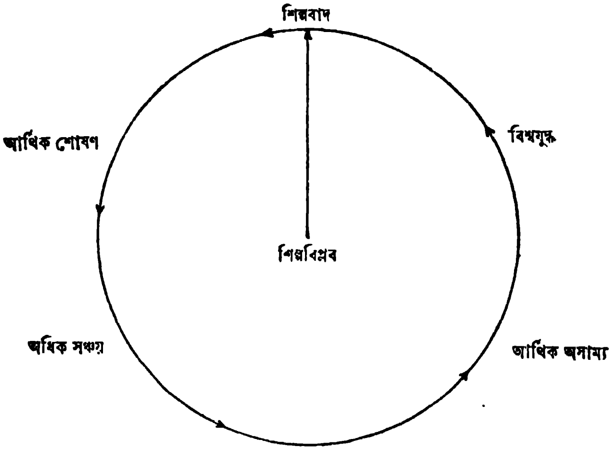
আর্থিক ক্ষেত্র জীবনধারণের একটি বৃহৎ অংশ। তাই সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হলে আর্থিক সাম্যের বিশেষ প্রয়োজন। তজ্জন্য অপরিগ্রহ ও অস্তেয় প্রতিপালন ধর্মবিচারের তুল্য। তাই মনু বলেছেন, "যঃ অর্থশুচিঃ সঃ শুচিঃ।" অর্থাৎ, যাঁর জীবনে আর্থিক শুচিতা সাধিত হয়েছে, তাঁর জীবন শুচিশুদ্ধ। অপরদিকে, জীবনধারণের জন্য সকলকেই সমাজের কাছে বহুভাবে নানা সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। এইজন্য সমাজের কাছে আমরা সকলেই ঋণী। সমবিভাজনের উদ্দেশ্যে গান্ধীনীতি সেজন্য বলে, তোমার আয় হতে সমাজের জন্য এক অংশ রেখে দাও। এই যুগে এটাই হবে ধর্মকাজ। 'সমাজায় ইদং ন মম'—ইহা সমাজের, আমার নয়। সমাজের জন্য এই হবে স্বেচ্ছাপ্রদত্ত খাজনা। অপরিগ্রহ এই নীতিরই অনুরূপ। বুদ্ধি, শ্রম ও অর্থের সমবায়ে সমাজের যে সম্পদ উৎপাদিত হল তাতে ব্যক্তির অংশের সঙ্গে সমাজের এক অংশও স্বীকৃত হওয়া উচিত। আর এইভাবেই সম-বিভাজনের ও আর্থিক সমতাবিধানের অহিংস প্রক্রিয়া কাজ করে।

সাম্যবাদী রাষ্ট্রে সমতা বিধানের প্রক্রিয়া অন্যরূপ। সেখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বলে বাধ্যতামূলক বেদখল করা হয় ব্যক্তিগত সম্পত্তির। রাশিয়া প্রভৃতি দেশে এইভাবে আর্থিক সাম্যের প্রচেষ্টা করা হয়। কিন্তু গান্ধীজী বললেন, অপরিগ্রহ, সম্পত্তিদান প্রভৃতি হবে আর্থিক সাম্যের অহিংস প্রক্রিয়া। বর্তমান সমাজে অধিক সঞ্চয় করা বা পরিগ্রহের বৃত্তি পাপ বলে গণ্য হয় না। বরং ধনবান ব্যক্তিরই আজ সামাজিক প্রতিষ্ঠা বেশী। চুরিকে আমরা অপরাধ বলে মনে করি। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রয়োজনের অধিক সংগ্রহের দ্বারা অপরকে চুরি করতে প্রলুব্ধ করে তার সেই বৃত্তিকে আমরা সামাজিক অপরাধ বলে মনে করি না কেন? উপনিষদের এক উপাখ্যানে রাজা বলছেন যে, 'আমার রাজ্যে কেহ চোর নাই, কৃপণও নাই।'[১] একদৃষ্টিতে কৃপণই সমাজে চোরের জন্মদাতা।

১ ভূদানযজ্ঞ কি ও কেন?

সেইজন্য আদর্শ সমাজে অধিক সঞ্চয় প্রবৃত্তিরও নিয়ন্ত্রণ হওয়া উচিত।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনাকে সূত্রাকারে বললে এরূপ হবেঃ শিল্পবিপ্লব হতে শিল্পবাদ, শিল্পবাদ হতে আর্থিক শোষণ, আর্থিক শোষণের ফলে অধিক সঞ্চয়, ফলে আর্থিক অসাম্য, আর আর্থিক অসাম্যের ফলে বিশ্বব্যাপী অশান্তি, যুদ্ধ ইত্যাদি। এ যেন একটি পাপচক্র। একবার শুরু হলে বৃত্তাকারে আপন গতিতে আবর্তিত হবে আর সমাজে হিংসার আগুন ছড়াতে থাকবে।



প্রশ্ন উঠবে যে, লোকে সঞ্চয় করে কেন? ভবিষ্যতের কোনরূপ দুর্দিনের জন্য, ব্যক্তিগত নিরাপত্তার আশায়। আজ ব্যক্তির জীবনে দৈবদুর্বিপাকে কোনরূপ সামাজিক নিরাপত্তা নেই বলেই না যে যার সাধ্যানুযায়ী কিছু সঞ্চয় করার জন্য প্রবৃত্ত হয়। এ খুব যুক্তিসঙ্গত বাস্তব উত্তর। কিন্তু যদি কোন প্রকারের যৌথ সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রামসমাজ হতেই করা হয় তবে স্বভাবতঃই ব্যক্তিগত সঞ্চয় প্রবৃত্তি প্রশমিত করা যায়। গান্ধীজী তাই এরূপ এক জাগ্রত, শক্তিশালী, স্বাবলম্বী গ্রামসমাজ নির্মাণের কথা বলেছিলেন। আর আজ আচার্য বিনোবা ভাবে গুরুর যোগ্য উত্তরসাধকরূপে তাঁর গ্রামদান আন্দোলনের মাধ্যমে এক স্বতন্ত্র, আত্মনির্ভরশীল গ্রামসমাজ সংস্থাপনের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছেন। এরূপ গ্রাম-গণতন্ত্রই

সামাজিক নিরাপত্তার প্রতীকস্বরূপ হবে ব্যক্তির জীবনে। এই আন্দোলন যতই বৃদ্ধিলাভ করবে, ততই জনমানসে সমাজভাবনার উদয় ও বিকাশ ঘটবে; আর ততই সামাজিক স্তরে অপরিগ্রহ ও অস্তেয় নীতি স্ফুরিত হবে। সমাজবিজ্ঞানের ইতিহাসে এ এক নূতন পরীক্ষা, এক অভিনব পরিক্রমা।

কাজেই এখন বলা যায় যে, সর্বোদয় সমাজ হবে অপরিগ্রহী বা অসংগ্রহী সমাজ। অনেকের ধারণা এমন হতে পারে যে, এই সমাজে হয়ত কেউ দরিদ্র থাকবে না কিন্তু সমাজের অবস্থা স্বচ্ছলও হবে না। এই ধারণা ভুল। অসংগ্রহী সমাজে উৎপাদন যেমন প্রচুর হবে তেমনি সমবণ্টনের সুব্যবস্থা থাকবে। বিনোবাজী অতি সুন্দর ভাবে এর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, "আজিকার সংগ্রহী-সমাজের অবস্থা এই যে, দেশে সারা বছরের মত পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য থাকে কিনা সন্দেহ। কিন্তু অসংগ্রহী সমাজে কমপক্ষে দু বছরের খাদ্যশস্য মজুত থাকবে। প্রতি ঘরে খাদ্যশস্য থাকবে। বর্তমানে কারও যেমন পিপাসা পেলে সে যে-কোন বাড়ীতে গিয়ে জল চাইতে পারে, অসংগ্রহী সমাজেও তেমনি কেউ ক্ষুধার্ত হলে যে-কোন বাড়ীতে গিয়ে আহার্য চাইতে পারবে। পানীয় জলের জন্য যেমন কেউ পয়সা চায় না, তেমনি এরূপ সমাজে ক্ষুধার্তকে খাদ্য দেবার জন্যও কেউ পয়সা নেবে না।......"

স্থায়িত্বের অর্থনীতি ১

আধুনিক জটিল অতিমাত্রায় কেন্দ্রিত আর্থিক কাঠামোর বদলে গান্ধীজী মোটামুটি সহজ বিকেন্দ্রিত অর্থব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। এই আর্থিক ব্যবস্থার মূল থাকবে দেশের লাখ লাখ গ্রামে ছড়ানো। উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা প্রধানতঃ গ্রামকেন্দ্রিক হবে। ফলে বর্তমান কালের অহেতুক জটিলতা দূর হবে।

অপরদিকে, আধুনিক সভ্যতার পরিমাপ যেমন সম্পদ ও ঐশ্বর্যের বিপুল সংগ্রহের দ্বারা করা হয়, গান্ধীজী ছিলেন এই প্রথার ঘোর

১ Economy of Permanence.

বিরোধী। আজিকার দুনিয়ায় পাশ্চাত্ত্যের বহু দেশে যেখানে প্রাচুর্য বিদ্যমান সেখানে যে পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যয় হয় তা ভাবতে গেলেও শিহরণ জাগে। নিত্য নূতন সৃষ্ট অভাবের তাড়নায় ও চক্ষু-উদ্দীপক বিজ্ঞাপনের প্রতারণায় মানুষ তার জীবনে অপ্রয়োজনের চাপ বাড়িয়ে চলে। পূর্বে অপরিগ্রহী সমাজের স্বরূপ বর্ণনায় এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

তাছাড়া, বর্তমান আর্থিক দুনিয়ায় মানুষের জীবনে লোহা, ইস্পাত, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি উপাদানের প্রভাব এত বেশী যে একে অস্বীকার করা প্রায় অসম্ভব। কেবল তাই নয়। আমরা অধিকতর প্রগতিশীল ও উন্নত হবার আশায় এমন সব জিনিসের ব্যবহার ক্রমেই বাড়িয়ে চলেছি যেগুলির উৎপাদনের জন্য আবার উপরোক্ত লোহা, ইস্পাত, কিংবা পেট্রোলের ন্যায় দ্রব্যগুলির বিশেষ প্রয়োজন। যেমন বলা যায় প্রাসাদোপম অট্টালিকা, মোটর গাড়ী, বিমান, রেডিও প্রভৃতি আধুনিক সভ্যতার প্রয়োজনীয় অঙ্গগুলির উপরেই বর্তমানে মানুষ অতিমাত্রায় নির্ভরশীল। অথচ মুশকিল হল এই যে, প্রকৃতির রাজ্যে বিভিন্ন উৎপাদনের যোগান প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত: (ক) যেগুলির উৎপাদন সীমাবদ্ধ। যেমন, লোহা, কয়লা, পেট্রোল, সোনা ইত্যাদি। (খ) যেগুলির উৎপাদন মানুষ আপন শক্তির দ্বারা ইচ্ছা করলেই বাড়াতে পারে। যেমন, কাঠ, তুলা, জল ইত্যাদি। অর্থাৎ, এগুলির যোগান বলা যায় অনন্ত। অল্পকালের মধ্যেই লয় পাবে না। গান্ধীদর্শনের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ ডাঃ জে. সি. কুমারাপ্পা এই দুই প্রকার অর্থনীতিকে বলেছেন: (১) সঞ্চিত জলাধারের অর্থনীতি[১] আর (২) অনন্ত প্রবাহিণী অর্থনীতি।[২]

প্রথমটির প্রকৃত অর্থ হচ্ছে এই যে, বড় বড় জলাধার যেমন বাইরের বৃষ্টির জল না হলে শুষ্ক ভূমিতে পরিণত হবে, তেমনি

১. Reservo'r Economy
২. Current Economy

যে অর্থনীতির ভিত্তিমূলে এমন ক্ষমতা যদি না থাকে যার দ্বারা তা সর্বদাই অপরের বা বাইরের সাহায্যের উপর নির্ভর করে গতিশীল হয় তবে সেই অর্থনীতির স্বায়িত্ব যে স্বল্পকালীন তা যে-কেউ বুঝতে পারবেন। এইরূপ আর্থিক কাঠামো হয়ত অল্প সময়ের মধ্যেই কিছু একটা চমকপ্রদ ফল দেখায় কিন্তু তার উৎসমূল যা-ই শুকিয়ে আসে তন্মুহূর্তেই তা অপর উৎসের সন্ধানে ব্যাপৃত হয় এবং পরিণামে যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, আমাদের এই দেশে পেট্রোলের উৎপাদন খুব কম বলা যায়। (তবে আশার কথা, সম্প্রতিকালে বিভিন্ন স্থানে নূতন কূপের সন্ধান পাওয়া গেছে)। আর আমাদের আর্থিক ব্যবস্থায় ও মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় যদি এই পেট্রোলের প্রয়োজন ক্রমেই বেড়ে চলে তবে নিশ্চয়ই অল্পকালের মধ্যেই জাতীয় অর্থনীতিতে সংকটের ছায়া দেখা দেবে। তজ্জন্য আমাদের অবস্থা বুঝে সর্বদাই পেট্রোলের সংযত ব্যবহারের প্রতি সদাজাগ্রত দৃষ্টি রাখতে হবে। তেমনি অন্য কোন সহজলভ্য শক্তিরও সন্ধান করতে হবে। পৃথিবীতে বহু প্রকাশ্য যুদ্ধ এবং বিশেষতঃ বর্তমান কালের ঠাণ্ডা লড়াইয়ের মূলে আছে এই আর্থিক সম্পদের লড়াই। সেজন্য যে অর্থনীতি অপর বহিঃশক্তির উপর নির্ভরশীল তা সেই জাতিকে ধ্বংসের পথে বহন করে নিয়ে যাবে। সেইজন্য গান্ধীজী এইপ্রকার ক্ষণস্থায়ী আর্থিক কাঠামো সমর্থন করেননি।

অপর পক্ষে, দ্বিতীয়টি অর্থাৎ 'অনন্ত প্রবাহিণী অর্থনীতি'র মূল কথা হচ্ছে, এই অর্থনীতি আত্মনির্ভরশীল। পরের কাছ হতে ধার করা চমকপ্রদ দ্রব্যের উৎপাদনের দ্বারা প্রগতির সীমা নির্দিষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে আপন দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের দৃষ্টিতেই প্রধানতঃ তার আর্থিক কাঠামো রচিত হয়। তাও আবার সেই সব উপাদানের সংযত ব্যবহারের জন্য চেষ্টা করতে হয় যে সব উপাদানের যোগান সীমিত। ফলে, অপর দেশের সম্পদের উপর এরূপ অর্থনীতি নির্ভরশীল না হওয়ায় এর স্থায়িত্ব সুদূরপ্রসারী হয়। আর তা পৃথিবীতে জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ ও অশান্তি সৃষ্টির বদলে শান্তি ও সহযোগিতার পরিবেশ

রচনায় সাহায্য করে। এইরূপ আর্থিক কাঠামোকেই আমরা অন্য কথায় 'স্থায়িত্বের অর্থনীতি'[১] বলে আখ্যাত করতে পারি।

অর্থনীতির এই মৌলিক বিচারে বর্তমানের অধিকাংশ দেশই 'সঞ্চিত জলাধারের' অর্থনীতি অথবা ক্ষণস্থায়ী অর্থনীতির উপর প্রাতষ্ঠিত। প্রকৃতির অনন্ত অখণ্ড বিধানগুলিকেই যদি আমরা আমাদের আর্থিক জীবনে রূপায়িত করার চেষ্টা করি যেখানে জীবনের মূল্য, মানুষের মূল্য অধিক সমাদৃত হবে তা হলে সেই অর্থনীতিই হবে হিংসামুক্ত শান্তিপূর্ণ সমাজ রচনার সহায়ক। হয়ত আপাতদৃষ্টিতে এরূপ আর্থিক ব্যবস্থাকে আধুনিক যান্ত্রিক প্রগতিসম্পন্ন বলে মনে হবে না। কিন্তু স্থায়িত্বের বিচারে, শান্তিস্থাপনের দৃষ্টিতে, মানব-কল্যাণের পটভূমিকায় গান্ধীজী তাই এরূপ এক আর্থিক ব্যবস্থা সংগঠনের প্রচেষ্টা করে গেছেন।

পূর্বে যেমন বলা হয়েছে যে, প্রকৃতির ভাণ্ডারে একপ্রকারের সম্পদ্ সঞ্চিত আছে যার সীমিত যোগানের জন্য তা ক্ষণস্থায়ী; আর অপর এক প্রকারের উপাদানসমূহের উৎপাদন মানুষের সেবায় অনাদিকাল ধরে ব্যাপৃত থাকে। প্রকৃতির এই চিরস্থায়ী সম্পদ ভাণ্ডারের মূলে কি রহস্য আছে যার জন্য যুগযুগান্ত ধরে তার উৎপাদন-উৎসস্থলে কোনরূপ ভাঁটা পড়ে না? এর কারণ হচ্ছে, প্রকৃতির রাজত্বে বিভিন্ন প্রাণীজ দ্রব্যের মধ্যে পরস্পরিক সহযোগিতার অভ্যাস বিদ্যমান। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় উদ্ভিজ্জ জগতের কথা। একটি ধান গাছ হতে কয়েকটি দানা মাটিতে পড়ল। কিছুকাল পরে সেগুলি হতে অঙ্কুরোদ্গম হয়ে তা মাটি হতে রস সংগ্রহ করে ও আলো-বাতাসের সহযোগিতায় ধীরে ধীরে ছোট চারাগাছরূপে আত্মপ্রকাশ করল। পরে সেই গাছের পাতাদ্বারা আলো-বাতাস হতে এবং শিকড়দ্বারা মাটি হতে প্রয়োজনীয় খাদ্য আহরণ করল। ফল হল। শুকনা পাতা ঝড়ে পড়ল মাটিতে। তা পচনক্রিয়ায় পুনরায় মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে পরবর্তী বৃক্ষের খাদ্য সংগ্রহের উপাদান মৃত্তিকাতে সৃষ্টি করে গেল।

১. Economy of Permanence, J. C. Kumarappa

ডাঃ কুমারাপ্পা আর একটি ছোট্ট দৃষ্টান্তের সাহায্যে চিরস্থায়ী বনাম ক্ষণস্থায়ী অর্থনীতির তুলনা দেখিয়েছেন। একটি কেঁচো মাটির মধ্যে তার নড়াচড়ার দ্বারা মাটিকে আলগা ও ফুসফুসে করে। ফলে রৌদ্রের আলো, হাওয়া ও জল সংমিশ্রণের পথ সুগম করে। আর সে যখন উদ্ভিজ্জ পদার্থ মাখা মাটিই আহার করে, তখন তার পাকস্থলীর সাহায্যে সেই মাটিকে সুন্দররূপে পরিপাক করে পুনরায় সারাল মাটিরূপে নির্গত করে। এই মাটিই আবার বৃক্ষসমূহের পক্ষে খুব পুষ্টিকর। মাটি, গাছ ও প্রাণীজ কীট সমূহের মধ্যে যে সূক্ষ্ম অথচ সক্রিয় সহযোগিতা নিরন্তর একক ভাবে কাজ করে চলেছে, এ হচ্ছে তার প্রকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত।১ প্রগতির নিষ্ঠুর পরিহাস এই যে, কৃত্রিম রাসায়নিক সার আমরা জমিতে প্রয়োগ করার ফলে এই সক্রিয় কীটগুলি ধ্বংস পায়। হয়ত কিছুদিনের জন্য উৎপাদন বৃদ্ধির চমক লাগলেও, কেঁচো ইত্যাদি প্রাণীগুলি এই সার প্রয়োগের ফলে নষ্ট হয় বলে পরিণামে তা মাটিকে শুষ্ক শক্ত অনুর্বর জমিতে পরিণত করে।

এইভাবে প্রকৃতির রাজত্বে প্রত্যেকটি উপাদান আপনার পরিপুষ্টি ও পোষণের মধ্য দিয়ে পরবর্তী প্রক্রিয়াকে সজীব করে তোলে। একের লয়প্রাপ্তির দ্বারা অপরকে প্রাণবন্ত করে। এইভাবে চলে আসছে এই স্বার্থশূন্য সহযোগিতার বৃত্ত। তাই আমরাও যদি আমাদের জীবন ও সমাজকে চিরস্থায়ী ভিত্তির উপরে স্থাপিত করতে চাই তবে তার জন্য প্রয়োজন হবে সমাজে বিভিন্ন এককের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, সহনশীলতা ও একতাবোধ। যত অধিক মাত্রায় ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ভাবে এই সহযোগিতা ও সহনশীলতার বোধ ক্রিয়াশীল হবে তত মজবুত ও দৃঢ় হবে সমাজের ভিত। মানুষের জীবনও তত শান্তিময় হবে।

পুঁজি ও শ্রমের সমমর্যাদা

পূর্বে বলা হয়েছে যে, গান্ধী-কল্পিত আদর্শ সমাজব্যবস্থায় শ্রমের যথাযোগ্য মর্যাদা থাকবে; বুদ্ধিশ্রম ও শরীরশ্রমের মূল্য সমান

১. Economy of Permanence—I

হওয়া বিধেয়। কেন না, বর্তমান সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যে আর্থিক বৈষম্য ও সামাজিক বিভেদ বিদ্যমান, সর্বোদয় সমাজে তা কখনই থাকতে পারে না। সেইজন্য গান্ধীজী রাসকিনের 'আনটু দিস লাস্টে'র মহান্ শিক্ষানুযায়ী সমাজে সকলের জন্যই কোন না কোন প্রকারের উৎপাদনমূলক শ্রম করার উপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আপন জীবনেও এই নীতিকে কার্যকরী করার ব্যাপারে তাঁর সৃষ্ট গঠনকর্মের আশ্রমসমূহে গম পেষা, সাফাই, সূতাকাটা, বাগানের কাজ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার কাজকে অবশ্যপালনীয় করেছিলেন। বৃদ্ধ, অক্ষম, শিশু প্রভৃতিদের জন্য উৎপাদনমূলক শ্রমের উদ্দেশ্যে গান্ধীজী সূতাকাটার ব্যবস্থা করেছিলেন। শোষণহীন অহিংস সমাজে বুদ্ধিশ্রম ও শরীরশ্রমের মারাত্মক বিভেদ স্বীকার করা যায় না। ভগবান যেমন সকলকেই হাত পা দিয়েছেন, আবার মস্তিষ্কও দিয়েছেন, সেইজন্য প্রত্যেককে উভয়বিধ কাজই করতে হবে। সকলেরই শ্রমনিষ্ঠ হওয়া সর্বোদয় সমাজ রচনার পক্ষে অত্যাবশ্যক।

তদ্রূপ, শিল্পের ক্ষেত্রে, পুঁজি ও শ্রমের বিরোধ গান্ধীজী স্বীকার করতেন না। পুঁজিপতি শ্রমিককে শোষণ করে এ কথা ঠিক। কিন্তু তাই বলে মার্কসবাদীদের ন্যায় পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে এক দুর্ভেদ্য বিরোধের প্রাচীর খাড়া করে দেবারও পক্ষপাতী ছিলেন না তিনি। অপর পক্ষে গান্ধীজী চাইতেন শ্রেণীসংঘর্ষের স্থলে শ্রেণীসমন্বয়। এর কারণ অতি সহজ। কেন না, যে কোন উৎপাদনের জন্য যখন শ্রম ও পুঁজি এই দুইটি উপাদানের সমান আবশ্যকতা রয়েছে, তখন উভয়কেই আপন স্থানে প্রতিষ্ঠিত করে উভয়ের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্বন্ধ সৃষ্টি করাই হবে বিরোধহীন সমাজগঠনের পক্ষে একটি প্রয়োজনীয় পন্থা। তাই কম্যুনিস্টদের অনুসৃত সংঘর্ষ তথা বিরোধের পন্থার স্থলে গান্ধীজী উভয় শক্তির মধ্যে একটি সমন্বয় স্থাপনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। আর অপরদিকে অসহায় শ্রমিক সমাজকে আপন শক্তি সম্বন্ধে সজাগ করে তাদের সংগঠিত করতে চেয়েছিলেন। মজার কথা এই যে, শ্রমিকরা সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের প্রভুত্বের সামনে

দাঁড়াতে সক্ষম হয় না বলেই আজ তারা পদানত, অবনত জীবন যাপনে বাধ্য হয়। কারণ, শ্রমিক আজ আপন ক্ষমতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

তবে এখানে সতর্কতার প্রয়োজন আছে। জাগ্রত শ্রমিক সমাজ যদি স্বীয় দাবী আদায়ের উদ্দেশ্যে জোর-জবরদস্তির সাহায্যে হিংসাত্মক আচরণে লিপ্ত হয় তবে তা হবে জাতির সমৃদ্ধির পথে একটি প্রধান অন্তরায়। সেইজন্য অহিংস পন্থার সংগঠনের গুরুত্ব গান্ধীজী অনুধাবন করেছিলেন। শ্রমিক পুঁজিপতিকে আপনার শত্রুরূপে না দেখে সহযোগীরূপে ভাববে, উৎপাদনযন্ত্রকে অত্যাচারী পুঁজিপতির সম্পত্তিরূপে না দেখে আপনাদের সম্পত্তি বলে ভাববে। আর পুঁজি-পতিকেও তার দায়িত্ব সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে যাতে শ্রমিক শ্রমের উচিত মজুরি হতে বঞ্চিত না হয়। উভয়েই উৎপাদনের সম-অংশীদার এই ভাবনায় পুঁজিপতিকেও ভাবিত হতে হবে। সেইজন্য গান্ধীজী চাইতেন পুঁজি ও শ্রমের মিলন। উভয়ের মিলিত প্রয়াসে সমাজের চেহারা আমূল পরিবর্তিত হতে বাধ্য। সেইজন্য গান্ধীজী বলতেন, "প্রকৃত প্রস্তাবে, পুঁজি ও শ্রম হবে পরস্পরের ট্রাস্ট্রি বা অছি ; আর উভয়ে মিলিত ভাবে হবে জনসাধারণের ট্রাস্ট্রিস্বরূপ।" [১]

এইরূপ সমাজতন্ত্রকে তিনি বলতেন, অহিংস সমাজতন্ত্র। এইরূপ ব্যবস্থায় পুঁজি, অর্থ বা বুদ্ধি যেগুলির সাহায্যে বর্তমান দুনিয়ায় শ্রমিক শ্রেণী শোষিত ও নিপীড়িত হচ্ছে, সেগুলির অযৌক্তিক প্রাধান্য কমিয়ে শ্রমের সমমর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করাই হবে আর্থিক সমতা বিধানের অহিংস উপায়।

আর্থিক সাম্যের স্বরূপ

গান্ধীজীর আর্থিক চিন্তাধারায় আর্থিক সমতা বিধান একটি প্রধান স্থান অধিকার করেছে। কেন না, শোষণহীন সর্বোদয় সমাজ গঠনের সঙ্গে আর্থিক সাম্য অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত রয়েছে। গান্ধীজী তাঁর

১. Towards Non-violent Socialism

গঠনমূলক কর্ম পরিকল্পনায় আর্থিক সাম্যকে অন্যতম অঙ্গরূপে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

কিন্তু এই সমতার অর্থ কি সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। যেমন আবশ্যক কি পথে, কি উপায়ে সেই সমতা আনা যায় সে সম্বন্ধে ধারণা রাখা। এ সম্বন্ধে গান্ধীজীকে বহুবার অনেক অদ্ভুত প্রশ্ন করা হয়েছে। সমবণ্টনের অর্থ কি? এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন যে, প্রত্যেক মানুষের তার প্রয়োজন অনুযায়ী জীবন ধারণের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি পাওয়ার ব্যবস্থা থাকা উচিত। যেমন, যদি কোন লোকের এক পোয়া আটার প্রয়োজন হয় আর দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির আধসের আটার, তবে এমন ব্যবস্থা হওয়া উচিত যাতে উভয়েই তাদের দৈহিক প্রয়োজন অনুসারে খাদ্য পায়।[১] এই আদর্শকে রূপায়িত করতে হলে সমাজের আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। অহিংস সমাজে অন্য কোন আদর্শ স্থান পেতে পারে না।

মাদ্রাজে গঠনকর্মীদের এক সভায় গান্ধীজীকে প্রশ্ন করা হল, 'আর্থিক সাম্যের দ্বারা আপনি ঠিক কি বুঝতে চান?'

উত্তরে তিনি বললেন যে, তাঁর ধারণা অনুযায়ী আর্থিক সাম্যের অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেকে বাস্তব দৃষ্টিতে সমান পরিমাণ অর্থ পাবে। এর সহজ অর্থ এই যে, প্রত্যেকে তার প্রয়োজন মত যথেষ্ট পাবে। নিজের দৃষ্টান্ত দিয়ে গান্ধীজী বললেন যে, শীতকালে যেখানে তাঁর নিজের জন্য দুইখানি গরম আলোয়ানের দরকার, সেখানে তাঁর নাতি ও পুত্রবৎ কানু গান্ধীর কোন গরম বস্ত্রেরই প্রয়োজন হয় না।···কানু অপেক্ষা তাঁর মাসিক খাদ্য খরচ অনেক বেশী বলেই বলা যায় না যে তাঁদের মধ্যে আর্থিক অসমতা রয়েছে। সেইজন্য আর্থিক সাম্যের প্রকৃত অর্থস্বরূপ তিনি মার্কসের সংজ্ঞাই স্বীকার করেছিলেন: 'প্রত্যেককে তার প্রয়োজন অনুযায়ী দেওয়া।' কিন্তু তা বলে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে, রাজপ্রাসাদ ও পর্ণকুটিরের মধ্যে যে হৃদয়বিদারক পার্থক্য বিদ্যমান তার সমর্থনে যেন কেউ এ কথা না বলেন যে, ধনীদের

১. হরিজন, ২৫-৮-৪০

প্রয়োজন বেশী বলে তারা অধিক সম্পদের অধিকারী। এ হবে যুক্তির ভ্রমাত্মক বিশ্লেষণ। সেইজন্য তিনি দৃঢ়ভাবে বললেন, "সকলের সুষম খাদ্য পাওয়া চাই, উত্তম বাসগৃহ চাই, চণ্ডালদের শিক্ষা ও উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা চাই।[১] এই হবে তাঁর আর্থিক সাম্যের চিত্র। মানুষের জীবনধারণের জন্য নিম্নতম প্রয়োজনের অতিরিক্ত সকল কিছুই গান্ধীজী বাদ দিতে চান নাই। কিন্তু গরীবদের অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির সংস্থানের পরেই তা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আর্থিক সাম্যের অর্থ গাণিতিক অর্থে সমমূল্যের সব সময় নাও হতে পারে। কেন না, কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সমান বেতনস্বরূপ ১০০ টাকা হিসাবে যদি প্রত্যেককে দেওয়া হয় তবে কী দেখা যাবে কিছুকাল পরে? দেখা যাবে যে, কারও নিকট হয়ত কিছু অর্থ সঞ্চিত হয়েছে, কারও বা কিছু ঋণ হয়েছে, আবার কেউ বা যা আয় করেছে ঠিক তাই ব্যয় করেছে। কেন এমন হয়? কেন না, প্রত্যেক ব্যক্তি তার প্রকৃতি অনুযায়ী অর্থব্যয় করে। যে কৃপণ, সর্বদাই তার সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি প্রবল। আর যে অমিতব্যয়ী, সে ঋণে জর্জরিত হয়। এইভাবে দেখা যায় যে, গাণিতিক অর্থে আর্থিক সমতা বিধানের চেষ্টা বাস্তবতঃ ফলপ্রদ হয় না। সেজন্য আচার্য বিনোবাজী বলেন, আমরা চাই 'বিবেকযুক্ত সমতা'।[২] একটি ছোট উদাহরণ দিয়ে এর অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। মা তাঁর সন্তানদের গণিতের হিসাবে সমান খাদ্য খেতে দেন না। সব চাইতে ছোটকে দেন শুধু দুধ খেতে। তার চাইতে বড়কে দুধের সঙ্গে কিছু রুটি দেন। আর যে বড় তাকে দেন শুধু রুটি। এই হচ্ছে বিবেকযুক্ত সমতা। অহিংসার পথে সমতা বিধানের এই হচ্ছে প্রকৃত অর্থ। আর হিংসার দ্বারা যেখানে সমতা বিধানের চেষ্টা করা হয়েছে, সেখানে জবরদস্তির দ্বারা সকলকে এক ছাঁচে ঢালা হয়ে থাকে। গান্ধীজী এই

১. হরিজন, ২৫-৮-৪৮

২. হরিজন, ৩১-৩-৪৬

পথের পথিক নন। গান্ধীজী তাঁর জীবদ্দশায় স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গেই সমাজ হতে আর্থিক অসাম্য দূর করার জন্য দেশব্যাপী চরখা, গ্রামশিল্প প্রভৃতি কার্যক্রমের দ্বারা আর্থিক সমতা বিধানের প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন।[১] বাস্তবিক পক্ষে, সমাজে ধনী ও দরিদ্রের ভেদ মিটিয়ে সমতা ও সামঞ্জস্য বিধানের জন্যই না তিনি উৎপাদনমূলক শ্রম, চরখা প্রভৃতির উপর এত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আর্থিক সাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচার—এই হচ্ছে গান্ধীজীর খাদি আন্দোলনের মর্মকথা।

এরূপ আর্থিক সাম্য বিধান অহিংস উপায়ে কি প্রকারে সম্ভব? যে ব্যক্তি এই আদর্শকে স্বীকার করেছেন, তিনি তাঁর জীবনে তদনুযায়ী সর্বাত্মক পরিবর্তন সাধনে উদ্যোগী হবেন। আপন প্রয়োজনের মাত্রা অতিরিক্ত কোন কিছু গ্রহণে রাজী হবেন না। তাছাড়া, এই সমতার ভিত্তি হচ্ছে আধ্যাত্মিক সমতা। সকল মানুষের প্রতি সমভাবে উদ্বুদ্ধ হওয়াই আসল কথা। সেজন্য এই জমি, এই গৃহ, এই সম্পদ্ আমার—মালিকানার এরূপ প্রচলিত ভাবনা ত্যাগ করে সমাজের সকলের কল্যাণ হোক এরূপ নূতন ভাবনায় সঞ্জীবিত হতে হবে। প্রয়োজন-অতিরিক্ত যে সম্পদ্ আমার কাছে আছে তা সকলের সেবায় নিযুক্ত হোক, আমি তার রক্ষক মাত্র। আমি সম্পদের ট্রাস্টি মাত্র। ধনীদের বিশেষ করে এই বিচারে ভাবিত করতে হবে। আর্থিক সাম্যের যে নীতি গান্ধীজী উপস্থিত করেছেন তার মূলেও রয়েছে সম্পদের মালিকানা বিসর্জনের আদর্শ ও ট্রাস্টিশিপের ভাবনা। জোর পূর্বক রাষ্ট্রীয় শক্তির সাহায্যে সমতা বিধানের চেষ্টায় হয়ত ধনীর ধন হস্তগত করা যায়, কিন্তু তার বুদ্ধি, কৌশল প্রভৃতি হতে বঞ্চিত হওয়ার পরিণামে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গান্ধীজী তাই চাইতেন, ধনী তার ধনের সঙ্গে বুদ্ধিও সমাজের সেবায় দেবার জন্য উৎসাহিত হোক। আর এজন্য ধনীর শিরশ্ছেদের কোনই প্রয়োজন হবে না। প্রয়োজন কেবল তার মানসিক পরিবর্তনের।

১. ভূদানযজ্ঞ কি ও কেন?

এই পথ যে সহজ নয় এ কথা সুস্পষ্ট। সমগ্র সমাজ-মানসেই এই আদর্শের উপযোগী পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন আছে।

আবর্জনা হতে সম্পদ সৃষ্টি

গান্ধীজী দেশের সকল প্রকার সম্পদের যথার্থ ব্যবহার সম্বন্ধে অতিশয় সজাগ ছিলেন। গ্রামাঞ্চলে এমন অনেক কাঁচামাল দেখা যায় যার প্রকৃত রূপান্তরে মানুষের উপযোগী কোন না কোন প্রকারের জিনিস উৎপন্ন হতে পারে। বৃহৎ যান্ত্রিক শিল্পের অবাধ প্রচলনের ফলে সমাজের নানাপ্রকার কাঁচামালের অপব্যয় হয় বলা যায়। আমেরিকা মহাদেশের আর্থিক ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, সেখানে বড় বড় কারখানার মালিকবৃন্দ কখনও কখনও জাহাজভর্তি কফি বা গুদামভরা গম সমুদ্রবক্ষে নিক্ষেপ করে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। কেন? না, তা না হলে তাঁরা তাঁদের দেশে ওই দ্রব্যগুলির বাজারদর লাভজনক রাখতে সক্ষম হন না। আবার দেখা যায় যে, এমন কতকগুলি কাঁচামাল এমন সব জিনিস উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয় যাতে সমাজের বৃহত্তর দৃষ্টিতে ক্ষতি সাধিত হয়। যেমন বলা যায়, সাবান তৈরির জন্য নারিকেল তেলের ব্যবহার। আমরা জানি, ভারতে খাদ্যতেল হিসাবে নারিকেল তেলের উৎপাদন যথেষ্ট নয়। কিন্তু তার বৃহদংশ যদি আবার বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের তাগিদে ব্যবহৃত হয় তবে মানুষের পুষ্টির দিক হতে কি তা ক্ষতিকর হয় না? বিশেষ করে যখন সাবান তৈরির জন্য অন্য নানা প্রকারের অভোজ্য তৈলবীজ ভারতের সর্বত্র পাওয়া যায়। যেমন, নিম, মহুয়া, করঞ্জা, ইত্যাদি। গান্ধীজীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাই এই সব অভোজ্য তৈলবীজ হতে নিষ্কাশিত তেল দিয়ে সাধারণ সাবান তৈরির প্রতি আকৃষ্ট হল। এটি একটি উত্তম গ্রাম ও কুটির শিল্প। আরও বলা যায় যে, কাগজ তৈরির বড় বড় কারখানায় ভাল বাঁশের অবিরাম যোগান দিতে হয়। কিন্তু গ্রামশিল্পের ভিত্তিতে বিকেন্দ্রিত উপায়ে কাগজ প্রস্তুতের জন্য পুরানো ব্যবহৃত অকেজো বাঁশ, খড়, চট ইত্যাদির ব্যবহার শুরু করা হল। আর ভাল বাঁশগুলি ঝুড়ি, মাদুর, গোলা, ঘরবাড়ী নির্মাণ প্রভৃতি

অধিকতর সমাজ উপযোগী কাজের জন্য নির্দিষ্ট রাখা হল। জাতীয় সম্পদের উচিত ব্যবহারের দৃষ্টিতে কোনটি অধিকতর লাভজনক? এইভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, গান্ধীজী দেশের আর্থিক পুনর্গঠনের জন্য যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছিলেন তাতে তিনি অধিকতর ভাবে এইরূপ নানা অব্যবহৃত দ্রব্যসমূহের নূতন প্রয়োগ সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গ্রামের চাষীকে সবরকম আবর্জনা হতে প্রস্তুত কম্পোস্ট সার, মূত্রসার ও মলমূত্রের বৈজ্ঞানিক সংরক্ষণের দ্বারা প্রস্তুত সার[১] প্রভৃতি ব্যবহারের উপর অধিক গুরুত্ব দিতেন। গান্ধীজীর গ্রামোদ্যোগ আন্দোলনের এটি এক বৈশিষ্ট্য। তালগুড় শিল্প, চর্ম শিল্প প্রভৃতি অধিকাংশ কুটির শিল্পসমূহ পুনরুদ্ধারের পিছনে কর্মসংস্থানের যেমন দৃষ্টি আছে, তেমনই এই লক্ষ্যও আছে, যে দ্রব্যগুলি অবহেলিত হয়ে নষ্ট হয় সেগুলির নূতন প্রয়োগের দ্বারা নূতন ব্যবহার্য সম্পদ্ সৃষ্টি করা। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও এর সমর্থনে বহু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়। এইভাবে সমাজের প্রত্যেকটি দ্রব্যের পূর্ণ ব্যবহার হোক, উৎপাদন যেন অপচয় বন্ধ করে—এই ছিল তাঁর আর্থিক দৃষ্টিভঙ্গী। সূতা কাটার সময়েও ছিঁড়ে যাওয়া টুকরা টুকরা সূতাগুলি তিনি ফেলে না দিয়ে তা থেকে কখনও পিন কুশন, কখনও জামার বোতাম ইত্যাদি ছোটখাট দ্রব্য নির্মাণে উৎসাহ দিতেন। যে সব চিঠিপত্র আসত তাঁর কাছে, সেগুলি পুনরায় কেটে তার উল্টাপিঠে গান্ধীজী লিখতেন। আমরা যুদ্ধ অথবা ওই জাতীয় জরুরী অবস্থার সময়েই মাত্র ব্যবহৃত খামের উপরে 'ইকনমিক্ স্লিপ' জুড়ে তা আবার ব্যবহার করি। গান্ধীজীর দৃষ্টিতে তাই কোনকিছুই আবর্জনা স্বরূপ ছিল না। উচিত স্থানে উচিত ব্যবহারে কোন সময়ের আবর্জনা অন্য সময়ে সম্পদে পরিগণিত হতে পারে।

১. Night soil manure

আর্থিক প্রগতি ও সামাজিক মুল্য

বর্তমান যুগে আর্থিক প্রগতির জন্য সমস্ত দেশে খুব একটা তৎপরতা দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে অনুন্নত, শিল্পে অনগ্রসর দেশে শিল্পোৎপাদনের গতি বৃদ্ধি করে আর্থিক উন্নতির জন্য পরিকল্পিত অর্থনীতির প্রভাব আজ প্রায় সর্বত্রই অনুভূত হয়।

কিন্তু প্রধানতঃ কেন্দ্রিত শিল্পায়ণের দ্বারা আর্থিক প্রগতি সাধনের ইতিহাসও কলঙ্কমুক্ত নয়। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, গান্ধীজীর কাছে মানুষই ছিল প্রধান বিচার্য বিষয়। সেজন্য তিনি আর্থিক প্রগতির বেদীমুলে মানুষের আত্মাহুতি কখনই সমর্থন করেন নাই। আর্থিক প্রগতির ফলে যদি মানুষে মানুষে সহজ সামাজিক সম্বন্ধ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় (যা আধুনিক কালের সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে এক প্রধান সমস্যারূপে আত্মপ্রকাশ করেছে), সামাজিক অসমতা বৃদ্ধি পায় তবে নিশ্চয়ই তা ভাববার কথা। এছাড়াও, পরিকল্পিত আর্থিক অভিযানের ফলস্বরূপ যদি গরীব উৎপাদিত সম্পদের অধিকতর অংশ-ভাগী না হয়ে অধিকতর গরীব হতে থাকে তবে সেই প্রগতির প্রকৃত মুল্য কতটুকু থাকল তাও বিচার্য বিষয়। সেজন্য বর্তমানে অর্থনীতি-বিদ্‌দের নিকট শিল্পোন্নয়নের উচ্চ হার সকল সময় আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য রূপে গণ্য হয় না। বিভিন্ন দেশে শিল্পায়ণের ফলে বৃহৎ মানবগোষ্ঠী যে অভিজ্ঞতা লাভ করল তারও পরিমাপ করে দেখা প্রয়োজন। অতএব বলা যায় যে, "সমাজের সর্বাত্মক প্রগতির মধ্যে আর্থিক প্রগতি একটি দিক মাত্র। সামাজিক প্রগতির ন্যায় আর্থিক প্রগতিরও মুল্যায়ন হওয়া উচিত কেবলমাত্র কি পরিমাণ জিনিস উৎপাদিত হল তা দিয়ে নয়, কি প্রকার মানবিক সম্পর্ক স্থাপিত হল তা দিয়ে।"[১] ভারী দামী কথা। গান্ধীজীর আর্থিক উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গী এই সব বিপদ সম্বন্ধে সচেতন ছিল বলে তিনি পাশ্চাত্ত্যের শিল্পবাদের প্রবাহকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানাতে পারেননি।

১. Essays on Economic Development by Amlan Dutta, p. 136.

তৃতীয় অধ্যায়

বিভিন্ন আর্থিক ব্যবস্থা

গান্ধীজীর আর্থিক চিন্তাধারার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন আর্থিক মতবাদগুলি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। কেন না শিল্পবিপ্লবের পর হতে আর্থিক তুনিয়ায় যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে গান্ধীজী কেন সেই তালে পা মিলাতে পারলেন না—এ যুগের এক বড় প্রশ্ন। তাই পূর্বগামীদের আর্থিক মতবাদের আলোকে গান্ধী-অর্থনীতির বিচার হওয়া যুক্তিযুক্ত ও বাঞ্ছনীয়।

প্রাচীনকাল

সভ্যতার প্রথম অবস্থায় মানুষ যখন অরণ্যচারী জীবরূপে পরিগণিত হত তখন ক্ষুৎপিপাসা নিবারণের জন্য সামনে যা পেত তাই ভক্ষণ করা ছিল তার পক্ষে স্বাভাবিক। গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের আর্থিক জীবনও ছিল প্রায় তদনুরূপ। কোন প্রাণী শিকার করে তা নিজেদের আবাসস্থলে এনে নৃত্যগীত সহকারে সমবেত ভাবে তা ভক্ষণ করত।

ক্রমে মানুষ যখন আরও সভ্য হতে লাগল তখন হতে কৃষিকাজ ও পশুচারণ হল মানুষের প্রধান উপজীবিকা। তখনও পর্যন্ত মানুষের মনে মালিকানা বোধের ভাবনা তেমন তীব্র হয় নাই। সম্পদ বৃদ্ধির উদগ্র কামনা মানুষকে তখন তেমনভাবে উৎপীড়িত করে নাই। নিজের সাধ্যে যতটুকু জমি চাষ আবাদ করা একজনের পক্ষে সম্ভব ছিল ঠিক ততটুকু নিয়ে সে স্বভাবতঃ শান্ত থাকত।

ক্রমে ক্রমে সমাজতন্ত্রের উদয় হল। ভূমিবান প্রভাবশালী জমিদার স্থানীয় জনসাধারণকে রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণের নামে তাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে প্রয়াসী হল। এইভাবে দিকে দিকে নৃপতিদের আবির্ভাব হল। তাদের পরস্পরের মধ্যে সময়ে সময়ে যুদ্ধ বিগ্রহ যে হত না তা নয়। ভূমিমজুরদের শোষণের সূত্রপাতও হয় এই সময় হতে। ব্যবসা, বাণিজ্য প্রভৃতি অধিকাংশই ছিল স্থানীয়।

সমাজ মোটামুটি তাই ছিল স্বাবলম্বী। মানুষের চাহিদাও ছিল খুব সীমাবদ্ধ।

আধুনিক কাল

সামন্তযুগ হতে ধনতন্ত্রের যুগে প্রবেশ করতে বেশ কিছু সময় লেগেছে। ধনতন্ত্রের প্রথম সোপান বাণিজ্যবিস্তারের যুগে যন্ত্র-বিজ্ঞানের নূতন আবির্ভাবে উৎপাদন রীতি তথা ব্যবস্থায় এক আমূল পরিবর্তন দেখা দিল।

সমুদ্রযাত্রার ফলে বিশ্ববাণিজ্যের প্রথম অবস্থার সূত্রপাত হল। বিভিন্ন দেশের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ব্যবসা-বাণিজ্যের আদান-প্রদানের ফলে প্রতি যুগেই একটি ধনী বণিক্ সম্প্রদায় গড়ে উঠল। পরে ধীরে ধীরে এই বণিকেরাই ধনিক সম্প্রদায়ে উত্তীর্ণ হল।

ইতিমধ্যে ইউরোপে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে শিল্প-বিপ্লবের শুভাগমনের ফলে মানুষ বাষ্পশক্তিকে উৎপাদনের কাজে লাগিয়ে বড় বড় কারখানার সাহায্যে যান্ত্রিক প্রথায় উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করল। ছোট ছোট বণিকের স্থানে এখন বড় বড় শিল্পপতি দেখা দিল। তারা উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানা দখল করে কারিগরদের মজুরির বদলে পণ্য উৎপাদনে নিযুক্ত করল।

পূর্বযুগের স্বাধীন ছোট ছোট কারিগর ও শিল্পী তাই এই যুগে মজুরে পরিণত হল। অপরদিকে পণ্য উৎপাদন, বিক্রয় প্রভৃতির একচেটিয়া মালিকানা কুক্ষিগত করে এই নূতন ধনী সম্প্রদায় দেশে প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সূচনা করল। এর নীট ফল দাঁড়াল এই যে, উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেল, প্রয়োজন অপেক্ষা মুনাফার লোভেই উৎপাদিত দ্রব্যসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিদেশে বাজার সন্ধান করতে হল—ফলে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের করালছায়া অনগ্রসর দেশগুলিতে দেখা দিল। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কম মজুরিতে এমনকি নারী ও শিশুদের পর্যন্ত কারখানায় শ্রমিকরূপে নিয়োজিত করতে পুঁজিপতি শিল্পপতিরা কুণ্ঠিত হল না। শ্রমিক সমাজ ক্রমাগত ভীষণভাবে শোষিত হতে লাগল। অপরদিকে শ্রমিক

আন্দোলন ক্রমেই সংগঠিত রূপে সঙ্ঘবদ্ধ হল। আর এ সকলের মিলিত চাপে ধনতন্ত্র হতে সমাজতন্ত্রের অভ্যুদয় ঘটল ইউরোপের নানা দেশে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সমাজতন্ত্র বিভিন্নরূপে প্রকাশ পেল। তবে প্রায় সর্বত্রই মূল কথা হচ্ছে, পুঁজির একাধিপত্য খর্ব করে উৎপাদন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের আবির্ভাব, শ্রমিকসমাজের দাবীদাওয়ার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ। আর পুঁজিবাদী দেশগুলিতেও নিছক ধনতন্ত্রের রাজত্ব টিকতে পারল না। তাতেও পরিবর্তন এল—ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায় আন্দোলন প্রভৃতির সম্মিলিত প্রভাবে।

সেজন্য বলা যায়, আজ পৃথিবীতে মোটামুটি তিনটি বিচারধারা কাজ করছে: (১) ধনতন্ত্র, (২) গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র, এবং (৩) সাম্যবাদ।

সামন্তবাদ আজ অস্তমিত বলা চলে। পুঁজিবাদ বলে যে, যোগ্যতম ব্যক্তিই তার কাছে কাম্য। যোগ্যতা বা কর্মদক্ষতার উপর নির্ভর করেই পুঁজিবাদী সমাজে বিচার করা হয়। কর্মদক্ষ অধিক উপায় করে ক্রমে ধনী হতে পারে। কিন্তু যাদের দক্ষতা কম, তাদের দিকে তাকাবার সময় নাই ধনতান্ত্রিক সমাজবিধানে। ফলে কিছুলোকের জীবনযাত্রার মান প্রভূত পরিমাণে উন্নত হল, আবার বৃহৎ জনসমষ্টি অবনত, অধঃপতিত জীবন যাপনে বাধ্য হল। ধনতন্ত্রে এর কোন সমাধান নাই। যিনি শিক্ষিত, যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি, পুঁজিবাদী সমাজে তাঁর সমাদরের কোন অভাব নাই। আর যাদের ভাগ্যে শিক্ষার কোন আলোক জুটল না, যারা সুদক্ষ শিল্পী কারিগরে উন্নীত হতে পারল না, তারা রয়ে গেল যেই তিমিরে সেই তিমিরে। ধনতন্ত্রের আহবানের আজ আর প্রগতিশীল মানবসমাজের কাছে তেমন মূল্য নাই।

গণতান্ত্রিক সমাজবাদে সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তনের ফলে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু এই দুই সম্প্রদায়ের উদ্ভব হল। বহুজনের কল্যাণভাবনার ফলে অল্প কিছুলোকের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে লাগল। একান্ন জনের রায়ে উনপঞ্চাশজনের মতের কোন মূল্যই দেওয়া হল না। ফলে রেষারেষি, বিভেদভাবনা, দলীয় রাজনীতির কদর্যতায় সমাজ

জীর্ণ হল। গণতন্ত্রে এই ভোটতন্ত্রের কুফল দূর করার অদ্যাবধি তেমন কোন ব্যবস্থা নাই। তাই গণতন্ত্রের নামে পার্টিতন্ত্রের উদয় হয়েছে।

ধনতন্ত্রের পরিণতি স্বরূপ সমাজ ধনিক ও শ্রমিক এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়ায় এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সাম্যবাদের অভ্যুদয়। ব্যক্তিগত পুঁজিবাদীদের ধ্বংস সাধন করে সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণী রক্তাক্ত সংগ্রামের মাধ্যমে রাষ্ট্রশক্তি দখল করবে এবং সর্বহারার একনায়কত্ব[১] প্রতিষ্ঠা করে সর্বপ্রকার উৎপাদন যন্ত্রও ব্যক্তিগত মালিকানার বদলে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় আনবে। যদিও বর্তমানে সংগঠিত রাষ্ট্রের দ্বারা সর্বহারা শ্রেণী শাসনযন্ত্র পরিচালনার ব্যবস্থা করবে তথাপি সাম্যবাদের অন্তিম লক্ষ্য হচ্ছে শ্রেণীহীন ও রাষ্ট্রহীন সমাজ কায়েম করা।

মার্কসবাদের তত্ত্বগত সমালোচনার বদলে আর্থিক দৃষ্টিতে আমরা এ কথা সহজেই বলতে পারি যে, ব্যক্তিগত পুঁজিবাদের ধ্বংস সাধন করে সেখানে এক অমিত শক্তিশালী রাষ্ট্রব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণে 'রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের'[২] উদ্ভব হয়েছে যার পরিণাম আরও ভয়াবহ। জনসাধারণের জীবিকার সাধন রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে থাকায় আপাতদৃষ্টিতে হয়ত দারিদ্র্যজ্বালা দূর হয়। কিন্তু মানুষকে তজ্জন্য ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিসর্জন রূপ চরম মূল্য বরণ করে নিতে হয়। তাছাড়া, যে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্র রচিত হল, কালক্রমে তাই একটি সুগঠিত ব্যবস্থাপকবর্গে রূপান্তরিত হয়। এই ব্যবস্থাপকবর্গই বাস্তব দৃষ্টিতে রাষ্ট্র পরিচালনার কর্তৃত্ব নিজেদের কাছে কেন্দ্রীভূত করে। বিভিন্ন কর্মরত জনসমাজের মধ্যেও আর্থিক ব্যবধান এখনও উল্লেখযোগ্যরূপে- বর্তমান। সুতরাং সমাজবাদী তথা সাম্যবাদীদের স্বপ্ন আজ বাস্তবে প্রতিফলিত হয়নি। এ সম্বন্ধে অতি সময়োপযোগী মন্তব্য করেছেন বৃটিশ লেবার পার্টির একদল চিন্তাশীল কর্মী তাঁদের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থে :

১ Dictatorship of the Proletariat

২ State Capitalism

"বহুদিন যাবৎ যৌথ মালিকানাকেই সমাজবাদী অর্থ-ব্যবস্থা রচনা করার এক অপরিহার্য ও পর্যাপ্ত সর্ত স্বরূপ বিবেচনা করা হত।......

"যাবতীয় আর্থিক ক্ষমতা রাষ্ট্রের নিকট হস্তান্তরিত করা হয়েছে এবং তার পরিণামে মোটেই মার্কসের বিশ্বাস সাকার হয়ে 'স্বাধীন ও সমানাধিকার ভোগকারীদের সমাজ' স্থাপিত হয়নি, বরং এর ফল হয়েছে একনায়কত্ববাদী স্বৈরতন্ত্র। এছাড়া, রাষ্ট্রের হাতে যাবতীয় আর্থিক ক্ষমতা থাকার দরুন কার্যতঃ এর উপর কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ নেই। শ্রমিকদের পক্ষে পুঁজিপতিদের পরিবর্তে রাষ্ট্রের করুণাশ্রয়ী হয়ে বেঁচে থাকা আরও দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। কারণ পুঁজিপতিরা কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের মত অন্ততঃ সর্বব্যাপী নয়। তাই পুঁজিবাদ যদি ব্যক্তিবাদ চালিত উচ্ছৃঙ্খলতা হয়, তবে সাম্যবাদ হচ্ছে যৌথবাদ চালিত উচ্ছৃঙ্খলতা এবং রোগের প্রতিবিধান ব্যাধির চেয়ে কোন অংশে শ্রেয় নয়।"[১]

রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব তথা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমরা গান্ধীজীর মতামতের উল্লেখ পূর্বেই ভূমিকা পর্বে করেছি। মনে হবে যেন বিশ্বের দুই প্রান্তে একই কথার প্রতিধ্বনি উঠছে। দ্রষ্টা গান্ধীর চোখে আধুনিক শিল্পবাদ তথা রাষ্ট্রীয়করণের ভবিষ্যৎ পরিণাম যেন বহুপূর্বেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল।

সাম্যবাদে সাম্যের মহান্ নীতি ঘোষিত হয়েছিল—'সকলকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী দেওয়া ও প্রত্যেক্যের কাছ হতে তার ক্ষমতা অনুযায়ী লওয়া।' কিন্তু সাম্যবাদীদের দ্বারা অনুসৃত পন্থায় আজ অমৃতের বদলে গরলের সন্ধান দেখা দিচ্ছে। গান্ধীজীর আর্থিক তথা সমাজ দর্শনে মানবিক সাম্যের কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু পথ একেবারে ভিন্ন বলে গান্ধীজীর মহান্ উত্তরসাধক বিনোবাজী একে বলেছেন 'সাম্যযোগ'।

গান্ধীজী যে আর্থিক সাম্যের কথা বলেছেন তার মূল হচ্ছে,

১ Twentieth Century Socialism

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে আত্মার অভিন্নতা। কিন্তু সাম্যবাদ এ কথা স্বীকার করে না। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে আর্থিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার সেবাকাজের মূল্য সমান। বুদ্ধিজীবী, শ্রমজীবী, পুঁজিপতি, শ্রমিক এদের ভৌতিক প্রয়োজনের সমানতার দৃষ্টিতে আর্থিক সাম্যের উপর শুরু হতেই দৃষ্টি দেওয়ার উপর গান্ধীজী যে গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তাও আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তাছাড়া, আধুনিক কালে রাষ্ট্রীয় মালিকানা, সমাজবাদ বা সাম্যবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন মতবাদে রাষ্ট্রের উপর জনগণের জীবনধারণের চাবিকাঠি সমর্পণ করার যে উদগ্র ব্যাধি দেখা দিয়েছে, গান্ধীজী কখনই তা সমর্থন করতেন না বলেই তিনি বিকেন্দ্রিত উৎপাদন তথা বণ্টন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। সেইজন্য তিনি স্বরাজের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছিলেন—

"আমি এই সত্য সপ্রমাণ করার চেষ্টা করছি যে, মুষ্টিমেয় কয়েকজন ক্ষমতা অধিকার করলেই স্বরাজ প্রতিষ্ঠা হয় না, পক্ষান্তরে কর্তৃত্বের অপপ্রয়োগ হলে সকলের ভিতর যদি তার প্রতিরোধ করার ক্ষমতা থাকে তা হলে তার নাম হচ্ছে স্বরাজ। অর্থাৎ কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্ব নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মন করার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা জনগণের মধ্যে সৃষ্টি করার শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমেই স্বরাজ অর্জন করতে হবে।"

(২৯.১.২৫)

প্রখ্যাত গান্ধী-অর্থনীতিবিদ্ ও ভাষ্যকার ডাঃ জে. সি, কুমারাপ্পা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অভিনব পদ্ধতিতে প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে মৌলিক দৃষ্টিতে আলোচনা করেছেন। প্রকৃতির রাজ্যে তিনি তাঁর এই আর্থিক বিভাগের দৃষ্টান্ত যেমন দেখিয়েছেন, তেমনি মানব-সমাজেও এর প্রচলনের উল্লেখ করেছেন। কুমারাপ্পাজী প্রধানতঃ পাঁচপ্রকার আর্থিক বিভাগের উল্লেখ করেছেন।[১] যথা :

(১) পরোপজীবী অর্থনীতি—Parasitic Economy
(২) লুণ্ঠনকারী —Predatory Economy

১ Economy of Permanence, Part I.

(৩) উদ্যমশীল অর্থনীতি —Economy of Enterprise
(৪) যৌথ " —Economy of Gregation
(৫) সেবা " —Economy of Service

এখন বিভিন্ন বিভাগগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

(১) পরোপজীবী অর্থনীতি ঃ

অনেক সময় দেখা যায় যে, কোন কোন লতাজাতীয় উদ্ভিজ্জ বা বৃক্ষ অপর একটি বৃক্ষের উপর পরগাছা হয়ে আছে। আর কালক্রমে সেই পরগাছা বৃক্ষটি মুল বৃক্ষটিকে নষ্ট করে ফেলে। প্রাণী রাজ্যেও, ব্যাঘ্র সরাসরি অপর প্রাণী হত্যা করে তার জীবন ধারণ করে। স্বভাবতঃই এর ফলে হিংসা সৃষ্টি হয়। চিল, বাজ প্রভৃতি পাখী ব্যাঙ, সাপ প্রভৃতি ক্ষুদ্র প্রাণী ভক্ষণের দ্বারা জীবন নির্বাহ করে। মানুষের সমাজে এর দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, কোন দুর্বৃত্ত, দস্যু, ডাকাত পথচারী মানুষকে বা ছোট শিশুকে হত্যা করে তার সকল সম্পদ আত্মসাৎ করে। স্বার্থভাবনার জন্য অপরের ক্ষতিসাধন করাই এই অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য। প্রধান লক্ষণ হচ্ছে—উপকার প্রাপ্তির উৎসকেন্দ্রের বিনাশ সাধন।

(২) লুণ্ঠনকারী অর্থনীতি ঃ

বানর গাছ হতে আম পেড়ে খায় অথচ সে গাছের বৃদ্ধির জন্য বানর স্বয়ং কিছু করে নাই। অর্থাৎ, যখন কোন কিছু অপর সূত্র হতে উপকৃত হয়, কিন্তু প্রতিদানে অপরের জন্য কিছু করে না। মাঠে পাখী এসে শস্য খেয়ে নেয়। অথচ, শস্য উৎপাদনের কাজে কোনপ্রকার ক্লেশ স্বীকার করে না। লুণ্ঠনকারী অর্থনীতির ইহাই বৈশিষ্ট্য যে, আত্মস্বার্থ পূরণের জন্য অপরের শ্রম শোষণ করে অথবা অপরের অর্জিত সম্পদ্ গ্রাস করে। আধুনিক কালে বৃহৎ কোম্পানীগুলির শেয়ারহোল্ডারগণ লভ্যাংশের অংশ গ্রহণ করে কিন্তু উৎপাদনের কাজে কোনরূপ অংশ গ্রহণ করে না।

(৩) উদ্যমশীল অর্থনীতি ঃ

একটি পাখী আপন উদ্যমে খড়কুটা সংগ্রহ করে বাসা নির্মাণ করে

তাতে থাকে। চাষী আপন শ্রমে ভূমি কর্ষণ করে, বীজ বপন করে, পরিশেষে ফসল কেটে গৃহে আনে। এ সবই হচ্ছে উদ্যমশীল অর্থনীতির দৃষ্টান্ত। অর্থাৎ, যে ব্যবস্থায় প্রয়োজন পূরণের জন্য কোন না কোন প্রকারের কাজ করতে হয়, যেখানে কেবলমাত্র আত্মস্বার্থ তৃপ্ত করাই লক্ষ্য নয়, যার জন্য কিছু ক্লেশ স্বীকার করতে হয়। একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, মৌমাছি পুষ্প হতে মধু সংগ্রহ করে ঠিকই। কিন্তু তৎসঙ্গে আপন ক্রিয়ার দ্বারা পুষ্পের মধ্যে পরাগ সংমিশ্রণ করে পুষ্পের উপকার সাধন করে। প্রধান লক্ষণ, উপকার পাওয়া ও প্রতিদানে অপরকে উপকৃত করা।

(৪) যৌথ অর্থনীতি ঃ

মৌমাছি মধু আহরণ করে—কিন্তু সে তা কেবলমাত্র নিজের জন্যই করে না, করে মৌচাকের সকলের জন্যই। ব্যক্তিভাবনার বদলে যৌথভাবনা, সমূহের ভাবনায় প্রণোদিত হয়ে কাজ করাই হচ্ছে এই অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য। মানবসমাজে যৌথ বা একান্নবর্তী পরিবারের সদস্য পরিবারের সকলের কল্যাণের জন্যই কাজ করে ; গ্রামে গ্রাম-পঞ্চায়েত বা সমবায় সমিতি সকলের স্বার্থ রক্ষার্থে সেখানে কাজ করে—এসব হচ্ছে যৌথ অর্থনীতির দৃষ্টান্ত। গোষ্ঠী জীবনে যেখানে প্রতি সদস্য গোষ্ঠী-নীতি, নিয়মকানুন বা গোষ্ঠীর সামগ্রিক স্বার্থ মেনে চলে—এই অর্থনীতির সেটি বৈশিষ্ট্য। আধুনিক কালে উগ্র জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিও এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

(৫) সেবা অর্থনীতি ঃ

প্রকৃতি ও মানবজগতে সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থনীতি হচ্ছে সেবাভাবনায় উদ্বুদ্ধ আর্থিক ব্যবস্থা। যে অর্থনীতিতে একের হিতের জন্য অপরের অমঙ্গলের সূচনা হয় না, যা সমাজের ক্ষীণতম, দুর্বলতম অংশের প্রতি সদাজাগ্রত দৃষ্টি রাখে। সন্তানের শৈশবাবস্থায় মাতার লালন পালন, আপন স্তন্যদুগ্ধ সন্তানের পোষণের জন্য নিঃস্বার্থভাবে দান, পক্ষীমাতার আপন শিশুশাবকগুলিকে দূরান্ত হতে সংগৃহীত খাদ্য খাওয়ানো—এ সকল হচ্ছে এই অর্থনীতির দৃষ্টান্ত। সমাজসেবক সমাজে দুঃস্থের সেবা করেন—নিজের কোনরূপ উপকারের জন্য নয়।

বৈজ্ঞানিক বীক্ষণাগারে গবেষণা চলে—কেবলমাত্র আপনার জন্য নয় বা আপন গোষ্ঠীর জন্যও নয়, সমগ্র মানবসমাজের কল্যাণের জন্য। গান্ধীজী যে সর্বোদয় সমাজ স্থাপনের কল্পনা করেছিলেন তার আর্থিক ব্যবস্থা হবে সেবামুলক। শোষণহীন ও শান্তির বার্তাবহ। এরূপ আর্থিক ব্যবস্থাই সমাজে দ্বেষ হিংসা দূর করে শান্তি, মৈত্রীর আবহাওয়া সৃষ্টি করে, যার ফলে সমাজের ভিত্তিমুল সুদৃঢ় হয়, শক্তিশালী হয়। এইরূপ আর্থিক ব্যবস্থাই আমাদের কাম্য।

চতুর্থ অধ্যায়

পুঁজি, শ্রম ও মূল্য

আমরা সমাজে সকল জিনিসেরই মূল্য যাচাই করে দেখি কোন একটি নির্ধারিত মানদণ্ডের সাহায্যে। মানুষের মূল্যাঙ্কনের ক্ষেত্রে মানদণ্ড এক হয়। আর জিনিসের বিচারের মানদণ্ড ভিন্ন। মানুষের ভালমন্দ বা দোষগুণ বিচারের জন্য আমরা এক প্রকারের নৈতিক মানদণ্ড ব্যবহার করি। আর জিনিসের ক্ষেত্রে, কোন সময় মণ সের (বর্তমানে কিলোগ্রাম পদ্ধতিতে), কোন সময় সংখ্যায়, কোন সময় অনুভূতির তারতম্যের দ্বারা। যেমন যখন বলা হয়, কি সুন্দর ফুল। আজ প্রচণ্ড গরম পড়েছে, ইত্যাদি।

তদ্রূপ মানুষের আর্থিক জীবনে ও ক্রিয়াকর্মে কতকগুলি মানদণ্ড প্রযুক্ত হয়। আধুনিক কালে, শিল্প ব্যবসা বাণিজ্যে প্রগতির মূল্য যাচাই করা হয় প্রধানতঃ উৎপাদনের পরিমাণ তথা মুনাফা হতে। পুরাকালে শিল্পী প্রধানতঃ প্রয়োজনের দৃষ্টিতে দ্রব্যসম্ভার উৎপাদন করত। তাছাড়া, নিছক শিল্পের দৃষ্টিতেও বিভিন্ন প্রকার শিল্পকর্ম, সূক্ষ্ম স্থাপত্য প্রভৃতি নির্মিত হত। সমাজে তার সমাদর ছিল বৈকি। কিন্তু বর্তমান কালে মুদ্রা অর্থনীতির প্রচলন ও শিল্প-ব্যবস্থায় যান্ত্রিক পদ্ধতির প্রবর্তনের ফলে সমাজের আর্থিক ব্যবস্থায় যেন এক বিরাট্ পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। সকল কিছুর আর্থিক মূল্যই আজ অর্থ-নীতিবিদ্‌দের কাছে, পরিকল্পনা-বিশেষজ্ঞদের কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। সমাজে নৈতিক মূল্য, সৌন্দর্য-অনুভূতির মূল্য প্রভৃতি যেন পিছনে সরে যাচ্ছে। আর তার ফলেই দেখা যাচ্ছে মানুষের জীবন-যাত্রার পরিবর্তন। পুরাকালের চাষী, গৃহশিল্পীর আজ সামাজিক মূল্য কতটুকু আছে? কেন না, তাদের উৎপাদিত দ্রব্য সমূহের আর্থিক মূল্য আজকের সমাজে কমে গেছে। আর্থিক মূল্যের দ্বারাই সবকিছুর প্রকৃত বিচার করা যায় না। জলে ডুবে যাচ্ছে এমন কাউকে যে ব্যক্তি উদ্ধার করল তার এই পাঁচ মিনিট সময়ের সেবার

মূল্য কোন্ মানদণ্ডে বিচার করা হবে? মা সন্তানকে, পুত্র বৃদ্ধ পিতামাতাকে যে সেবা করেন, গুরু শিষ্যকে যে জ্ঞান দান করেন তার মূল্য ঘণ্টা হিসাবে কি করা যায়? সেজন্য নৈতিক বস্তুর মূল্য কখনই ভৌতিক বস্তুর দ্বারা নির্ধারিত করা সম্ভব হয় না। এই সব অমূল্য সেবাকার্যের মূল্য পয়সার দ্বারা পরিমাপ করা যায় না। কোন কিছুর মূল্যাঙ্কন করার সময় আমাদের তাই কর্মের প্রকৃতি সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে।

আর্থিক মূল্যকে সমাজে এইভাবে আজ যে মর্যাদায় ভূষিত করা হচ্ছে তার ফলে শ্রমের মূল্য অবহেলিত হচ্ছে। মানুষের জীবনের যে বিভিন্ন দিক আছে, সে সকল দিকেরই পূর্ণাঙ্গ বিকাশলাভ করা উচিত। কিন্তু আজ তার বদলে মানুষের আর্থিক জীবনকে কেবল-মাত্র উচ্চমানে অধিষ্ঠিত করার যে প্রবণতা দেখা দিয়েছে তার ফলে মানুষ হিসাবে আমরা নিম্নমানের হয়ে পড়ছি। এই আর্থিক মানদণ্ডের বিচার আমাদের সমাজের একাংশকে আজ যেভাবে ক্ষয়িষ্ণু করে ফেলেছে তার দুটি বাস্তব উদাহরণ দিয়েছেন ডাঃ কুমারাপ্পা তাঁর আপন জীবনের ঘটনা হতে।

ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে বর্তমান কেরালা প্রদেশে সুন্দর ও সূক্ষ্ম পাতা দিয়ে তৈরি এক প্রকারের নরম মাদুর হয়। একবার সেখানে তিনি এই সব মাদুরের তৈরি পদ্ধতি দেখতে গিয়েছিলেন। গ্রামের প্রধান মাদুরশিল্পী একজন মুসলমান ভাই সবকিছু দেখালেন। পরিবারের মধ্যে মা, ছেলেমেয়ে সকলে কেমন করে কাজে অংশ গ্রহণ করে তা বলার পর সেই শিল্পী যেন অভিযোগের সুরে বললেন যে, আমাদের পিতা, পিতামহরা এই কাজ করেই অর্থ উপার্জন করে এই দোতলা বাড়ী তৈরি করে গেছেন, আর আজ আমরা সেই একই কাজ করা সত্ত্বেও ঘর মেরামতের জন্যও কিছু করতে পারি না কেন? কুমারাপ্পাজী ভেবে চলেছেন কি বলবেন এর উত্তরে? পরে দুপুরে খাওয়ার জন্য সেই শিল্পী যখন আসন পেতে দিল তখন দেখা গেল, তার মধ্যে সম্মানিত অতিথির জন্য যে আসনটি ছিল তা ছিল সুদৃশ্য বাঘ মার্কা জাপানী মাদুর। অথচ, অপর দুইজনের জন্য দেওয়া

হয়েছিল তাদের হস্তনির্মিত মাদুর। এতক্ষণে সেই শিল্পী ভাইয়ের মুল প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেয়ে কুমারাপ্পাজী বললেন যে, আমাকে প্রধান অতিথি ভেবে সম্মান প্রদর্শনের জন্য আপনি এই জাপানী মাদুরে বসতে দিয়েছেন। অর্থাৎ, আপনি আপনার শ্রমে উৎপাদিত দ্রব্য অপেক্ষা বিদেশী দ্রব্যের অধিক মর্যাদা যদি দেন তবে আপনার তৈরি জিনিস অপরে কিনবে কেন?[১]

আমাদের প্রাচীন কালের সুপ্রতিষ্ঠিত কুটির তথা গ্রামশিল্পের অবনতির কারণ আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন। ফলে, সামাজিক মূল্য ও সামাজিক অবস্থায় আজ পটপরিবর্তন হয়েছে। এরূপ দৃষ্টান্ত আরও অনেক দেওয়া যায়। তাঁতি নিজে কাপড় বুনছে। কিন্তু বাজার হতে পরিধানের জন্য মিলের কিছু সস্তা কাপড় কিনে আনছে। এ সবের পিছনে মুল কথাই হচ্ছে মুল্যাঙ্কনের মানদণ্ড, বিচারের মাপকাঠি, দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়েচে কালের পরিক্রমায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পীবৃন্দ আজ তাই মিলে তৈরি সস্তা জিনিসের সহিত প্রতিযোগিতায় হটে যাচ্ছে। সেইজন্য যে অর্থনীতি কেবলমাত্র আর্থিক মানদণ্ডের বিচারে সকল কিছুর মূল্য নিরূপণ করে, সেখানে সমাজে ন্যায়বিচার লুপ্ত হয়। সমাজে সেইজন্য স্থায়িত্বের অর্থনীতি কায়েম করতে হলে কোন্ মানদণ্ডে আমরা বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্যাঙ্কন করব তা স্থির করা প্রয়োজন। গান্ধীজী যে সর্বোদয় সমাজ স্থাপনের কথা ভেবেছিলেন তার জন্য যে মানদণ্ডের প্রয়োজন হবে সেইরূপ আর্থিক কাঠামোই তিনি প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। সেখানে নৈতিক মুল্য ও সামাজিক মূল্যের যথাযথ ব্যবস্থা থাকবে। আর্থিক মূল্যের অত্যধিক প্রাধান্য দেওয়ার ফলেই আজ সমাজে বহুবিধ জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামগুলি কাঁচামাল প্রভৃতি শহরের কলে কারখানায় পাঠাতে বাধ্য হয় মুদ্রা- অর্থনীতির কারসাজিতে। এইভাবে গ্রামবাসীরা কর্মহীন। সম্পদহীন অবস্থায় দারিদ্র্যের গ্লানি ও নির্যাতন ভোগ করছে। গ্রামে কুটির ও গ্রামশিল্প সমুহ বিনষ্ট করে বড়-বড়

১ Economy of Permanence—I.

কারখানা পুঁজির জোরে অধিক উৎপাদনের ধোঁকায় গ্রামগুলিকে অবিরাম শোষণ করে চলেছে। এইভাবে গ্রামে উৎপন্ন দ্রব্য অপেক্ষা শহরের কলে সস্তায় উৎপন্ন দ্রব্যের প্রতি অধিকতর আকাঙ্ক্ষী, শিল্প-কর্মের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য অপেক্ষা অধিক মজুরির প্রতি দৃষ্টি পরিবর্তিত হওয়ায় প্রাচীন মূল্যমানের মর্যাদা আজ আর নাই।

শরীরশ্রম

গান্ধীজী কল্পিত আদর্শ সমাজে শরীরশ্রম এক গুরুত্বপূর্ণ বিধান-রূপে বিবেচিত হয়। এর কারণ কি? কেউ কেউ বলে থাকেন, বিজ্ঞান তথা যন্ত্রবিরোধী উন্নত ধরনের আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার তিনি সমর্থন করেন না বলে শরীরশ্রমের উপর নির্ভরশীল হয়েছেন। কিন্তু প্রকৃত সত্যের সঙ্গে এই সব যুক্তির কোন সম্পর্ক নেই।

গান্ধীজী যে শোষণমুক্ত অহিংস স্বাবলম্বী সমাজ গঠনের প্রচেষ্টা করেছিলেন, শরীরশ্রম তার জন্য এক অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। শরীরশ্রমকে তিনি অন্নশ্রম (Bread Labour) রূপে বর্ণনা করেছেন। বর্তমান কালে শিক্ষিত সমাজ ক্রমেই শরীরশ্রমরূপ আদি অনন্ত-কালের কীর্তি হতে দূরে সরে যাচ্ছে বলে আর্থিক অসাম্য তথা শোষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষ কেবলমাত্র তার বুদ্ধির মূলধনে জীবিকা নির্বাহ করবে গান্ধীজীর কাছে এই ব্যবস্থা মোটেই বাঞ্ছনীয় ছিল না। তাই তিনি পুনরায় তাঁর রচিত গঠনকর্মের কেন্দ্রসমূহে শরীরশ্রম রূপ যজ্ঞকর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার দ্বারা সমাজের এই অমোঘ বিধান 'মানুষ আপন শ্রমের দ্বারা অন্নের সংস্থান করবে' এই নীতির পুনরুদ্ধারের ব্রত নিলেন।

টলস্টয় ও রাসকিনের লেখা পড়ে গান্ধীজী শরীরশ্রম অর্থাৎ বাঁচার জন্য, জীবনধারণের জন্য মানুষকে কিছু না কিছু শ্রম করতে হবে এই নীতির অনুরাগী হলেন। অন্নশ্রমের গুরুত্ব রুশ দেশের লেখক বঁদারেফ (T. M. Bondaref) কর্তৃক সর্বপ্রথম ঘোষিত হয়েছিল। গীতার তৃতীয় অধ্যায়েও বলা হয়েছে, 'কোনরূপ যজ্ঞকর্ম ব্যতীত যিনি অন্ন গ্রহণ করেন তিনি চৌর্য-অন্ন গ্রহণ করেন'। এই

যজ্ঞকর্মই হচ্ছে অন্নশ্রম। আমি সমাজে জীবনধারণ করব। কিন্তু আমার সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদনের দায়িত্ব কে গ্রহণ করবে? আমার দ্বারা কি এরূপ কোন উৎপাদক কর্ম করা সম্ভব হবে না? গান্ধীজী এই সহজ প্রশ্নই আজকের দিনে বুদ্ধিজীবী সমাজের কাছে রেখেছেন। আধুনিক অর্থনীতিশাস্ত্রে যেখানে শ্রমবিভাগের (Division of Labour) নীতির কথা বলা হয়েছে, সেখানে এক শ্রেণী শ্রমের কাজ করবে, অপর এক শ্রেণী তাতে বুদ্ধি সহযোগে সেই কর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করবে এতে আর আপত্তি কি? কিন্তু আপত্তির কোনই কারণ থাকত না যদি শ্রমকে আমরা হেয় মনে না করতাম, যদি শ্রমের মূল্য ও বুদ্ধির মূল্যের সমতা স্বীকৃত হত, যদি শ্রমিক ও কিষাণ উকিল, অফিসার, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তারের ন্যায় সমাজে সমান আর্থিক ও সামাজিক মর্যাদার অধিকারী হত। কিন্তু কোথায় আজ সেই অবস্থা? আজ শ্রমবিভাগের নীতির আমদানির ফলে, আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় হস্তশ্রমের কোন কার্যক্রম না থাকায় সমাজ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে: হুজুর ও মজুরের সমাজ। আরও বিপদের কথা এই যে, আজ যে মজুর সেও চায় তার এই অবনত অবস্থা হতে মুক্ত হয়ে পরশ্রমোপজীবী হুজুর শ্রেণীভুক্ত হতে। স্থির-ভাবে চিন্তা করলেই বুঝা যাবে যে, কোন স্বাধীন দেশ দীর্ঘদিন এইভাবে শ্রমের অমর্যাদা করে অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না। রোম সাম্রাজ্যের ন্যায় সুসভ্য দেশেও নাগরিকগণ হাতে কাজ করা হেয় জ্ঞান করতেন। অপরকে খাটানোই তাঁদের অধিকার স্বরূপ ভাবতেন। সেইজন্য ঐতিহাসিক গীবনের এই উক্তি: "রোমান জাতি শরীরশ্রমকে অত্যন্ত হীন বলে গণ্য করে।" এই শ্রমবিমুখতা ঐশ্বর্যশালী রোম সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম হেতু।

গান্ধীজী সেইজন্য আদর্শ সমাজবিধানে শরীরশ্রমকে এক অতি আবশ্যক কর্ম মনে করতেন। জীবনে যাঁরা সত্য, অহিংসা ও ব্রহ্মচর্য পালন করার চেষ্টা করেন তাঁদের নিকট শরীরশ্রমের গুরুত্ব অসীম।' মানুষের জীবনের পূর্ণ বিকাশের পক্ষে কৃষিকর্ম এক অতি উপযোগী শ্রম। কিন্তু সকলের পক্ষে যদি তা সম্ভব না হয় তবে জীবনধারণের

জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন শ্রমের কাজ যথা, সুতা কাটা, কাপড় বুনা, কাঠের কাজ প্রভৃতি কাজে অংশ গ্রহণ করাও বিধেয়। এই দৃষ্টিতে সকলকে আপনার পরিবেশে মেথর ও ঝাড়ুদারের সাফাই কর্মেও সক্রিয়ভাবে যোগদান করা উচিত। সমাজে বর্তমানে এই সব কাজের যে মর্যাদা নাই তা আনয়ন করা সম্ভব যদি প্রত্যেকে অত্যাবশ্যক কাজের দৃষ্টিতে শরীরশ্রমকে জীবনের সঙ্গে সমন্বিত করে। এইরূপ একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কর্মকে যেখানে সর্বনিম্ন স্তরে নামিয়ে আনা হয়, নিঃসন্দেহে সে সমাজ নিম্নগামী ও অধঃপতিত হয়েছে বলা যায়। সমাজ হতে এই সামাজিক পাপ দূরীকরণের জন্য গান্ধীজী একে নিত্যকর্মরূপে দেখেছেন। সেইজন্য তিনি বলেছেন, "বুদ্ধিপূর্বক অন্নশ্রম যে কোন সময়ে সমাজসেবার শ্রেষ্ঠ রূপ।"[১]

বর্তমানে অবশ্য শ্রমের মর্যাদা দানের উদ্দেশ্যে শিক্ষা-ব্যবস্থায় কিছু সমাজসেবামুলক কার্যক্রম যুক্ত করার প্রচেষ্টা দেখা যায়। কিন্তু এইটেই যথেষ্ট নয়। সকলের জীবনে শ্রমের প্রতিষ্ঠা চাই। সমাজে শ্রমজীবী ও বুদ্ধিজীবীর সমমর্যাদা হওয়া চাই। গান্ধীজী তাই শ্রমকে যজ্ঞস্বরূপ, ঈশ্বর-আরাধনার তুল্য কাজ মনে করতেন।

প্রিন্স ক্রোপতকিন্ তাঁর 'এনার্কিস্ট কম্যুনিজম্' গ্রন্থে বলেছেন, 'কাজ আমাদের কাছে নেশার ন্যায়, আলস্য একটি নকল সৃষ্টি।' শ্রমের কাজকে হেয় জ্ঞান করা আর অত্যধিক শ্রমের পরে বিরামের প্রশ্ন দুটি পৃথক্ বস্তু। আমাদের দেশে যেখানে লোকের হাতে কাজ দেওয়াই হচ্ছে মুখ্য কথা, সেখানে বিরামের প্রশ্ন আসে কিভাবে? তাছাড়া, যে সমাজ যত বেশী শ্রমনির্ভর, যত বেশী স্বাবলম্বী, সে সমাজ তত শোষণহীন আর্থিক ক্ষমতার পথে অগ্রসর হয়েছে। সেইজন্য গান্ধীজী এক প্রশ্নের উত্তরে একদা বলেছিলেন:

"ধরুন, আমেরিকা হতে কতিপয় ধনী ব্যক্তি আমাদের সমস্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য বিনামূল্যে পাঠাবার প্রস্তাব করলেন। আমাদের কাজ করার বদলে তাদের এই সেবার অধিকার দেওয়ার কথা যদি

১ India of My Dreams

বলেন তবে আমি সরাসরি তাঁদের এই দান প্রত্যাখ্যান করতে দ্বিধা করব না। প্রধানতঃ এইজন্য যে, ইহা আমাদের জীবন-সত্তার, অর্থাৎ মানুষ তার জীবিকার জন্য শ্রম করবে—এই মহান্ নীতির মূলে কুঠারাঘাত করবে।"[১]

বার্নার্ড শ' তাঁর স্বভাবসিদ্ধ তীক্ষ্ণ লেখনীতে বলেছেন, 'নরকের সর্বশ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা হচ্ছে অনন্ত বিরাম।'[২] ('The best definition of Hell is perpetual holiday')

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, তবে কি গান্ধীজী বুদ্ধিশ্রমের বিরোধী? বুদ্ধিশ্রমের কি কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই সমাজে? বৈজ্ঞানিক দার্শনিক কবি সাহিত্যিক প্রভৃতির শিল্পকর্মের কি কোনই মূল্য নাই? গান্ধীজী নিজেই এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বলেছেন, "আমাকে যেন ভুল বুঝো না হয়। বুদ্ধিশ্রমের মূল্যহানি আমি করছি না, কিন্তু কোন পরিমাণ বুদ্ধিশ্রমই শরীরশ্রমের পরিপূরক হয় না। সর্বসাধারণের কল্যাণে শ্রম দান করার জন্যই আমরা জন্ম নিয়েছি। প্রায়শঃই বুদ্ধিশ্রম শরীরশ্রম হতে বহুগুণে মূল্যবান, কিন্তু কখনই তা শরীরশ্রমের পরিবর্তে ব্যবহার করা যায় না।···প্রকৃতপক্ষে, ধরিত্রীর বক্ষে উৎপন্ন দ্রব্যাদি ব্যতীত বুদ্ধিশ্রমজাত ফসল অলীক বস্তুতে পরিণত হবে।" (ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৫-১০-২৫)

বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের সমাজে হেয় প্রতিপন্ন করা গান্ধীজীর উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু তিনি চাইতেন সমাজে শ্রমের নিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত হোক, শ্রমের অপরিহার্যতা স্বীকৃত হোক। তাই তিনি শ্রমের সর্বজনীন প্রয়োগের কথা বলেছেন। এমনকি শিক্ষক, ডাক্তার, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতির ন্যায় সমাজ-পরিচালকবৃন্দ যদি শ্রমের যথাযোগ্য স্থান দেবার উদ্দেশ্যে আপন আপন জীবনে শ্রমের মর্যাদাজনক আচরণ করেন তবে তাতে সমাজে ওই মহান্ নীতিকে আবাহন জানানো হবে। এই প্রসঙ্গে গান্ধীজীকে একদা ভারী সুন্দর একটি প্রশ্ন করা হয়েছিল ঃ

১ হরিজন, ৭-১২-৩৫

২ Intelligent Woman's Guide to Socialism & Capitalism

প্রশ্ন ঃ রবীন্দ্রনাথ কিংবা রমনের ন্যায় ব্যক্তিদের কেন আমরা কায়িক শ্রমের দ্বারা জীবিকা নির্বাহের জন্য অনুরোধ করব ? এ কি নিছক অপচয় নয় ? বুদ্ধিজীবীদের কেন শ্রমজীবীদের সঙ্গে সমানরূপে গণ্য করা হবে না ? যেহেতু উভয়েই প্রয়োজনীয় সামাজিক কর্ম করেন ?

উত্তর ঃ বুদ্ধিজীবীদের কর্ম মূল্যবান এবং জীবনচর্যায় নিঃসন্দেহে এর এক স্থান আছে। কিন্তু শরারশ্রমের প্রয়োজনীয়তার উপরই আমি জোর দিই। আমার মনে হয় কারুর পক্ষেই শরীরশ্রম হতে রেহাই নেওয়া উচিত নয়। এমনকি, এর ফলে তার বুদ্ধি ও চিন্তাজাত উৎপাদনের গুণ বৃদ্ধি পাবে। এ কথা বলা যায় যে, প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণের দেহ ও মন এই উভয়ের কর্ষণ করতেন। কিন্তু তাঁরা যদি তা নাও করে থাকেন তা সত্ত্বেও বর্তমান কালে শরীরশ্রমের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।" (হরিজন, ২৩-২-৪৭)

পুঁজিপতি ও শ্রমিক

ভারতের জনজীবনের প্রায় প্রত্যেক দিকে গান্ধীজী নিজেকে যুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। বিদেশী পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনরূপ বৃহৎ কর্মযজ্ঞে তিনি নেতৃত্ব দিয়েই ক্ষান্ত হন নাই। জাতীয় জীবনের অপর সকল মৌলিক ত্রুটির প্রতি গান্ধীজীর বৈপ্লবিক দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। তাই না তাঁর গঠনকর্মের সামগ্রিক পরিকল্পনা। স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি এমন এক কর্মীবাহিনী তথা প্রতিষ্ঠান গঠন করেছিলেন যার মাধ্যমে সামাজিক ও আর্থিক জীবনের বিভিন্ন ত্রুটি দূর করার জন্য সমান শক্তি প্রয়োগ করেছিলেন।

দেশে শিল্পের প্রগতি বেড়ে চলেছিল। আধুনিক কেন্দ্রিত যন্ত্র-শিল্পে মূলধন একটি প্রধান উপকরণ। তাই স্বভাবতঃই শিল্পে শিল্পপতি হন তাঁরা যাঁরা এই প্রচুর পরিমাণ মূলধন যোগাবার দায়িত্ব নেন। শ্রমিকের শ্রম উৎপাদনকর্মে সমানভাবে প্রয়োজনীয় হলেও

১ Towards Non-violent Socialism

শ্রমের সমমর্যাদা নাই। পুঁজিপতি অধিক মুনাফার আশায় যথাসাধ্য শ্রমিককে শোষণ করে থাকেন—প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভাবে। শ্রমের অনুপাতে কম মজুরি দেওয়া, অধিক সময় কাজ করাতে বাধ্য করা, লভ্যাংশের হার হতে বঞ্চিত করা, শ্রমিককে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রাখা—এ সকলই হচ্ছে কোন না কোন প্রকারের শোষণ। তাই শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়। পরিণামে নানা জটিলতার উদ্ভব হয়। যেমন, ধর্মঘট, মালিক কর্তৃক কারখানা বন্ধ করে দেওয়া, গুণ্ডামি প্রভৃতি।

অহিংসার আদর্শে বিশ্বাসী গান্ধীজীর নিকটও শ্রম ও পুঁজির এই পারস্পরিক বিরোধ বা সংঘর্ষের প্রশ্ন এসেছিল। তিনি যেমন কিষাণ, গ্রামশিল্পীদের সমস্যা নিয়ে প্রভূত আলোচনা করেছেন, তদ্রূপ সমভাবেই শিল্পক্ষেত্রে এই মৌলিক সমস্যা, পুঁজি ও শ্রমের সংঘর্ষজাত সমস্যার প্রতিও দৃষ্টি দিয়েছেন। শ্রমিক আন্দোলনে নূতন পথের সন্ধান দিয়েছেন। আমেদাবাদে ১৯১৮ সালে গান্ধীজী স্বয়ং তাঁর নেতৃত্বে মিলশ্রমিকদের যে অহিংস আন্দোলন করেছিলেন তা ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে নূতন পথের দিশারী। এমনকি, শেষ অবধি গান্ধীজীকে একুশ দিন অনশন পর্যন্ত করতে হয়েছিল। কিন্তু এই সকলের পিছনে ছিল মানবপ্রেম। মিলমালিকদের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে তিনি শ্রমিকদের কখনও উত্তেজিত করেন নাই। এ সম্বন্ধে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি লিখেছেন, "১৯১৭ সালে আমেদাবাদে শ্রমিক ধর্মঘটের সময় আমার অনশন ছিল 'প্রেমিকদের' বিরুদ্ধে যাঁরা ছিল মিলশ্রমিক, কিন্তু অত্যাচারী মালিকদের বিরুদ্ধে নয়।"[১] মিলমালিকেরা নিশ্চয়ই এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু শ্রমিক ভাইয়েরা আপনাদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বারংবার ভঙ্গ করার ফলেই গান্ধীজীর এই অনশন। এর ফল তাদের উপরও অত্যাশ্চর্য হয়েছিল।

শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে সকল শান্তিপূর্ণ উপায়

১ Towards Non-violent Socialism, পৃঃ ৯৭

পরীক্ষিত হবার পরে নির্যাতিত শ্রমিক সমাজের কাছে যে সর্বশেষ অস্ত্র থাকে তা হল ধর্মঘট। আধুনিক কালে শ্রমিক ধর্মঘট যদিও রাজনৈতিক দলসমূহের একটি প্রধান কার্যক্রমরূপে গৃহীত হয়েছে, কিন্তু গান্ধীজী ছিলেন এর বিরোধী। ধর্মঘটে শ্রমিকদের অন্তিম জয় সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হতে হলে গান্ধীজী তাঁর অভিজ্ঞতায় নিম্নলিখিত কয়েকটি অপরিহার্য শর্ত পালনের কথা উল্লেখ করেছেন:

(১) ধর্মঘটের কারণ ন্যায়ভিত্তিক অবশ্য হওয়া চাই।

(২) ধর্মঘটীদের মধ্যে বাস্তবতঃ মতৈক্য থাকা চাই।

(৩) যাঁরা ধর্মঘটে যোগ দেন নাই তাঁদের বিরুদ্ধে কোনরূপ হিংসার আশ্রয় লওয়া অনুচিত।

(৪) ধর্মঘটকালীন সময়ে ধর্মঘটী শ্রমিকবৃন্দ কোন উৎপাদন-মূলক কর্মের মাধ্যমে নিজেদের ব্যয় মিটাতে সক্ষম হবেন। তাঁরা কোনরূপ চাঁদা বা বাইরের সাহায্যের উপর কখনও নির্ভরশীল হবেন না।

(৫) ধর্মঘটী শ্রমিকরা একটি নিম্নতম অপরিবর্তনীয় দাবী স্থির করবেন এবং ধর্মঘটে যোগদানের পূর্বে ইহা সর্বসমক্ষে ঘোষণা করবেন।[১]

গান্ধীজীর মতে যেহেতু সমাজে উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা সর্বকালেই সমান, সেজন্য উৎপাদনের দুই প্রধান উপাদান হিসাবে পুঁজি ও শ্রমের প্রয়োজনীয়তাও সর্বকালীন। তিনি উৎপাদন যন্ত্রের এই দুই বাহুকে একটি সহযোগী বন্ধনে বাঁধতে চেয়েছিলেন যাতে পরস্পরের সমবায়ে ও সমন্বয়ে সমাজে সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। উভয়ের মধ্যে সহভোগ তথা সহযোগের আদর্শ স্থাপিত হয়। মার্কসবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে গান্ধীর অহিংস দৃষ্টিভঙ্গীর এইখানে এক প্রধান মৌলিক প্রভেদ। মার্কসবাদের 'সর্বহারার একনায়কত্ব' যেমন গান্ধীজী সমর্থন করেন নাই, তেমনি পুঁজিবাদের শোষণ ও নির্যাতনেরও তিনি বিরোধী ছিলেন। তাই তিনি পুঁজি ও শ্রমকে অর্থাৎ, শ্রমিক ও

১ Towards Non-violent Socialism. পৃঃ ৯০. ৯২

মালিককে আপন কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত করার সঙ্গে সঙ্গে অপরের প্রতি প্রেমপূর্বক আচরণের কথা বললেন, যৌথ মালিকানার কথা বললেন, যৌথ অংশীদারত্বের কথা বললেন। এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে কিছু আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে। শ্রমিকদের বিভিন্ন সভায় গান্ধীজী তাঁর মতামত খুব স্পষ্ট করে প্রকাশ করেছেন।

বাঙ্গালোরে ধর্মঘটী শ্রমিকবৃন্দের এক সভায় তিনি বললেন, "জনসাধারণের সহিত সংস্পর্শে আসার সময় হতেই আমিও আপনাদের ন্যায় একজন শ্রমিকরূপেই আছি।

"পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে কোনরূপ সংঘর্ষের প্রয়োজনীয়তা আছে, এরূপ আমি ভাবি না। প্রত্যেকেই অপরের উপর নির্ভরশীল। বর্তমানে যা অত্যাবশ্যক তা হচ্ছে, শ্রমিকের উপর পুঁজিপতি তাঁর কর্তৃত্ব খাটাবেন না। আমার মতে, শেয়ারহোল্ডারদের ন্যায় ঠিক সমপরিমাণেই শ্রমিকরাও কারখানার মালিক। আর মিল মালিকরা যখন বুঝবেন যে শ্রমিকরা ঠিক তাঁদেরই মত সমপরিমাণে মালিক, তাঁদের উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ থাকবে না। কিন্তু পৃথিবীতে সকল অধিকারের সঙ্গেই কর্তব্যও জড়িত থাকে। কোন মালিক তাঁর সম্পদ নষ্ট করেন না। আপনারা যখন জানবেন যে মালিকদের ন্যায় এই কারখানা আপনাদেরও, তখন কখনও আপনারা আপনাদের সম্পত্তি নষ্ট করবেন না।"[১]

শ্রমিকদের শিশুদের জন্য একটি ক্রেশ্ (creche) ভবনের উদ্‌বোধন উপলক্ষে গান্ধীজী মালিকদের উদ্দেশ্য করে বললেন—

"...অতএব আমি আপনাদের কাছে এই আশা করি যে, আপনারা আপনাদের সকল সম্পদ গরীবদের স্বার্থে ব্যবহারের জন্য ট্রাস্ট হিসাবে রাখুন। গরীবদের ঘর্মাক্ত শ্রমের বলেই আপনারা এই সম্পত্তি ও মর্যাদার অধিকারী। আমি চাই আপনারা আপনাদের সম্পদের সহ-অংশীদাররূপে শ্রমিকদের গ্রহণ করুন। আমি এ কথা বলছি না যে, আপনারা আইনের বলে এই সব না করলে শ্রমিক অভ্যুত্থান

১ ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৪-৮-২৭

হবে। আমার মতে এর মূলে একটি শক্তিই ক্রিয়াশীল। তা হচ্ছে পিতা-পুত্রের মধ্যে যে পারস্পরিক প্রেম ও শ্রদ্ধা বিদ্যমান সেই শক্তি—কোনরূপ আইনের শক্তি নয়। আপনারা যদি পারস্পরিক এই প্রেমের সম্বন্ধ স্বীকার করেন তবে সকল শ্রমিক অসন্তোষ দূরীভূত হয়ে যাবে, আর সেক্ষেত্রে শ্রমিকবৃন্দ কোনরূপ ইউনিয়ন সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে না।"[১]

গান্ধীজী তাই সামগ্রিক সমাজকল্যাণের দৃষ্টিতে শ্রম ও পুঁজিরূপ দুই শক্তিকে বিরোধী শক্তিতে রূপান্তরিত করার বদলে এক সহযোগী সম্মিলিত শক্তিতে রূপায়িত করার পথের সন্ধান দিয়েছেন। যা মিলিত করে, তাই শক্তিশালী করে। যা বিচ্ছিন্ন করে, তা দুর্বল করে। এই চিরন্তন সত্যকে গান্ধীজী যে দক্ষতার সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন, ভবিষ্যৎকাল তার সফলতার স্বাক্ষর বহন করবে। ইতোমধ্যে পশ্চিমের শিল্পোন্নত বিভিন্ন দেশে কারখানা পরিচালনার ব্যাপারে যৌথ দায়িত্ব তথা সহ-অংশীদারত্বের (Co-partnership) নীতি বাস্তবে রূপ নিতে আরম্ভ করেছে।

গান্ধীজীর দৃষ্টিতে সমাজবাদের সংজ্ঞা কি? পৃথিবীর অনেক দেশই আজ গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র প্রভৃতি নামে ভূষিত। কিন্তু বাস্তব অবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই বিপরীত। যে সমাজব্যবস্থায় সমাজে সকল সদস্যের সমান অধিকার বর্তমান, গান্ধীজীর নিকট তা হচ্ছে সমাজবাদ। তিনি মনে করেন যে, ব্যক্তির শরীরে মাথা সর্বউচ্চে বিদ্যমান বলে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন নয়, আবার পায়ের পাতা সর্বনিম্নে আছে বলে তাও হেয় নয়। মানবদেহের বিভিন্ন অংশ যেমন সমান, তদ্রূপ সমাজ-দেহের সকল সদস্য সমান। ইহাই সমাজবাদ।[২]

এরূপ সমতা, এরূপ সমাজবাদ আনার পথ কি? যেহেতু ইহা স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ, সেজন্য অনুরূপ শুচিশুদ্ধ পন্থাও তজ্জন্য আবশ্যক। গান্ধীজী সেজন্য তথাকথিত সামরিক অভ্যুত্থান, হিংসাত্মক

১. Towards Non-violent Socialism

২ হরিজন, ১৩-৭-৪৭

অভিযান, বা রাজপরিবারের সকলকে নিধন করা প্রভৃতি চিরাচরিত পন্থাগুলিতে মোটেই আস্থাশীল নন। তাঁর মতে, "রাজকুমারের শিরশ্ছেদনের দ্বারা রাজকুমার ও কিষাণের মধ্যে সমতা আনা যায় না ; অথবা, কাউকে হত্যা করলেই হুজুর ও মজুরের সাম্য সাধিত হয় না।…অতএব, কেবলমাত্র সত্যনিষ্ঠ, অহিংস এবং শুদ্ধচিত্ত সমাজবাদীরাই ভারত তথা সমগ্র বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনে সমর্থ হবে।" (হরিজন, ১৩-৭-৪৭)

কিষাণ ও জমিদার

শিল্পে নিযুক্ত মালিক ও শ্রমিকদের সমস্যা ও সংঘর্ষ সম্বন্ধে উপরে আলোচনা করা হল। কিন্তু ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। তাই উৎপাদনের প্রধানতম উৎস হিসাবে কৃষির গুরুত্ব সর্বাধিক। কৃষি ও কিষাণদের সমস্যা সম্বন্ধে গান্ধীজী উদাসীন ছিলেন না। দক্ষিণ আফ্রিকা হতে ফিরে ভারতের জনজীবনে প্রবেশ করার পর গান্ধীজী প্রথম যে সমস্যার সম্মুখীন হলেন তা হল কিষাণদের সমস্যা। নীলচাষীদের উপর অত্যাচার। যা থেকে পরিণামে গান্ধীজীকে সত্যাগ্রহ (চম্পারণ সত্যাগ্রহ) পর্যন্ত করতে হয়েছিল। ভারতে এই ছিল প্রথম ঐতিহাসিক সংগ্রাম। আর তা ছিল কিষাণদের নিয়েই।* এর পরে গুজরাটে সর্দার বল্লভভাইয়ের সুযোগ্য নেতৃত্বে বারদৌলি সত্যাগ্রহ, সেও ছিল কিষাণদের খাজনা দেওয়ার সমস্যা নিয়ে। বিদেশী শাসকগণের বিরুদ্ধেই প্রধানতঃ ছিল এই সংগ্রাম। কিন্তু জমিদারী প্রথা, জমিদারদের দ্বারা গরীব কিষাণদের শোষণ প্রভৃতি সমস্যা সম্বন্ধেও তাঁর স্পষ্ট ধারণা ব্যক্ত করতে হয়েছে।

কলিকাতায় প্রেসকর্মীদের এক সভায় ভূমি ও জমিদারী সমস্যা সম্বন্ধে সমাজবাদীদের ধারণা ও গান্ধীমতের পার্থক্য কোথায় সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে গান্ধীজী বললেন, "জমিদারী প্রথার সংস্কার সাধন, না নিধন করা হবে (mended or ended) এই বিষয়েই

* প্রায় দশ লাখ কিষাণ এতে জড়িত ছিল। ছয় মাসের মধ্যে এই অহিংস সংগ্রাম জয়যুক্ত হয়েছিল।

আপনাদের ও আমার মধ্যে মতপার্থক্য বিদ্যমান। আমি বলি, এর সংস্কার সাধিত হওয়া বিধেয়। আর যদি সংস্কার না করা যায় তবে তা আপনা হতেই লয় পাবে।"[১]

এই সব বিষয়েও অহিংসা নীতির উপর ভিত্তি করেই গান্ধীজীর মতামত ব্যক্ত হয়েছে। আর সেই কারণে সমাজবাদী বা বিপ্লবী সাম্যবাদীদের মতের সঙ্গে গান্ধী-চিন্তার মৌলিক ব্যবধান অতিশয় সুস্পষ্ট। কতকগুলি প্রশ্নোত্তর নীচে দেওয়া হচ্ছে যা থেকে গান্ধীজীর মত ভালভাবেই প্রতিভাত হবে। একটি প্রশ্ন যা বহুমনকে অনেক সময়ে আলোড়িত করে তা হচ্ছে: "জমিদার ও মহাজনেরা আমলাতন্ত্রের ধারক। তারা বরাবর আমলাতন্ত্রের সঙ্গেই হাত মিলায় যা আমাদের প্রগতি ও স্বাধীনতার পথে প্রতিবন্ধক। এই অন্তরায় দূর করা হবে না কেন?"

এর উত্তরে গান্ধীজী তাঁর মতাদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বললেন, "সত্য, তারা আমলাতন্ত্রের ধারক ও বাহক। কিন্তু তারা এর অসহায় ধারক। তারা কি চিরকাল এইভাবেই থাকবে? তাদের আমাদের কাছ হতে দূরে ঠেলে দেবার উদ্দেশ্যে যেন কোন কিছু করা না হয়। তারা যদি তাদের মনোভাব বদলায় তবে তাদের বুদ্ধি জাতির সেবায় নিয়োজিত করা যায়। আর তারা যদি না বদলায় তবে সহজ স্বাভাবিকভাবেই তারা বিনাশ পাবে। আমরা যদি অহিংস হই তবে তাদেরকে ভীতিপ্রদর্শন করব না।"

প্রশ্ন: কিন্তু আমরা কি বলতে পারি না যে, জমিদারী প্রথা হল কাল-ব্যতিক্রম (anachronism), এবং তা অহিংস উপায়েই যাওয়া উচিত?

উত্তর: নিশ্চয়ই আমরা তা পারি। প্রশ্ন এই যে, তা কি করতেই হবে? আমরা জমিদারদের কেন বলতে পারি না, 'আপনাদের এই সব ত্রুটি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দূর করার জন্য আমরা আপনাদের বলছি।' আমি স্বীকার করি যে, এর দ্বারা মানবপ্রবৃত্তিতে বিশ্বাস স্থাপনের কথাই বলা হয়।

১. Towards Non-violent Socialism, পৃঃ ১২৭

প্রশ্নঃ আপনি কি বলবেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকা উচিত ?

উত্তর ঃ না, একে যেতেই হবে। কিষাণদের সুখী ও সমৃদ্ধিশালী করার পথ হচ্ছে, কিষাণদের বর্তমান দুরবস্থার কারণ জানা ও তা দূর করার উপায় সম্বন্ধে তাদের শিক্ষিত করে তোলা। আমরা তাদের অহিংস বা সহিংস পথের সন্ধান দিতে পারি। শেষোক্ত পথটি আকর্ষণজনক মনে হতে পারে। কিন্তু পরিণামে হিংসার পথ হচ্ছে ধ্বংসের পথ।

প্রশ্ন ঃ কিন্তু আপনি কি স্বীকার করেন না যে, যে চাষ করে সেই ভূমির মালিক ?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, আমি তা করি। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, জমিদারকেও নিধন করতে হবে। যে ব্যক্তি বুদ্ধি ও অর্থ যোগান দেয়, সেও হস্তশ্রম করে এমন চাষীর মতই একজন ব্যক্তি। আমাদের লক্ষ্য এই হওয়া উচিত যে, তাদের মধ্যে বর্তমানে যে ভয়ানক অসাম্য আছে তা দূর করা।

প্রশ্ন ঃ কিন্তু সংস্কার সাধনের পথ খুব দীর্ঘ হতে পারে।

উত্তর ঃ আপাতদৃষ্টিতে দীর্ঘতম পথ প্রায়ই ক্ষুদ্রতম হয়।

প্রশ্ন ঃ চাষীদের মধ্যে ভূমিবণ্টন করে দেন না কেন ?

উত্তর ঃ এ হচ্ছে হঠকারিতাপ্রসূত চিন্তা। জমি আজও তো তাদের হাতেই আছে। কিন্তু তারা তাদের অধিকার ও তার প্রয়োগ সম্বন্ধে আজ সচেতন নয়। মনে করুন, তাদের বলা হল যে জমি হতে তারা যেন না হটে আসে, কিংবা জমিদারকে খাজনা না দেয়। আপনি কি মনে করেন যে, কিষাণদের সকল দারিদ্র্য তা হলে দূর হয়ে যাবে ? নিশ্চয়ই আরো অনেক কিছু করবার থাকে। আমি বলি যে, এই কাজটিই এখন করা হোক। বাকী সব কিছু আপনা হতেই আসবে, যেমন করে দিনের পর রাত্রি আসে।”[১]

১. Towards Non-violent Socialism, পৃঃ ১২৮

গান্ধীজী অন্তিম পন্থা স্বরূপ সত্যাগ্রহের সম্ভাবনা কখনই বাদ দেন নাই। কিন্তু প্রথমেই সেই চরম পন্থা গ্রহণে উদ্যোগী হতেন না বা পরামর্শ দিতেন না। অন্যায়কারীকে তার কৃত অপকর্ম সম্বন্ধে উত্তমরূপে অবহিত করাই হবে প্রথম কাজ। কিষাণদেরও অধিকার ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে হবে। যদি এমন কোন হৃদয়হীন অত্যাচারী শোষক জমিদার থাকেন যিনি কোনরূপ যুক্তিতর্কের কথায় কর্ণপাত করেন না, যিনি কালের ইঙ্গিত বুঝে এগিয়ে আসতে ইচ্ছুক নন, যিনি সমান তালেই পূর্বের ন্যায় শোষণ ও অত্যাচার চালিয়ে যাবার জন্য কৃতসংকল্প, সেখানে কিষাণদের কী করণীয়? গান্ধীজী কি সেখানে পিছু হটে আসেন? তিনি কি অন্তিম সংগ্রামকে ভয় করেন? না, কখনই তা নয়। গান্ধীজী উভয় পক্ষকেই কিছু সময় দেন। দুষ্কৃতিকারীকে সংশোধনের জন্য সময় ও সুযোগ দেওয়া অহিংসা নীতির এক মূল কথা। কিন্তু তা বলে অন্যায়কে মাথা পেতে লওয়া বা অন্যায়ের নিকট নতি স্বীকার করা অহিংসা নীতি সমর্থন করে না।

এমনও অনেক সময় হয় যে, জমিদার তাঁর পূর্বের চাষীদের ছাড়িয়ে দিয়ে নতুন শ্রমিক নিযুক্ত করেন। কিন্তু চাষীরা হটে না এসে শান্তিপূর্ণভাবে তাদের অধিকার স্থাপনের উদ্দেশ্যে আন্দোলন চালিয়ে যাবে, যতদিন না নূতন আগত কিষাণ শ্রমিকরা পূর্বের ভাইদের দুঃখের কারণের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেন। এইভাবে, সত্যাগ্রহ হচ্ছে জনমনকে শিক্ষিত করে তোলার একটি পথ, যতদিন না তা সমাজের সকল শ্রেণীর মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে পরিশেষে দুর্জয় হয়ে ওঠে। হিংসার দ্বারা এই প্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়। আর সমগ্র সমাজব্যবস্থার বিপ্লব সাধনের প্রক্রিয়াকে তা বিলম্বিত করে।

গান্ধীজীর আদর্শানুযায়ী সত্যাগ্রহকে সফল করতে হলে তিনি মূল তিনটি সর্তের কথা বলেছেন যা এখানে উল্লেখ করা বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কেন না, সমাজজীবনের এই সব জটিল অথচ মৌলিক সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে যাঁরা ব্রতী হবেন, সেইসব অনুগামীরা এতে উপকৃত হতে পারেন। সর্তগুলি হচ্ছে :

(১) শত্রুর বিরুদ্ধে কোনরূপ বিদ্বেষ বা ঘৃণা পোষণ করা সত্যাগ্রহীর উচিত নয়।

(২) সত্যাগ্রহের কারণ সত্য ও যথোচিত হওয়া আবশ্যক।

(৩) উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়া অবধি শেষ পর্যন্ত সত্যাগ্রহীকে কষ্ট ভোগ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।[১]

১. Towards Non-violent Socialism, পৃঃ ১৩০

পঞ্চম অধ্যায়

স্বদেশী নীতি

সমাজের দরিদ্রতম ব্যক্তিটির উত্থানের জন্যই গান্ধীজী অন্ত্যোদয়ের কথা বলেছিলেন, সে কথা পুর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। গান্ধীজীর আর্থিক ভাবনা মুলতঃ মানুষের কল্যাণভাবনা হতেই উদ্ভুত। মানবীয় মূল্য (Human value) ক্ষুণ্ণ করে সমাজ আর্থিক প্রগতির উচ্চ চূড়ায় অধিষ্ঠিত হলেও তা গান্ধীজীর চোখে গৌরবের বিষয় বলে বিবেচিত হত না। অর্থনীতি যেন সর্বদা মানবনীতি, ন্যায়নীতিকে স্বীকার করে চলে এই ছিল তাঁর কাম্য। সেজন্য তিনি মনে করতেন, "যে অর্থনীতি ব্যক্তি বা জাতির নৈতিক উন্নতির পথে বিঘ্নস্বরূপ, তা নীতিবিরোধী, সুতরাং কলুষিত। আমার প্রতিবেশী মুদি যেখানে ক্রেতার অভাবে অনাহারে দিন কাটায়, সেখানে আমেরিকান গম ক্রয় করাও সমান অন্যায়।"[১]

ঠিক এই কারণেই গান্ধীজী স্বদেশী আন্দোলনের উপর এত গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। দুঃস্থতম মানুষটির শ্রমের মূল্য যাতে অবহেলিত না হয় গান্ধীজী তার জন্য গ্রামশিল্প, স্বদেশীব্রত প্রভৃতি শুরু করেছিলেন। স্বদেশে উৎপন্ন কোন বৃহৎ শিল্পজাত দ্রব্যের সংরক্ষণের জন্য গান্ধীজী স্বদেশী আন্দোলন করেন নাই।

প্রকৃতির বিধানের ন্যায় স্বদেশীধর্মও মানবজীবনের একটি মূলীভূত বিষয়। সাধারণ অর্থে 'স্বদেশী' বলতে বোঝায়, যা কিছু আপন দেশে তৈরি। কিন্তু বিদেশী দ্রব্য বর্জন করাই স্বদেশী ব্রতের একমাত্র লক্ষ্য নয়। স্বদেশে উৎপন্ন অনেক জিনিসের বর্জনের কথাও এর অন্তর্ভুক্ত। সেজন্য স্বদেশীর সহজতম অর্থ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে গান্ধীজী বলেছেন, "স্বদেশী ধর্মে অনুরাগী ব্যক্তি প্রথম কর্তব্য হিসাবে তাঁর পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশীর সেবায় নিজেকে সমর্পণ করবেন।"[১]

১ ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৩-১০-২১

১ Cent percent Swadeshi

প্রতিবেশীকে ভালবাস (Love thy neighbour) এই নীতির মধ্যেই গান্ধীজীর প্রকৃত স্বদেশী ব্রতের মূল তত্ত্ব নিহিত আছে। আর এর দ্বারা গান্ধীজী এই কথাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, নিকটতম প্রতিবেশীর প্রতি পবিত্র সেবা কখনই দূরতম ব্যক্তির প্রতি সেবা মনোভাবের অভাব বোঝায় না। স্বদেশী ধর্মের শুদ্ধতম অর্থে বিশ্ব-সেবাও বোঝায়। কিন্তু এর একটিমাত্র সর্ত এই যে, নিকটতম ব্যক্তির দিকে প্রথমে তাকানো উচিত। ইহাই স্বদেশী ধর্ম। ইহাই অর্থনীতির ক্ষেত্রে স্বধর্ম। গীতায় বলা হয়েছে, 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম ভয়াবহঃ'—আপন পরিবেশের ক্ষেত্রে গান্ধীজী একেই স্বদেশী ধর্ম বলেছেন। আপন প্রতিবেশীর উপকার করার অর্থ অপরের ক্ষতি সাধন করা নয়। আবার কখনও এমন অবস্থা আসতে পারে যখন স্বদেশী ব্রতীকে সর্বজনীন হিতের জন্য আপন পরিবারের সকলকেই বিসর্জন দিতে হতে পারে। তবে তা হবে সর্বোত্তম সেবা।

খাদি ও গ্রামশিল্পের পুনরুদ্ধার ও প্রচলন করা ছিল গান্ধীজীর দৃষ্টিতে প্রকৃত স্বদেশী। গান্ধীজীর নিকট সংগঠিত বৃহৎ শিল্পগুলির বিশেষ কোন সংরক্ষণের প্রয়োজন নাই। কিন্তু সারা দেশের গ্রামাঞ্চলে পরিব্যাপ্ত যে শত শত বিভিন্ন প্রকার শিল্প আজ জনসাধারণের সহায়তার অভাবে লোপ পেতে বসেছে, গান্ধীজী ওই সব শিল্পের গুণাগুণ বিচার করে তাদের পুনরুদ্ধার করার ব্রত নিয়েছিলেন তাঁর এই স্বদেশী আন্দোলনে। বড় বড় শিল্পকে তিনি এই কারণেই নূতন ব্যাখ্যার অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। কারণ, সেগুলি তো আপন শক্তিতেই দণ্ডায়মান রয়েছে। গান্ধীজীর পূর্বে স্বদেশী আন্দোলনের যে ধারা প্রচলিত ছিল তা হতে গান্ধীজী সমস্যার আরও মূলে প্রবেশ করলেন। আর এইখানেই পুরাতন স্বদেশীর সঙ্গে গান্ধীজীর এই নূতন স্বদেশী ব্রতের পার্থক্য। অবহেলিত, লুপ্তপ্রায়, ক্ষয়িষ্ণু গ্রামশিল্প ও শিল্পীদের প্রতি জাতির দৃষ্টি আকৃষ্ট করাই ছিল গান্ধীজীর নিকট স্বদেশী মন্ত্র তথা 'গ্রামে ফিরে যাও' আন্দোলনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। সেইজন্য তিনি বলেন, "স্বদেশী ব্রতে দীক্ষিত ব্যক্তি তাঁর পরিবেশ ভালভাবে অধ্যয়ন করে; যেখানে সম্ভব তাঁর প্রতিবেশীকে সাহায্য

করার চেষ্টা করবেন। কোন স্থানীয় উৎপাদনের জিনিস দামে চড়া বা গুণে একটু কম হলেও অন্যত্র না কিনে তার জিনিসই ব্যবহার করবেন। সেই সব ত্রুটি দূর করার চেষ্টাও তিনি সঙ্গে সঙ্গে করবেন। কিন্তু স্বদেশীর নাম করে যদি জাতীয় সম্ভাবনাকে অপব্যবহার করাই কোন শিল্পের উদ্দেশ্য হয় তবে সে সম্বন্ধেও সতর্কতা অবলম্বন করা অবশ্যই কর্তব্য।

তা হলে যে কোন হস্তশিল্পই কি স্বদেশীর রক্ষাকবচে গ্রহণ করা হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজীর বক্তব্য হল এই যে, স্বভাবতঃ না। প্রত্যেক শিল্পের গুণাগুণ তথা গ্রামীণ জীবনে তার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা এ সব বিশ্লেষণ করে যদি দেখা যায় যে সেই শিল্পের স্থায়িত্বের সম্ভাবনা আছে তবে তার পুনরুদ্ধার করা বাঞ্ছনীয় হবে। এই প্রসঙ্গে গান্ধীজী দুই একটি খুব প্রচলিত জিনিসের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। গ্রাম্য ঝাঁটাকে বাদ দিয়ে তিনি আধুনিক ব্রাশ প্রবর্তনের বিরোধী। ঝাঁটার কাঠি খুব শক্ত না হওয়ার কারণে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গের প্রাণ রক্ষা পাবে ঝাড়ু দেবার সময়। কিন্তু তা ব্রাশে সম্ভব নয়। সুতরাং কীট-পতঙ্গের প্রতি এই মানবিক করুণার নীতি এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বলে ঝাঁটার কাঠিই আমাদের কাছে শ্রেয়। তদ্রূপ, দাঁতনের কথাও গান্ধীজী উল্লেখ করেছেন। আধুনিক টুথ ব্রাশ স্বাস্থ্যসম্মত নয়। একবার ব্যবহারের পরেই তা ফেলে দেওয়াই বিধেয়। কথিত আছে যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় বাণ্টু উপজাতিদের মধ্যে নিয়মিত নিম অথবা বাবলা দাঁতনের ব্যবহারের ফলে একজন ডাক্তার যক্ষা রোগের বহুল আক্রমণ হতে তাদের রক্ষা করেছিলেন। গান্ধীজী তাই বলতেন, "ভারতে তৈরি টুথ ব্রাশের পক্ষেও আমি সমর্থন জানাব না। দাঁতনের প্রচারের কথাই আমি বলব। এ হচ্ছে 'ষোল-আনা স্বদেশী' (Cent percent Swadeshi)"।[১]

কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমাদের দেশে হস্তনির্মিত উত্তম শ্রেণীর

১. Cent percent Swadeshi, পৃঃ ১৫

কাগজ পাওয়া যেত। কোন কোন বিশেষ শ্রেণীর কাগজের গুণ এত উচ্চ শ্রেণীর হত যে, মিলে তৈরি কাগজ তার সমকক্ষ হত না।

কিন্তু আজ কোথায় সেই সব শিল্পী ও কলাকুশলতা? স্বদেশী আন্দোলনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে এই সব মৃতপ্রায় শিল্পসমূহের পুনরুদ্ধার করা। আর একটি ছোট দৃষ্টান্ত দিই যাতে বুঝতে পারা যাবে যে, গান্ধীজী কত ছোট ছোট শিল্পের পুনরুদ্ধারের জন্য তাঁর পরামর্শ ও সাহায্য দিতে কখনও কুণ্ঠিত হতেন না। এ কি তাঁর পুরাতনের প্রতি অহেতুক মোহ, ভ্রম? না, এ তাঁর জীবনদর্শনের অঙ্গীভূত বিষয়?

তেনালি হতে প্রস্তুত কালি দিয়ে তিনি এক সময় লিখছিলেন। প্রায় বারো জন কর্মীর ভরণপোষণ হত এই শিল্পের সাহায্যে। প্রভূত প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে এদের কাজ চালাতে হয়েছে। তাঁর কাছে এরূপ আরও তিনটি কালির নমুনা ছিল। গান্ধীজী একদিকে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের খোঁজখবর নিলেন, অপরদিকে নিজে ব্যবহার করে কালির গুণাগুণ বুঝলেন। আর বললেন, এই শিল্প একটি সম্ভাবনাপূর্ণ শিল্প যা উপযুক্ত রাসায়নিক বিশেষজ্ঞদের মতামত পেলে ভবিষ্যতে উন্নতি লাভ করতে পারে।[১] তা হলে দেখা যায় যে, যেখানে প্রয়োজন সেখানে আধুনিক বৈজ্ঞানিক সাহায্য নিতে গান্ধীজী যেমন সদাপ্রস্তুত থাকেন, তেমনই যেখানে সম্ভব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করতে পশ্চাৎপদ হন না। পরবর্তী অধ্যায় সমূহে এ বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করা হবে।

স্বদেশীব্রতে বিদেশীর স্থান

স্বদেশী বস্তু ব্যবহারের উপর গান্ধীজী এক সময় এরূপ প্রচার ও পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি শুরু করেছিলেন যে, অনেকের ধারণা হয়েছিল তিনি বুঝি কোন প্রকারের বিদেশী দ্রব্যের সঙ্গেই সংস্রব রাখতে চান না। কিন্তু এরূপ কল্পনা করা ভ্রমাত্মক হবে।

কেবলমাত্র বিদেশী বলেই কোন দ্রব্য বর্জন করা আর স্বদেশীর

১. Cent percent Swadeshi, পৃঃ ১২

দোহাই দিয়ে যে শিল্পের প্রসার স্বদেশে সম্ভব নয় তার জন্য জাতীয় অর্থ অপচয় করা স্বদেশী ধর্মের বিরোধী কাজ—এই ছিল গান্ধীজীর ধারণা। প্রকৃত স্বদেশব্রতী কখনই বিদেশীর বিরুদ্ধে খারাপ মনোভাব পোষণ করবেন না। কারণ, গান্ধীজীর মতে, "স্বদেশীব্রত ঘৃণা সঞ্চারের মন্ত্র নয়। নিঃস্বার্থ সেবার ইহা এক প্রকৃষ্ট নীতি। প্রকৃত অহিংসা অর্থাৎ প্রেমই আছে এর মূলে।"[১]

প্রয়োজন হলে স্বদেশী শিল্পে বিদেশী মূলধন বা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ লওয়া যেতে পারে কিন্তু তা যেন প্রকৃত প্রস্তাবে দেশের লাখ লাখ গরীব কারিগর ও জনসাধারণের স্বার্থবিরোধী না হয় এবং কার্যতঃ ভারতীয় নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়। এই দৃষ্টিতে গান্ধীজীর নিকটে চরখা সঙ্ঘের সংজ্ঞা অনুযায়ী খাদি প্রকৃত স্বদেশী বস্ত্র। এমনকি যদি এর জন্য প্রয়োজনীয় সকল মূলধন বিদেশাগত হয় এবং পাশ্চাত্ত্য বিশেষজ্ঞগণ ভারতীয় বোর্ডের নির্দেশে কাজ করে তা হলেও। অপর দিকে, বাটা কোম্পানীর রবারের বা অন্য জুতা সম্পূর্ণরূপে বিদেশী দ্রব্য রূপে গণ্য হবে যদিও তার অধিকাংশ পুঁজি এবং শ্রমিক ভারতীয়। এই তারতম্যের কারণ কি? এখানেই স্বদেশীব্রতের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য। এর কারণ হচ্ছে বিদেশীদের নিয়ন্ত্রিত জুতার ব্যবসায় দেশীয় মুচি ও চর্মকারদের তাদের আপন পেশা হতে কর্মচ্যুত করে; কারখানার সস্তা জুতার সহিত দেশী মুচিদের তৈরী জুতা প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে সক্ষম হয় না। ফলে আমাদের স্বদেশী চর্মকারদের পক্ষে বাটা কোম্পানীর জুতা মৃত্যু-সংকেত বহন করে।[২]

ভবিষ্যৎ ভারতে বিদেশী বাণিজ্যের সম্ভাবনা কতটুকু থাকবে? বা, বস্ত্র ব্যতীত অন্যান্য বিদেশী দ্রব্যের আমদানী সম্বন্ধে গান্ধীজীর মতামত কি? বিদেশী বর্জন প্রসঙ্গে এমন সব প্রশ্নেরও সম্মুখীন হতে হয়েছে গান্ধীজীকে অনেক বার। উত্তরে তিনি বলেছেন—

"বস্ত্র ব্যতীত অন্যান্য বিদেশী দ্রব্য আমদানীর ব্যাপারে আমি

১. Cent percent Swadeshi, পৃঃ ৯
২. ঐ , পৃঃ ৭২

কিছুটা উদাসীন। কেবলমাত্র বিদেশী বলেই আমি কখনও বিদেশী জিনিস বর্জনের কথা বলি নাই। আমার আর্থিক নীতিতে সেই সকল বিদেশী দ্রব্যেরই বর্জন বোঝায়, যেগুলি আমদানীর ফলে দেশীয় শিল্পের স্বার্থের ক্ষতি হবে। এর অর্থ, আমরা কোন অবস্থায়ই এমন কোন জিনিস আমদানী করব না যা আমাদের দেশের মধ্যেই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, গুণে ভাল বলেই অস্ট্রেলিয়া হতে গম আমদানী করা আমার মতে পাপ। কিন্তু স্কটল্যাণ্ড হতে ওটমিল (Oatmeal) আমদানী করতে আমি বিন্দুমাত্র দ্বিধা করব না, যদি অবশ্য এর প্রয়োজন যথার্থরূপে দেখা দেয়। কেন না, ভারতে ওট উৎপন্ন হয় না।..."[১]

এইভাবে চামড়া, চিনি প্রভৃতি অনেক জিনিসেরই নাম উল্লেখ করা যায়। বিশেষ করে, দেশের গো-সম্পদের উন্নতি বিধানের দিকে দৃষ্টিপাত না দিয়ে বিদেশ হতে গুঁড়া দুধ আমদানী করাও স্বদেশী নীতিবিরুদ্ধ কাজ। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, গান্ধীজী কোনরূপ সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধ, ঘৃণা বিদ্বেষ বা গোঁড়ামি প্রসূত মনোভাব থেকে স্বদেশী নীতির কথা বলেন নাই। নিকটতম প্রতিবেশীর কল্যাণ সাধনই এর মূলকথা।

১. Cent percent Swadeshi, পৃঃ ৭৭

ষষ্ঠ অধ্যায়

আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণ ও গ্রামশিল্প কেন ?

আধুনিক জড়বাদী সভ্যতার এই যুগে গান্ধীজী প্রথম হতেই তাঁর বিদ্রোহের খড়্গ তুলে ধরেছিলেন এই সভ্যতার মৌলিক অসঙ্গতির বিরুদ্ধে। এ বিষয়ে তাঁর বিখ্যাত পুস্তিকা 'হিন্দ্ স্বরাজ' প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলে উল্লেখ করা যায়। মানববিধ্বংসী এই অতিমাত্রায় যান্ত্রিক সভ্যতাকে তাই তিনি কখনও আন্তরিক সমর্থন জানাতে পারেননি।

কিন্তু গান্ধাজী কেবলমাত্র অন্যায্য প্রচলিত ব্যবস্থাকে দোষারোপ করেই ক্ষান্ত হতেন না। তার পরিবর্তে বিকল্প ব্যবস্থার ভিত সংগঠনের কাজেও অগ্রসর হতেন। গান্ধীজীর সংগ্রাম তথা নেতৃত্বের এটা ছিল এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি যে সমাজ-আদর্শে বিশ্বাস করতেন তার আর্থিক কাঠামো মূলতঃ বিকেন্দ্রিত হবে এ কথা আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করেছি সংক্ষেপে। সেইজন্য বর্তমান কালের মূলতঃ কেন্দ্রিত শিল্পব্যবস্থার পরিবর্তে এক বিকেন্দ্রিত আর্থিক ব্যবস্থা রচনার উদ্দেশ্যে গান্ধীজী চরখা ও গ্রামোদ্যোগ আন্দোলনের প্রবর্তন করলেন। কিন্তু এইরূপ বিকেন্দ্রিত আর্থিক ব্যবস্থায় কোনরূপ কেন্দ্রিত বৃহৎ যন্ত্রশিল্পেরই স্থান থাকবে না এমন গোঁড়ামি গান্ধীজীর চিন্তাকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। কেন্দ্রিত শিল্পের প্রয়োজন যেখানে অপরিহার্য আর বিকেন্দ্রিত ব্যবস্থায় উৎপাদন সম্ভব নয়, সেখানে বাস্তব-আদর্শবাদী গান্ধীজী তেমন সব দ্রব্যের জন্য কেন্দ্রিত ব্যবস্থাকে সমর্থন করতেন। তবে তা হবে প্রধানতঃ ব্যক্তিগত মুনাফার বাইরে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত। যাই হোক, এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে করা হবে।

গ্রামশিল্প কেন ?

প্রশ্ন ওঠে যে, গান্ধীজী কী কারণে বিকেন্দ্রীকরণের উপর একটা গুরুত্ব আরোপ করলেন ? অন্য কথায়, তিনি কেন্দ্রীকরণের

এত বিরোধী কিসের জন্য ? শিল্পবিপ্লবের পর হতে পাশ্চাত্ত্যের অধিকাংশ উন্নত দেশেই যেখানে কেন্দ্রিত যান্ত্রিক শিল্পায়নের পন্থা অনুসৃত হয়েছে, সেখানে গান্ধীজী কেনই বা ভারতের জন্য এই নীতি অনুসরণের ব্যবস্থা করলেন ? গান্ধীজী কি উন্নত শিল্পব্যবস্থার বিরোধী ? গান্ধীজী কি প্রভূত পরিমাণ উৎপাদন করার বদলে দেশের অনুন্নত অবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখতে চান পুরাতন প্রয়োগবিদ্যা বা টেকনলজিকে জীইয়ে রেখে ? কিন্তু এ সব যুক্তির কোনটিই গান্ধীজীর আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণের যুক্তি ও নীতিকে প্রকাশ করে না। সেজন্য গান্ধীজীর আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণের মৌল বিচারধারাকে ভালভাবে বুঝতে হলে এক সমগ্র সমাজদর্শনের বিচার বুঝতে হয়। গান্ধীজীর বিকেন্দ্রিত আর্থিক ব্যবস্থার মূল দর্শন তাই এক নূতন সমাজদর্শনের দ্যোতক। এই সমাজ হবে কৃষি ও শিল্পের সমন্বিত সমাজ (Agro-industrial Social Order)। অর্থাৎ, গান্ধীজী যে আত্মনির্ভরশীল গ্রামস্বরাজের কল্পনা করতেন তার আর্থিক কাঠামো প্রধানতঃ বিকেন্দ্রিত হতে হবে, প্রতিযোগিতার স্থলে সহযোগিতাই হবে যেখানে পারস্পরিক লেনদেনের প্রাথমিক সর্ত। আর এসব ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বয়ংপরিচালিত শিল্পব্যবস্থা অধিকতর সহজভাবে গান্ধীজীর গ্রামস্বরাজের কল্পনাকে রূপায়িত করতে সাহায্য করবে বলেই তিনি বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষপাতী ছিলেন।

এখন দেখা যাক, গ্রামশিল্পপ্রধান আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণকে পরিপুষ্ট করার কথা গান্ধীজী কেন চিন্তা করতেন ? অর্থাৎ, এই যন্ত্রযুগের আবর্তের মধ্যে থেকেও আমরা কেন গ্রামশিল্পের সমর্থন করব, বিশেষ করে ভারতের ন্যায় দেশে ? কারণগুলি প্রধানতঃ আর্থিক হলেও এর পশ্চাতে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কারণও বিদ্যমান।

গ্রামশিল্পের কারণ ঃ

(১) ভারতের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও বাধ্যতামূলক কর্মহীনতা—এই দুই তীব্র বাস্তব অবস্থার নগ্ন রূপ গান্ধীজীর সমাজপুনর্গঠনের চিন্তাধারাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। পৃথিবীর অন্যান্য বৃহৎ

দেশগুলির সহিত তুলনায় দেখা যাবে যে, ভারতে ভূমি ও জনসংখ্যার আনুপাতিক অবস্থা (Land-man ratio) অতীব শোচনীয়। নিম্নের প্রদত্ত সংখ্যাগুলি হতে পরিস্ফুট হবে ভারতের তুলনামূলক চিত্র :

দেশ	মাথাপিছু ভূমির পরিমাণ	প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যা
রাশিয়া	২৭.৮ একর	২৩[১]
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	১৩ ,,	৪৯
ভারত	১.৭ ,,	৩৭৩
গ্রেট বৃটেন	১.২ ,,	৫৫৪

তাছাড়া, ভারতে মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭১.৬ শতাংশ কৃষির উপর নির্ভরশীল।[২] আর মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮২.৩ শতাংশ অধিবাসী অদ্যাবধি গ্রামবাসী। ভারতের আর্থিক অবস্থা বিশ্লেষণের জন্য সকল অনুসন্ধিৎসু গবেষকের পক্ষেই এই দুইটি চিত্র সম্বন্ধে সদাসতর্ক দৃষ্টি রাখা অত্যাবশ্যক। অর্থাৎ, ভারতের আর্থিক ব্যবস্থার এই দুই বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় : (১) গ্রামীণ জনসংখ্যার আধিক্য ও (২) জীবিকা অর্জনের প্রধান পেশা কৃষি।

এই বিশাল জনসংখ্যার পূর্ণ কর্মসংস্থানের দৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করাই হবে যে-কোন পরিকল্পিত আর্থিক কার্যক্রমের প্রধান অঙ্গ। ভারতের 'জনসংখ্যার এই বিস্ফোরণ' (Population explosion) আমাদের জাতীয় পরিকল্পনাবিদ্‌দের কাছে সত্যই এক দুর্বিষহ সমস্যা। সারা বিশ্বের তুলনায় ভারতের ভূমির পরিমাণ যেখানে ২.৪ শতাংশ, সেখানে প্রায় বিশ্ব-জনসংখ্যার ১৫ শতাংশ অধিবাসীর ভরণপোষণের দায়িত্ব ভারতকে গ্রহণ করতে হয়। অন্য কথায়, জনসংখ্যার দৃষ্টিতে ভারত বিশ্বের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে দ্বিতীয়, অথচ ভূমির পরিমাণের দৃষ্টিতে তার স্থান সপ্তম"—বলেছেন ভারতের বিখ্যাত জনসংখ্যা-বিশেষজ্ঞ ডঃ এস. চন্দ্রশেখর সাম্প্রতিক এক বেতার-ভাষণে।[৩]

১. Dr. S. Chandrasekhar
২. Planning for Sarvodaya, পৃঃ ৬৭
৩. A. I. C. C. Economic Review—7th September, 1962

সুতরাং এই ক্রমবর্ধমান জনসমষ্টির জন্য উপযুক্ত কাজের ব্যবস্থা করার সমস্যা আমাদের আর্থিক পুনর্গঠনের পরিকল্পনায় নিঃসন্দেহে এক কঠিন সমস্যা। বেকারি, অর্ধ-বেকারি (underemployment) ও প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা (disguised unemployment)—এই তিনের সম্মিলিত আক্রমণে আমাদের জনসমষ্টি জর্জরিত। ভারতে কর্মহীনতার একটি করুণ চিত্র জাতীয় নমুনা-সমীক্ষার বিবরণীতে প্রকাশ পেয়েছে :

২ কোটি লোকের দিনে ১ ঘণ্টা বা কম কাজ আছে
২'৭ " " " ২ " " " "
৪'৫ " " " ৪ " " " "

[National Sample Survey—9th Round. Jagriti, 8.10.'59]

সুতরাং যে দেশে কর্মক্ষম জনতা কর্মের অভাবে পর্ণকুটিরে নগ্ন দেহে ও শুষ্ক উদরে দিন যাপন করতে বাধ্য হয়, সেখানে তাদের যে-কোন পন্থায় কাজ দেওয়াই হবে বড় কথা। এই দৃষ্টিতে বৃহৎ শিল্পের যে সে সামর্থ্য নাই তা এখনই পরিস্ফুট হবে। ভারতে প্রায় শতবর্ষ পূর্বে বৃহৎ শিল্প স্থাপিত হয়েছে। আর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যক্রমও প্রায় বারো-তেরো বছর ধরে চলছে। সেখানে শিল্পে নিযুক্ত মোট জনসংখ্যা হচ্ছে ৩১'৩২ লক্ষ ; আর তদনুপাতে কৃষিতে নিযুক্ত মোট জনসংখ্যা ৪'৬ কোটি।[১] এছাড়া, ভারতে প্রতি বছরে ৫০ লাখ অধিবাসী নূতন কর্মপ্রার্থী রূপে হাজির হচ্ছে। অপরদিকে, পরিকল্পনা কমিশনের সরকারী হিসাবে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথমে ভারতে কর্মহীন জনসংখ্যা ছিল ৫৩ লক্ষ। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ৮০ লাখ লোকের জন্য নূতন কর্মের ব্যবস্থা করা হল। কিন্তু বার্ষিক ২০ লক্ষ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারে ১৯৬০-৬১ সালে বেকার জনসংখ্যা দাঁড়াল ১৫৩ লক্ষ। উপরন্তু, পরিকল্পনায় নিয়োজিত মোট অর্থের পরিমাণ যেখানে ৪৮০০ কোটি টাকা হতে কমিয়ে ৪৫০০ কোটি টাকায় ধরা হল, তার ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ

১ Khadi Gramodyog, April 1962

৬০ লক্ষ কম হবে বলে আশা করা হয়। এ তো গেল কর্মহীনতার এক সাধারণ চিত্র।

(২) *গ্রামকেন্দ্রিক কৃষিনির্ভর আর্থনীতিক ব্যবস্থায় কৃষির উপর নিভরশীল জনসংখ্যার সবাই পূর্ণ সময়ের কাজ পায় কিনা তাও বিবেচ্য বিষয়। ইউরোপ, আমেরিকার ন্যায় যে সকল দেশে উন্নত প্রথায় যান্ত্রিক কৃষির প্রয়োগ ব্যাপকভাবে চলে, যে সব ক্ষেত্রে ভূমির উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যার চাপ অধিক নয়, সেখানে কৃষিকাজ অপর সকল শিল্পকাজের ন্যায় লাভজনক পূর্ণ সময়ের কর্ম। কিন্তু ভারতে কৃষকদের কাহিনী দারিদ্র্য ও অনাহারের কাহিনী, আজন্ম ঋণের কাহিনী তথা অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি জনিত উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার বেদনাদায়ক কাহিনীতে ভরা। তার উপর এখানকার কিষাণরা সাধারণতঃ বছরের মধ্যে পাঁচ-ছয় মাস নিদারুণ কর্মহীনতার মধ্যে কাটাতে বাধ্য হয়। ইংরাজদের 'শুভাগমনের' পূর্বে প্রত্যেক গ্রামাঞ্চলে কৃষি ব্যতীত নানাপ্রকারের কুটির ও গ্রামশিল্পের প্রচলন থাকায় অবসর সময়ে কিষাণদেরও কিছু আয়ের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু ইংরাজদের সঙ্গে আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞান ও বৃহৎ শিল্পের আমদানীর ফলে গ্রাম্য কিষাণের আর্থিক জীবনের বনিয়াদে ভাঙন দেখা দিল। গ্রামশিল্প, কুটিরশিল্প প্রভৃতি ধীরে ধীরে লুপ্ত হতে থাকায় কিষাণদের জমির উপরে নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাওয়ায় জমির উপর চাপও বৃদ্ধি পেল। ভূমিহীন মজুরের সংখ্যা বেড়ে চলল দেশে। ধানভানা, চিড়াকুটা প্রভৃতি কাজ শহরের কল গ্রাস করল। আর এর ফলে দারিদ্র্য ও অনাহার আরও তীব্র ও ব্যাপক হল। তাই কৃষির পরিপূরক হিসাবে কিষাণের বাধ্যতামূলক বেকারি দূর করার উদ্দেশ্যে গান্ধাজী প্রধাতঃ কৃষিকেন্দ্রিক শিল্পের কথা বললেন। যে সব শিল্পের কাঁচামাল প্রত্যেক গ্রামাঞ্চলেই উৎপন্ন হয়, কেনই বা তা সেই গ্রামাঞ্চলেই পাকা মালে রূপান্তরিত করা হবে না ?

(৩) কেন না এ কথা সুস্পষ্ট যে, কাঁচামাল যেখানে বাইরে রপ্তানী করা হয় তার সঙ্গে শিল্পরূপ কর্মব্যবস্থাকেও কি বাইরে রপ্তানী করা হয় না ? সেইজন্য যত আমরা স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন

জিনিস ব্যবহারের দিকে দৃষ্টি দেব তত বেকারির সম্ভাবনাকেও দূরীভূত করব।

(৪) যে-কোন অর্থশাস্ত্রীর কাছেই আজ বিশেষ করে এই যুক্তির সারবত্তা প্রমাণিত হবে যে, ৮২ শতাংশ জন অধিবাসী যেখানে গ্রামে বাস করছে, সেইস্থলে গ্রামের অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতির উন্নতি-বিধান করাই হবে দেশের বৃহত্তম স্বার্থরক্ষার দৃষ্টিতে বাঞ্ছনীয় কাজ। তাই ভারতের আর্থিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় কিছু অত্যাবশ্যকীয় ভারী শিল্পের কথা বাদ দিলে গ্রামীণ অর্থনীতিকে সব দিক হতে পুষ্ট করাই সর্বাঙ্গীণ আর্থিক বিকাশের এক উত্তম পরিকল্পনা। গান্ধীজী এই অকাট্য সত্য কথাটি স্বাধীনতার বহুপূর্বেই পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন বলেই গ্রামশিল্প তথা বিকেন্দ্রিত আর্থিক ব্যবস্থার প্রবর্তনে প্রয়াসী হলেন। আর এই কারণেই অখিল ভারতীয় ভিত্তিতে চরখা সঙ্ঘ, গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘ প্রভৃতি গ্রামশিল্পমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি তিনি সৃষ্টি করলেন। গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘ প্রধানতঃ এই তিন উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়—

(ক) প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয় বন্ধ করে তা নূতন সম্পদে পরিণত করা। যেমন বলা যায়, কম্পোস্ট বা স্বর্ণসার (Night soil) তৈয়ারি; মৃত পশুর দেহজাত চামড়া, হাড়, শিং, নাড়ি প্রভৃতির সাহায্যে বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদন করা।

(খ) বর্তমানে গ্রামবাসীদের হাতের কাছেই যে সব কাঁচামাল পাওয়া যায় তা সংরক্ষণে সাহায্য করা।

(গ) গ্রামবাসীদের অবসর মুহূর্তগুলিকে কোন উৎপাদনমূলক শিল্পকাজে প্রয়োগের দ্বারা অধিক অর্থ ও সম্পদ্ উৎপাদনে সাহায্য করা।

গ্রামীণ অর্থনীতিতে উপরোক্ত কর্মপন্থা অনুসৃত হওয়ায় গ্রামবাসীর ক্ষয়িষ্ণু আর্থিক মানদণ্ড শক্তিশালী হয় ও আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন সহজতর হয়।

(৫) গ্রাম উন্নয়ন অর্থ গ্রামের লাখ লাখ দরিদ্র অনাহারগ্রস্ত কিষাণকুলের উন্নয়ন। কিন্তু সেই কৃষকদের অবস্থার উন্নতির বদলে

পরিকল্পিত অর্থনীতির ফলে যদি অবনতি সূচিত হয় তবে দেশের সামগ্রিক কল্যাণের দৃষ্টিতে সেরূপ পরিকল্পনার ফলভোগ করল কারা ? আর পরিকল্পনা রূপায়ণের অধিকাংশ বোঝা বহন করল কোন্ শ্রেণী ? এ যেন সেই প্রবাদোক্ত 'কেহ মরে বিল ছেঁচে, কেহ খায় কই।' আমাদের দেশেও এই সংকট দেখা দিয়েছে। দ্বিতীয় কৃষিশ্রমিক (ক্ষেতমজুর) অনুসন্ধান কমিটীর প্রদত্ত রিপোর্টে (১৯৫৬-৫৭) কৃষিশ্রমিকদের আয়, কাজের দিনসংখ্যা প্রভৃতি পূর্বের তুলনায় (প্রথম অনুসন্ধান কমিটী, ১৯৫০-৫১) হ্রাস পেয়েছে বলে প্রকাশিত হয়েছে। স্বাধীন দেশের পরিকল্পনার এ আশীর্বাদ না অভিশাপ ? ১৯৫৬-৫৭ সালে মোট কৃষিশ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৭ কোটি ২০ লক্ষ (প্রতি পরিবারে ৪'৪ জন হিসাবে)। এর মধ্যে শতকরা ৫৭ জনই ভূমিহীন আর শতকরা ৮৩ জনেরই কাজ ছিল সাময়িক—অর্থাৎ দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য। বয়স্ক পুরুষ শ্রমিকরা ১৯৫৬-৫৭ সনে সাময়িক কাজ পেয়েছেন মাত্র ১৯৭ দিন, স্ত্রীলোকেরা ১৪১ দিন, শিশুরা ২০৪ দিন। বয়স্ক পুরুষ শ্রমিকরা ১৯৫০-৫১ সনে যেখানে বেকার ছিল ৯০ দিন, আলোচ্য বৎসরে সেখানে ১২৮ দিন। আয়ও পূর্বের তুলনায় কমে গিয়ে বয়স্ক পুরুষ শ্রমিকের মজুরি ১০৯ নয়া পয়সা থেকে ৯৬ নয়া পয়সা হয়েছে ১৯৫৬-৫৭ সনে।

অপর দিকে, গড়ে এক ঘর কৃষিশ্রমিকের উপার্জন ১৯৫০ সনে ছিল ৪৪৭ টাকা, আর ১৯৫৬ সনে ৪৩৭ টাকা। কৃষিশ্রমিক পরিবারগুলিতে মাথাপিছু বার্ষিক আয় ১৯৫০ সনে ছিল ১০৪ টাকা, ১৯৫৬ সনে ৯৯'৪ টাকা। অথচ ১৯৫৬-৫৭ সনে ভারতের জাতীয় আয় মাথাপিছু ছিল ২৯১'৫ টাকা। অর্থাৎ, গড় জাতীয় আয়ের মাত্র ৩৪% ছিল কৃষিশ্রমিকের আয়। ১৯৫৬ সনে ঘরপিছু কৃষিশ্রমিকের আয় ছিল ৪৩৭ টাকা, অথচ ব্যয় হয়েছে ৬১৭ টাকা—অর্থাৎ ঘাটতি ১৮০ টাকা। ১৯৫০ সনে ক্ষেতমজুর পরিবারগুলির ৪৫% ছিল ঋণগ্রস্ত, ১৯৫৬ সনে তা দাঁড়িয়েছে ৬৪% পরিবারে। আর গড়ে প্রতি পরিবারের ঋণ ৪৭ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৮৮ টাকায় এসেছে।

এই হল ভারতের শতকরা ৭১ ভাগ অধিবাসীর আর্থিক জীবনের চিত্র—কাজের দিনসংখ্যা কমেছে, আয় কমেছে, ঋণ বেড়েছে—ফলে দারিদ্র্যের বোঝাও বেড়েছে। গান্ধীজীর গ্রামোত্যোগ আন্দোলনের পৃষ্ঠভূমি তো এরাই। এদের আয় যাতে আপন ঘরে ও গ্রামে থেকে একটুকু বাড়ে গান্ধীজী সেই চেষ্টাই করেছেন। বৃহৎ শিল্পায়নের ফলে দেশের যারা মেরুদণ্ড স্বরূপ তাদের জীবনে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য আসবে এই স্বপ্ন আজ মায়ামরীচিকার ন্যায় মনে হয়। চরখা চালিয়ে কিই বা আয় হয়, ঢেঁকি ভেনে কি এই যন্ত্রযুগে চলবে—এই সব যুক্তির ভ্রান্তি কোথায় আজ অনেকেই যেন সেই সত্য উপলব্ধির দ্বারপ্রান্তে এসেছেন। সরকারও তাই আজ গ্রাম ও ক্ষুদ্রশিল্প তথা গ্রামীণ শিল্পায়নের (Rural Industrialisation) কথা ভাবছেন। গান্ধীজী এইজন্যই জনবহুল এই দেশে শ্রমকেন্দ্রিত (Labour-intensive) পরিকল্পনার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এ কথা তো ঠিক যে, কেবলমাত্র কৃষির উপর নির্ভর করেই গ্রামীণ কৃষিনির্ভর জনসাধারণের আর্থিক উন্নতি সম্ভব নয়। সেইজন্য শিল্পের সহযোগ চাই কৃষির সঙ্গে সঙ্গে। আর সেই সব শিল্পের স্বরূপ প্রধানতঃ কৃষিকেন্দ্রিত। এগুলির কাঁচামালের জন্য বিদেশের বাজারের উপর নির্ভরশীল হতে হয় না; আবার উৎপন্ন পণ্যদ্রব্যের বিক্রয়ের জন্যও বিদেশের বাজার অনুসন্ধানে কালক্ষেপণ করতে হয় না। গ্রামশিল্পের এই তো সার্থকতা।

(৬) এ তো গেল ভারতের কৃষিজীবীদের আর্থিক অবস্থার চিত্র। আমরা জাতীয় নমুনা সমীক্ষা প্রদত্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে পূর্বেই দেখেছি, ভারতে কোটি লোকের দিনে মাত্র এক ঘণ্টার কাজ আছে, কয়েক কোটি লোকের দিনে ২ ঘণ্টা বা ৪ ঘণ্টার কাজ আছে। এই রিপোর্টেই আবার প্রকাশ পেয়েছে ভারতের সীমাহীন আর্থিক দারিদ্র্যের ছবি। ভারতের মাত্র ১০% বা ১১% অধিবাসী দিনে এক টাকার বেশী ব্যয় করতে সক্ষম হয় না। আর—

২০ কোটি	লোক	দিনে	৩'৫০	বা তার কম	ব্যয়	করে
৬	”	”	” ০'৩১	”	”	
৪	”	”	” ০'২৫	”	”	
২	”	”	” ০'১২	”	”	

[N. S. S : 9th Round]

এই নিদারুণ দারিদ্র্যজ্বালা ভোগ করার পরেও এই দেশের অধিবাসীরা শান্ত সমাহিত চিত্তে দিন যাপন করে। অথচ, বর্তমানে যে উন্নত মডেলের অম্বর চরখা বেরিয়েছে তা দিয়ে কতটুকু আয় করা সম্ভব ?

(ক) বাক্স চরখায় বার্ষিক আয় ২০-৪০০ টাকা পর্যন্ত

(খ) অম্বর চরখায় ” ” ৬০-৬০০ ” ”

[Jagriti, 8. 10. '59]

গ্রামীণ জনসাধারণের গড় আয়ের দৃষ্টিতে এই আয় কি হেলায় উড়িয়ে দেবার যোগ্য ? এ ছাড়া বলা যায়, বর্তমানে যে ছয় টেকুযুক্ত অম্বর চরখা চালু হয়েছে তা থেকে কাটুনির আয় বাড়বে, বিশেষ করে যেখানে এই চরখা পারিবারিক ভিত্তিতে চালানো হয়।

(৭) গ্রামশিল্পের আর এক লক্ষ্য উৎপাদন ব্যবস্থাকে যতদূর সম্ভব বিস্তৃত করা এবং এমন জিনিসের উৎপাদন করা যা সাধারণ অধিবাসীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যরূপে গণ্য হয়। কেবলমাত্র অতিরিক্ত মুনাফার লোভে ধনী ব্যক্তিদের কিছু বিলাসদ্রব্য তৈরি করা এর কাম্য নয়।

(৮) উৎপাদন ব্যবস্থা যত বিস্তৃত হবে, সম্পদের বণ্টন তত ন্যায্য হবে। চরখা, ঢেঁকি, ঘানি প্রভৃতি যে কোন গ্রামশিল্পের উৎপাদন পদ্ধতি ও মজুরি বিতরণের হার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলেই দেখা যাবে যে, এর ফলে সেই অঞ্চলের বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তি উপকৃত হয়। এর ফলে অর্থের কেন্দ্রীকরণ হয় না বলে বিরাট ধনী ও দরিদ্রের সৃষ্টি হয় না। আর্থিক সমতা আনার পথ তাই আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণ।

(৯) অর্থ ও সম্পদ গুটিকয়েক ব্যক্তির মুঠায় কেন্দ্রীভূত হয় না বলে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব হয়। আধুনিক কালে বিরাট

শিল্পপতি বা পুঁজিপতি শ্রেণীর মানুষ আর রাষ্ট্র উভয়ের হাতেই দেশের অর্থ ও সম্পদের মালিকানা কেন্দ্রীভূত থাকায় জনসাধারণের স্বতন্ত্র নিয়ন্ত্রণশক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হতে বাধ্য। গান্ধীজী এইরূপ অর্থ, সম্পদ তথা ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের বিরোধী ছিলেন বলেই বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলেছেন।

(১০) ভারতের ন্যায় জনবহুল দেশে শ্রমকেন্দ্রিত[১] পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া, যে কোন উন্নয়নশীল দেশে কেন্দ্রিত শিল্পায়নের জন্য যে প্রভূত পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন হয় তার জন্য বিদেশ হতে ঋণের দায়ে কোন কোন সময় সেই দেশকে মাথা বিকোবার ব্যবস্থা করতে হয়। আর, কালের অমোঘ বিধানে 'বণিকের মানদণ্ড' ক্রমে 'রাজদণ্ড' রূপে রূপান্তরিত হয়ে দেশের স্বাধীনতা হরণে প্রলুব্ধ হয়। ভারতের ন্যায় দরিদ্র দেশে দেশের অভ্যন্তরে মূলধন সংগ্রহের সম্ভাবনা সীমাবদ্ধ। সেজন্য, আমাদের এমন শিল্পের কথা ভাবাই বাস্তব অবস্থার দৃষ্টিতে যুক্তিগ্রাহ্য হবে, যার জন্য স্বল্প মূলধন, সহজ যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়। যে জাতি বা দেশ যত অধিক পরিমাণে আপন প্রয়োজনের জন্য বিদেশের উপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য হয়, সে দেশ বা জাতির স্বাধীন অস্তিত্ব তত সংকটজনক বলা যায়। মূলধন ও যন্ত্রপাতির দৃষ্টিতে গ্রামশিল্পই হবে ভারতের বিস্তৃত গ্রামাঞ্চলের জন্য উপযুক্ত শিল্পায়নের পথ। অবশ্য, সম্ভব হলে উন্নত কলাকৌশল তথা বিদ্যুৎশক্তির ব্যবহার যে করা হবে না, তা নয়।

(১১) বিকেন্দ্রিত শিল্পব্যবস্থার ফলে উৎপাদন মূলতঃ স্থানীয় প্রয়োজনের দৃষ্টিতেই প্রযুক্ত হবে। নিকটতম প্রতিবেশীদের চাহিদার দিকে কোনরূপ দৃক্‌পাত না করে বর্তমানে যেভাবে অতিমুনাফার লোভে দূরবর্তী অঞ্চলের জন্য দ্রব্য সরবরাহ করা হয়, তা বন্ধ হবে। এর ফলে ফাটকাবাজী নিয়ন্ত্রিত হবে, আর বাজারদর ওঠানামার অযৌক্তিক প্রবণতা দূরীভূত হবে। আজকাল হামেশাই এমন দেখা

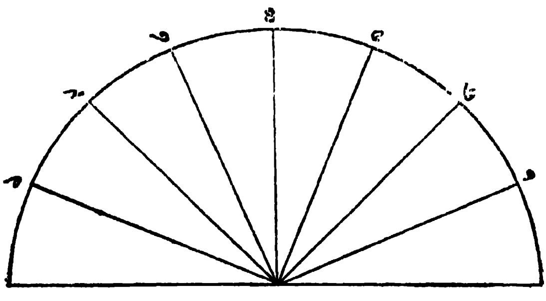
১. Labour intensive

যায় যে, দেশে যেখানে খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদনের প্রভূত ঘাটতি রয়েছে, সেখানে তামাক, পাট ইত্যাদি অর্থকরী ফসলের (money crop) চাষ স্বচ্ছন্দে চলেছে। জাতীয় স্বার্থবিরোধী কাজের এমন অব্যবস্থার প্রতিকার হওয়া বাঞ্ছনীয় নয় কি? সেজন্যই গান্ধীজী উৎপাদনকে প্রধানতঃ স্থানীয় ভিত্তিতে ও স্বাবলম্বনের দৃষ্টিতে পরিচালিত করতে চেয়েছিলেন।

(১২) বিকেন্দ্রিত শিল্প ও আর্থিক ব্যবস্থার ফলে বাণিজ্যিক লেনদেন যথাসম্ভব সহজ ও সরল হবে। অতিমাত্রায় জটিল আধুনিক ধারার ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে সমাজে নানারূপ আর্থিক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। বহু দূরবর্তী দেশের কোনরূপ অঘটনের স্পন্দনে আমাদের দেশের অভ্যন্তরে আর্থিক জীবনে দেখা দেয় নানারূপ কুটিল উপসর্গ। যার প্রভাব হতে মুক্ত করতে রাষ্ট্রকে নানা সময়ে বহু ঝামেলার সম্মুখীন হতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে, এরূপ আন্তর্জাতিক ফাটকাবাজীর ফলে বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হবার আশঙ্কা দেখা দেয়। পরিণামে বিশ্বযুদ্ধের অবতারণা ঘটে। এই সব জটিলতার বহুলাংশই বিকেন্দ্রিত আঞ্চলিক লেনদেনের দ্বারা দূরীভূত হতে পারে। আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য কেবলমাত্র সেই সব পণ্যের হওয়া বিধেয় যার উৎপাদন পৃথিবীর যত্রতত্র হওয়া সম্ভব নয়। যেমন, পেট্রোল। কিন্তু বস্ত্রের ন্যায় নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্যের উৎপাদন তথা বাণিজ্য স্থানীয় বা আঞ্চলিক ভিত্তিতে হওয়াই সর্বথা বাঞ্ছনীয়। এইরূপ বহু দ্রব্যের জন্যই বিশ্ববাণিজ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা চলে। অর্থ ও সম্পদের এরূপ অযৌক্তিক অপচয় যুক্তিসঙ্গত কিনা যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই তা বিচার করে দেখতে পারেন। গান্ধীজী এই প্রকার স্বার্থসর্বস্ব লেনদেনকে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ বলে মনে করতেন। আর্থিক বিকেন্দ্রী-করণের তাই অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য, আভ্যন্তরীণ তথা বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যকে যথাসম্ভব সহজ ও জটিলতামুক্ত করা। আরও বৃহত্তর দৃষ্টিতে দেখলে বলা যায় যে, বিশ্বশান্তি ও সর্বজনীন সৌভ্রাত্র অটুট রাখার পক্ষে আর্থিক ও শিল্পে বিকেন্দ্রীকরণের নীতি এক অপরিহার্য পদক্ষেপ। অনেকে এ যুক্তি সমর্থন করতে না

পারেন। কিন্তু বিশ্ব পরিস্থিতি যেন ক্রমেই এই সত্যকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসছে। বৃহৎ শিল্পের ফলে জটিল আর্থিক তথা বাণিজ্যিক ব্যবস্থা ক্রমেই মানুষের সমাজজীবনে যে বিবিধ জটিলতা এবং শ্রেণীবৈষম্যের সৃষ্টি করে চলেছে তা থেকে মুক্তির আশায় অনেক সমাজবিজ্ঞানী আজ তাই ক্ষুদ্র মানবগোষ্ঠীর সমবায়ে গঠিত সমাজব্যবস্থা ও বিকেন্দ্রিত আর্থিক পদ্ধতির কথা বলছেন। বিকেন্দ্রিত শিল্পায়নের এ হচ্ছে অন্তিম পরিস্থিতি। বিশ্বের সর্বত্র শান্তিকামী, সহযোগী সমাজ রচনা করাই এর লক্ষ্য। আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সামাজিক শান্তিও যাতে ব্যাহত না হয় আমাদের সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে।

(১৩) পূর্বে যেমন আমরা শিল্পবিপ্লব জাত দুষ্টচক্রের ফলাফল সম্বন্ধে উল্লেখ করেছি, তদ্রূপ পরিশেষে, বিকেন্দ্রিত শিল্পব্যবস্থার শুভফলগুলি সম্বন্ধেও সংক্ষেপে এরূপ এক শুভচক্র অঙ্কিত করা যায়—



গ্রামশিল্পের শুভচক্র

১) কাঁচামালের উপযুক্ত ব্যবহার

২) অধিকতর কর্মসংস্থান

৩) শোষণহীন উৎপাদন

৪) সম্পদ ও অর্থের সমবণ্টন

৫) সুষম সমাজব্যবস্থা

৬) সামাজিক শান্তি

৭) সহযোগী শান্তিকামী বিশ্বসমাজ

গ্রামশিল্পের সংজ্ঞা

বর্তমান কালে গ্রামশিল্প, কুটিরশিল্প প্রভৃতি শব্দগুলি নানা ভাবে নানা অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে বিভিন্ন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে। স্বাধীনতার পূর্বে গান্ধীজী দেশে প্রচলিত অর্ধমৃত কুটির ও গ্রামশিল্পগুলির পুনরুদ্ধারে মনোনিবেশ করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর গ্রামোদ্যোগ আন্দোলন বলতে কেবলমাত্র গুটিকয়েক শিল্পব্যবস্থা গ্রামাঞ্চলে স্থাপন করা বোঝাতেন না তিনি। তাছাড়া, বর্তমানে সরকারী ব্যবস্থাপনায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কিছু কিছু কুটিরশিল্প, হস্তশিল্প ও গ্রামশিল্পের প্রসার হচ্ছে। উপরন্তু, বড় বড় শিল্পের ক্ষুদ্র সংস্করণ রূপে অনেক শিল্প আবার গ্রামাঞ্চলে চালু হতে চলেছে। যেমন, বড় ধান কলের পরিবর্তে ছোট ছোট ধানভানা কল, হাস্কিং মেশিনরূপে সচরাচর যা পরিচিত। কিন্তু এর দ্বারা যদি আর্থিক শোষণ ও বেকারি বৃদ্ধি পায় তবে কোক্রমেই এরূপ শিল্পকে গান্ধীজীর কল্পনা অনুযায়ী গ্রামশিল্পের সংজ্ঞাভুক্ত করা চলে না। তাই গ্রামে অবস্থিত হলেই গ্রামশিল্প বলা চলে না। সেজন্য প্রকৃত গ্রামশিল্পের সংজ্ঞা বলতে কি বুঝায় তা জানা অত্যাবশ্যক। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর দ্বারা গঠিত ইকনমিক প্রোগ্রাম কমিটী গান্ধীজীর কল্পনা অনুযায়ী গ্রামশিল্পের নিম্নরূপ অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন। যে সকল শিল্প নিম্নোক্ত শর্তাবলীর সম্পূর্ণ বা অধিকাংশ পূরণে সমর্থ হয় তাকে গ্রামশিল্প বলা যাবে।

(১) গ্রাম এবং গ্রামবাসীদের জন্য অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদির উৎপাদন।

(২) গ্রামবাসীরা সহজে আয়ত্ত করতে পারে এমন প্রক্রিয়ায় উৎপাদন।

(৩) যে সকল যন্ত্রপাতি দ্বারা এরূপ শিল্প চলবে সেগুলি ক্রয় করা যেন গ্রামবাসীদের আর্থিক সামর্থ্যে সম্ভব হয়।

(৪) স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহার।

(৫) মনুষ্য কিংবা পশুশক্তির সাহায্য গ্রহণ।

(৬) স্থানীয় অথবা নিকটবর্তী বাজারের চাহিদা পূরণ।

(৭) শ্রমজীবীদের বেকার করে না কিংবা কাজের সন্ধানে তাদের ভিটেমাটি ছাড়তে হয় না এমন শিল্প।[১] যেমন, তেল-ঘানি, সাবান তৈরি, চর্ম-উদ্যোগ, বুনাই, গুড় উৎপাদন, কামার ও ছুতারের কাজ, কুমারের কাজ, সুতা কাটা, মৌমাছি পালন, ঢেঁকি, সিল্ক উৎপাদন, হস্তনির্মিত কাগজ, দড়ি তৈয়ারি প্রভৃতি।

কিন্তু এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা উচিত যে, গান্ধীজী ক্ষেত্রবিশেষে বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহারের সমর্থন করেছেন তবে কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থাধীনে।

আর, কুটিরশিল্প বলতে বোঝায় এমন শিল্প যাতে শিল্পী কারিগরেরা আপন কুটিরে বসেই কোন বৃহৎ কারখানা-গৃহ বা বৃহৎ যন্ত্রপাতি ছাড়াই সর্বক্ষণের জন্য কাজে নিযুক্ত থাকে। যেমন, স্বর্ণ ও রৌপ্যকার, দরজির কাজ প্রভৃতি।

অবশ্য, গ্রামশিল্প ও কুটিরশিল্পের মধ্যে সর্বদা খুব একটা ব্যবধান টানা সম্ভব হয় না। যেমন ধরা যাক, ঢেঁকি। যদি কেউ তার পারিবারিক প্রয়োজনের উদ্দেশ্যে ঘরে ঢেঁকি চালায় তবে তা কুটিরশিল্প পর্যায়ে পড়বে। আর যেখানে আরও ব্যাপকভাবে এই ঢেঁকির কাজ চলবে, তা হবে গ্রামশিল্প।

'গ্রামে ফিরে যাও'

গান্ধীজী এক সময়ে 'গ্রামে ফিরে যাও' এই কথা ও নীতি খুব প্রচার করতেন। অনেকে 'গ্রামে ফিরে যাও' এই কথার কদর্থ করে বুঝতে চেয়েছেন যে, গান্ধীজী আধুনিক উন্নত যন্ত্রবিজ্ঞানের বিরোধী; নয় তো এই যুগে বাস করে কেউ কি বিচারবুদ্ধির সঙ্গে এমন কথা বলতে পারেন যে, পুরনো আমলের কুসংস্কার ও অনগ্রসরতার প্রতীক স্বরূপ পাড়াগাঁয়ে ফিরে যাও? সেখানে কি উচ্চশিক্ষার কোন সুব্যবস্থা আছে? উন্নত চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কোন সুবন্দোবস্ত, উত্তম রাস্তাঘাট, জীবনধারণের আধুনিক প্রয়োজনীয় বহুবিধ উপকরণ প্রভৃতি

১. Why the Village Movement, p. 152

সকল কিছুরই যেখানে অভাব, যেখানে প্রাণের স্পন্দন শুনা যায় না, সেখানে পচা ডোবা, বাঁশবাগানের তলায় পর্ণকুটিরে কিসের আশায় শিক্ষিতজনেরা ফিরে যাবেন ? জীবনের ভরসা সেখানে কোথায় ?

গ্রামের এই সর্বগ্রাসী দুরবস্থাকে দূর করার জন্যই গান্ধীজী গ্রাম-উদ্যোগ আন্দোলনের সূত্রপাত করলেন। তেমনই শিক্ষিতজনের কাছে এই প্রশ্ন রাখলেন ঃ এটা কি গ্রামে ফিরে যাওয়া, না প্রকৃত প্রস্তাবে গ্রামের যা প্রাপ্য তা পুনরায় গ্রামকেই ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা ? "আমি শহরবাসীদের গ্রামে গিয়ে বাস করার কথা বলছি না। কিন্তু গ্রামবাসীদের যা পাওয়া উচিত, কেবলমাত্র সেইটুকু ফিরিয়ে দেবার জন্য শহরবাসীদের বলি। এমন একটিও কাঁচামাল কি আছে যা শহরবাসীরা গ্রামবাসীদের ছাড়া পেতে পারেন ? যদি তাঁরা তা না পান তবে সেই সব কাঁচামালকে পাকামালে পরিণত করার শিক্ষা গ্রামবাসীদের দেন না কেন ? এইরূপ শিল্পকাজই গ্রামে পূর্বকালে প্রচলিত ছিল, এবং এখনও তা তারা গ্রহণ করতে রাজী হবে, যদি না শোষণের ফাঁদ ইতোমধ্যে অনুপ্রবেশ করে।"[১]

গ্রামশিল্প পুনরুদ্ধার আন্দোলনের সঙ্গে তাই 'গ্রামে ফিরে যাও' নীতির ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। মৃতপ্রায় জীর্ণদশা গ্রামগুলির পুনর্গঠন কেবলমাত্র শিল্প পুনঃপ্রতিষ্ঠার দ্বারাই সম্ভব নয়। চাই এজন্য জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর পুনর্গঠন, জাতীয় আর্থিক ব্যবস্থার পুনর্গঠন। গ্রামগুলির দীর্ঘকালের আর্থিক শোষণের ফলে শহরগুলির বর্তমানের যে রূপলাবণ্য, গান্ধীজী সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তের পথের কথাই বলেছেন তাঁর 'গ্রামে ফিরে যাও' আন্দোলনের মধ্যে।

বিকেন্দ্রীকরণের সীমা

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, বর্তমান যুগে বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিদ্যা যে হারে এগিয়ে চলেছে তাতে বিকেন্দ্রীকরণের সুযোগ কতটুকু আছে ?

১ Cent percent Swadeshi, p. 4

কেন না, শিল্পে উৎপাদনব্যয় ও আনুষঙ্গিক খরচ কমাবার উদ্দেশ্যেই না বৃহত্তর কলকারখানা ও ব্যাপক যান্ত্রিক কলাকৌশলের সাহায্য লওয়া হয়। অধিক উৎপাদন ব্যয়ের অর্থ নিম্ন হারে মুনাফা। কিন্তু আজকালকার শিল্প সংগঠনের সাধারণ উদ্দেশ্য যেখানে স্বল্প ব্যয়ে উৎপাদন করে চড়াদরে বিক্রয়ের দ্বারা অধিকতম মুনাফা অর্জন, সেখানে গান্ধীজী যদি যন্ত্রের সাহায্য নিতে কুণ্ঠা বোধ করেন, মূলধন ও যন্ত্রপাতির কেন্দ্রীকরণের বিরোধিতা করেন তবে তা কি যুগবিরোধী কাজ হবে না? এই প্রকারের বিকেন্দ্রিত শিল্পব্যবস্থা প্রসারের সুযোগই বা কতটুকু হবে?

কিন্তু গান্ধীজী যে প্রকারের বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলেন তা কেবলমাত্র যন্ত্রের বিকেন্দ্রীকরণ নয়। মানুষের প্রয়োজন পূর্তির উদ্দেশ্যে যে উৎপাদনব্যবস্থা গৃহীত হবে আর তার ফলে সমাজে যে পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণীত হবে, গান্ধীজী চান এই দুইয়ের মধ্যে মিলন। আর তার জন্যই তিনি প্রয়োজনবোধে উৎপাদন পদ্ধতির কেন্দ্রীকরণ বা বিকেন্দ্রীকরণের সীমা নির্ধারণ করেন। উৎপাদনব্যবস্থার ফলে যদি সমাজে কেবল সংঘর্ষের সৃষ্টি হতে থাকে মানুষে মানুষে, পুঁজি ও শ্রমে, তবে তা কখনই মানুষ বা সেই সমাজের পক্ষে কল্যাণদায়ক হতে পারে না। সেইজন্য বিকেন্দ্রীকরণের নীতি মূলতঃ হচ্ছে বৃহৎ মানবিক সম্পর্কে সামঞ্জস্য বিধানের নীতি। মানুষকে কেন্দ্র করেই যন্ত্র, উৎপাদন, বণ্টন, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতি সব কিছু আবর্তিত হবে।

কোন্ শিল্প কতখানি কেন্দ্রিত বা বিকেন্দ্রিত করা হবে তা অনেকাংশে নির্ভর করে সেই শিল্পের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের উপরে। যেমন বলা যায়, একটি ইস্পাত কারখানা বা জাহাজ নির্মাণের কারখানা এগুলি কেন্দ্রিত ভারী শিল্পের পর্যায়ে আসে। এই জাতীয় শিল্পকে আমরা ইচ্ছা করলেই বিকেন্দ্রিতভাবে স্থাপিত করতে পারি না। কারণ, যেসব অর্থনৈতিক তথা ভৌগোলিক কারণের উপর ভিত্তি করে এই জাতীয় ভারী শিল্প সংস্থাপিত করা যায় তা কেন্দ্রিত পদ্ধতিতেই করা বিধেয়। যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম, শ্রম, পুঁজি প্রভৃতি

উপকরণ কেন্দ্রিতভাবে সম্মিলিত করার পরেই এইরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। আবার চিনি বা বস্ত্র শিল্প পূর্বে যেগুলি বিকেন্দ্রিত ভাবে ছিল, বর্তমানে বৈজ্ঞানিক প্রয়োগবিদ্যা ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তাগিদে ক্রমে এগুলিও কেন্দ্রিত শিল্পে রূপান্তরিত হচ্ছে। এই উভয় ক্ষেত্রেই অবশ্য ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা এবং প্রয়োগবিদ্যার পরিবর্তনের ফলেই শিল্পে কেন্দ্রীকরণ প্রবর্তিত হচ্ছে।

সুতরাং সুস্থ সুষম সমাজব্যবস্থার সংগঠনের জন্য কোন্ শিল্প কেন্দ্রিত বা বিকেন্দ্রিত হবে তা নির্ণয়ের সাধারণ সূত্রটি কি হবে? সেই নীতি এরূপ হবে যে, যে দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তা যত অধিক, তার উৎপাদনরীতিও ততই বিকেন্দ্রিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রকৃতির রাজ্যে আমরা দেখি যে, জল, হাওয়া এই দুটি জিনিসের সর্বজনীন ব্যবহার। এই কারণেই বোধ হয় এদের যোগান সীমাহীন বলা যায়। তা এতখানি বিকেন্দ্রিত যে কোন স্থানেই তা দুর্লভ হয় না। যে জিনিস সর্বজাতির মধ্যে ও সর্বদেশে প্রয়োজন হবে তার উৎপাদনও সর্বব্যাপক হবে। আর যা মাঝে মাঝে দরকার হয়, তা কেন্দ্রিত ভাবে কোন স্থানে উৎপাদন করা যায়। তদ্রূপ, কোন সমাজে খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্র প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন, যা সকলের জন্যই প্রয়োজন, অধিকতর বিকেন্দ্রিত ভাবে হবে। আর, কোন বিশেষ যন্ত্রপাতি, রেডিও, ঘড়ি প্রভৃতি দ্রব্যের উৎপাদনের জন্য সমপরিমাণ বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা নাও দেখা দিতে পারে। সেজন্য, প্রকৃত প্রস্তাবে মানুষের প্রয়োজনের মাত্রাভেদ, যন্ত্রবিজ্ঞান, প্রয়োগবিদ্যা প্রভৃতির দ্বারা বিকেন্দ্রীকরণ বা কেন্দ্রীকরণের নীতি নির্ধারিত হবে।

এই সাধারণ নীতির পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করে গ্রামে সাধারণ-ভাবে কিরূপ শিল্প সংগঠিত করা বিধেয়? যে সকল দ্রব্যের কাঁচামাল সহজভাবেই গ্রামে উৎপন্ন হয়, আর তাকে পাকামালে পরিণত করার জন্য যে শ্রম, সংগঠন তথা পুঁজির প্রয়োজন তাও প্রধানতঃ গ্রামাঞ্চলেই পাওয়া সম্ভব, সেই সকল ক্ষেত্রেই গান্ধীজী শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলেছেন। সেইজন্য একবার ভারতের

আদর্শ আর্থিক সংবিধানের বর্ণনা প্রসঙ্গে বললেন, "আমার মতে ভারতের তথা বিশ্বের আর্থিক সংবিধান এরূপ হওয়া উচিত যাতে করে কারুর খাদ্য ও বস্ত্রের অভাব না হয়। অন্য কথায়, প্রত্যেকেই যেন এমন কাজ পায় যাতে তার গ্রাসাচ্ছাদনের কোন অভাব না হয়। আর এই আদর্শ সর্বজনীনভাবে কেবলমাত্র তখনই রূপায়িত হবে, যখন জীবনধারণের মৌল প্রয়োজনগুলির উৎপাদনপদ্ধতির নিয়ন্ত্রণক্ষমতা জনসাধারণের হাতে ন্যস্ত হবে। ভগবানের দেওয়া হাওয়া ও জলের ন্যায় এগুলিও সকলেরই বিনা পয়সায় পাওয়া উচিত; অপরকে শোষণের জন্য এগুলিকে কোনরূপ ব্যবসার মাধ্যম করা উচিত নয়।

"কোন দেশ, জাতি বা গোষ্ঠীর একচেটিয়া আধিপত্যও এগুলিতে থাকা সঙ্গত নয়। এই সহজ নিয়মের অবহেলাই হচ্ছে বর্তমানের এই দুর্দশার কারণ; যা আমরা কেবলমাত্র এই দুর্ভাগা দেশে নয় পরন্তু বিশ্বের নানাস্থানে দেখি।"[১]

বিকেন্দ্রীকরণ ও দেশরক্ষা

অনেকে প্রশ্ন করেন যে, অধিকতর কর্ম সংস্থান এবং সম্পদের ন্যায্য বণ্টনের দৃষ্টিতে বিকেন্দ্রীকরণের সার্থকতা স্বীকার করা হয়; কিন্তু যেখানে কেন্দ্রিত নিয়ন্ত্রণ বর্জন করে ভারী শিল্পকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়, সেই সমাজ কি আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা অথবা বৈদেশিক আক্রমণ হতে আত্মরক্ষায় সমর্থ হবে? অন্য কথায়, অহিংস পন্থায় কি সমাজ সংরক্ষণ সম্ভব? নিঃসন্দেহে এ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আর দেশরক্ষার ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে যদি গান্ধীজী কল্পিত বিকেন্দ্রিত উৎপাদনপদ্ধতি যোগ্য প্রমাণিত না হয় তবে এ সম্বন্ধে পুনর্বিচারের প্রয়োজন আছে বৈকি।

কিন্তু তার আগে আমাদের ভেবে দেখতে হবে বর্তমান কালে সশস্ত্র পন্থায় দেশরক্ষার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে। বৈজ্ঞানিক প্রগতি নিত্য নূতন নূতন ধ্বংসাত্মক অস্ত্রশস্ত্র উদ্ভাবন করে চলেছে, বিশেষ

১, Studies in Gandhism, p. 51.

করে পারমাণবিক বোমা, আন্তর্দেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র প্রভৃতি আবিষ্কারের পরে দেশরক্ষার পদ্ধতিতেও আমুল পরিবর্তন এসেছে। এখন শ্রেষ্ঠ সামরিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত দেশও অপর দেশের ভয়ে ভীত। যেখানে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কোন সুযোগই নাই, সে অবস্থায় সশস্ত্র প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তাও লুপ্ত হতে চলেছে। তাছাড়া, আধুনিক কালে বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে আজ হিংসাত্মক পন্থার উপযোগিতা বা শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ ও সংশয় দেখা দিয়েছে, পূর্বেকার বিশ্বাস আজ যেন আর তেমন সবল নাই। আজ ক্ষুদ্রতম কোন দেশের উপরেও হিংসাত্মক আক্রমণ হলে বিশ্বের অপর নিরপেক্ষ দেশসমূহের জনমত আক্রমণকারীর উদ্যত মনোভাবকে প্রশমিত করছে। কেন এ সব হচ্ছে ? কেন এই মানসিক পরিবর্তন ? কারণ, হিংসাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের অধীশ্বর হয়েও শক্তিশালী দেশসমুহ আজ বিশ্বজনমতের মূল্য অবহেলা করতে পারছে না। তাছাড়া, হিংসাত্মক যুদ্ধের মাধ্যমে বিশ্বসমস্যার সমাধানে পূর্বের বিশ্বাস আজ শিথিল হয়ে আসছে। 'আর যুদ্ধ নয়', শান্তিপূর্ণ পথে আলাপ আলোচনার দ্বারা বিরোধ নিষ্পত্তির উপায় সম্বন্ধে আজ বিশ্বের সকল নেতাই তীব্রভাবে চিন্তা করছেন। এর একমাত্র অর্থ এই যে, আজ বিশ্বমানুষের মনোজগতে হিংসাত্মক পন্থার ব্যর্থতা সম্বন্ধে যেমন কোন সন্দেহের অবকাশ নাই, অপরদিকে শান্তিপূর্ণ অহিংস পন্থায়, আলাপ আলোচনার দ্বারা আন্তর্জাতিক সালিশী প্রভৃতি উপায়ে বিরোধ নিষ্পত্তির প্রচেষ্টা ক্রমেই জোরদার হচ্ছে। তথাপি, ধ্বংসাত্মক অস্ত্রশস্ত্র যে নির্মিত হচ্ছে না, তা নয়। কিন্তু এ সবের জন্য অপর দেশের উপর যদি অধিক পরিমাণে নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হয় তবে তার পরিণামও সুখদায়ক হয় না।

তাছাড়া, বর্তমানে আরও দুই একটি নূতন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে দেশরক্ষার প্রশ্নে। প্রথমতঃ গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ দেশসমূহের সংখ্যাবৃদ্ধি। অর্থাৎ কোন সামরিক গোষ্ঠীভুক্ত না হওয়ার সক্রিয় বাস্তব নীতি আজ পরিস্ফুট হতে চলেছে। দ্বিতীয়তঃ, বিশ্বের অধিকাংশ দেশ কোন না কোন সামরিক গোষ্ঠীভুক্ত হওয়ায় স্বাধীন চিন্তা বা বৈদেশিক নীতির স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয়। সেজন্য, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশগুলি অধিকতর শক্তিশালী

দেশসমূহের নানা প্রকাব চাপে পিষ্ট হতে থাকে। সর্বশেষে আমরা বলতে পারি যে, বর্তমান যুদ্ধ কেবলমাত্র রণাঙ্গণের যুদ্ধ নয়, ভারী অস্ত্রশস্ত্রের যুদ্ধ নয়। এ যুদ্ধের জন্য দেশের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি, বিশ্বজনমত, কূটনৈতিক ষড়যন্ত্র প্রভৃতি নানাবিধ বিষয় প্রভাব বিস্তার করে।

গান্ধীজী সেইজন্য মনে করেন যে, গণতন্ত্রকে রক্ষা করার এই পথ কল্যাণকর পথ নয়। মানুষের গণতান্ত্রিক স্বাধিকার রক্ষা করা যাবে না, যদি না আত্মরক্ষার উপায়সমূহও গণতন্ত্রসম্মত হয়। অর্থাৎ, পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম মানবসমাজের সহজে আয়ত্তে আসে এমন হবে আত্মরক্ষার পন্থা। আর এ সম্ভব একমাত্র অহিংস উপায়ের দ্বারা। যে জাতি আত্মরক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গ করতে পশ্চাৎপদ হয় না, আক্রমণকারীর উপর প্রতিশোধের বশে কোনরূপ হিংসাত্মক আচরণে প্রতিনিবৃত্ত থাকে, সেই জাতি ক্ষুদ্রতম হলেও এই যুগে বেঁচে থাকার অধিকারী। আত্মোৎসর্গের এই গৌরবময় দৃষ্টান্ত নিষ্ঠুর আক্রমণকারীর হৃদয়ে পরিবর্তন আনবে। আর এইভাবে পৃথিবীতে যুদ্ধমুক্ত সমাজের নব আবির্ভাব সম্ভব হবে। মানবসমাজের ইতিহাসে এই পরীক্ষা এখনও চলবে বহুযুগ ধরে। গান্ধীজী তার সূত্রপাত করে গেছেন এই ভারতের মাটিতে তাঁর অহিংস অসহযোগ তথা সত্যাগ্রহ আন্দোলনের দ্বারা। সমাজ সংগঠনের অন্তিম লক্ষ্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে গান্ধীজী সেইজন্য বললেন—

"পূর্ণ মানসিক ও নৈতিক প্রগতির সমন্বিত সুখস্বাচ্ছন্দ্য আনাই হবে মানবসমাজের পরিণতি। বিকেন্দ্রীকরণের দ্বারাই এরূপ লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব। অহিংস সমাজবিধানের সঙ্গে পদ্ধতি হিসাবে কেন্দ্রীকরণের কোন সামঞ্জস্য নাই।"[১]

অপরদিকে, বিকেন্দ্রিত অর্থব্যবস্থার ফলে যখন কোন দেশ স্বাবলম্বী, আত্মনির্ভরশীল হবে, অপর দেশকে শোষণ করার জন্য প্রলুব্ধ হবে না বা অপর দেশের দ্বারা শোষিত হবার রাস্তাও থাকবে না,

১. Harijan, 18-1-'42.

তখন অপর কোন দেশ সেই দেশকে আক্রমণ করার জন্য আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবে না। সেইজন্য বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা বড় প্রতিরোধ ব্যবস্থা হল দেশের আত্মনির্ভরশীল আর্থিক ব্যবস্থা।

গ্রামোদ্যোগ আন্দোলনের অন্তরায়

স্বাধীনতার পূর্বযুগে গান্ধীজী দেশে চরখা এবং অন্যান্য গ্রামশিল্প পুনরুদ্ধারের ও পুনঃপ্রবর্তনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে গেছেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রয়োজনমত চরখা সঙ্ঘ, গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘ প্রভৃতি সর্বভারতীয় স্তরে খাদি গ্রামোদ্যোগের সংস্থাও রচনা করেছিলেন। সে ছিল এক যুগ। দেশবাসীর মনোজগতে তখন খদ্দরের এক টুকরা কাপড় ছিল অতি পবিত্র মহামূল্যবান প্রতীক—স্বদেশের স্বাধীনতা তথা জাতীয় মানমর্যাদার প্রতীক ছিল এই খাদি। যার জন্য পণ্ডিত জওহরলাল খাদিকে বলেছিলেন 'স্বাধীনতার পরিচ্ছদ' (Livery of freedom)। স্বাধীনতা এল। ভারতে স্বদেশী সরকার স্থাপিত হল। কিন্তু গরীব জনতার আশা মিটল না। তাদের উত্থানের দৃষ্টিতে গ্রামশিল্পের প্রতি যথাযথ মর্যাদা দেওয়া হল না। বরং আজ বিপরীত অবস্থা। বিমাতৃসুলভ মনোভাবের ফলে নীরব গ্রামশিল্পীরা তাদের জাতিগত পেশার দ্বারা আর গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হচ্ছে না। এরা আন্দোলন করে সরবজ্ঞ হতে পারল না। সেই কারণে গ্রামবাসী আপন শিল্পের ধ্বংসের মুখে বসে দিন গুণছে।

গান্ধীজী চেয়েছিলেন খাদি ও গ্রামশিল্পের মাধ্যমে এই দেশের জন্য যা বিশেষ প্রয়োজনীয় সেই গ্রামীণ অর্থনীতিকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে। গ্রামপ্রধান দেশ এই ভারতে শতকরা ৮২ ভাগ গ্রামবাসী। গ্রামীণ জনতার কল্যাণের জন্য, কর্মসংস্থানের জন্য পল্লী অর্থনীতিতে পল্লীশিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠা বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু আজ আমাদের জাতীয় পরিকল্পনায় ভারী ও কেন্দ্রিত বৃহৎ শিল্পের তুলনায় গ্রামশিল্পের স্থান কোথায়? উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, তৃতীয় পরিকল্পনায় মোট খরচের মধ্যে গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্প খাতে বরাদ্দের

পরিমাণ শতকরা মাত্র চার ভাগ (২৬৪ কোটি টাকা)। অন্যদিকে, ভারীশিল্প ও খনিজদ্রব্যের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ২০% (১৫২০ কোটি টাকা)। এ ছাড়া, বিদ্যুৎশক্তি খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ১৩% (১০১২ কোটি টাকা)। অবশ্য, ভারীশিল্প তথা খনিজ দ্রব্য ইত্যাদির জন্য বরাদ্দের পরিমাণ অধিক হওয়া সম্ভব। কিন্তু মূল প্রশ্ন হচ্ছে, জাতীয় অর্থনীতিতে কুটির ও গ্রামশিল্পের স্থান কতটুকু নির্ধারিত হয়েছে? নিঃসন্দেহে এর উত্তরে বলা যায় যে, অর্থ বরাদ্দ হলেও জাতীয় অর্থনীতিতে পল্লী অর্থনীতির সুদৃঢ়করণের দৃষ্টিতে কোন নির্দিষ্ট পন্থা গ্রহণ করা হয়নি। ভারতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চালু হওয়ার পরে এবং খাদি গ্রামোদ্যোগ কমিশনের পরিচালনায় দেশে খাদি ও গ্রামশিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন তথা বিক্রয় বেড়েছে ঠিকই। কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধির কারণ এই নয় যে, পল্লী অর্থনীতি পূর্বের তুলনায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পল্লী-অর্থনীতিক কাঠামোয় এমন শক্তির সঞ্চার হয় নাই যাতে করে বলা যায় যে, এই অর্থনীতি আপন গতিতে ক্রিয়াশীল হয়েছে। এই স্বয়ংক্রিয়তা সৃষ্টি করাই হবে পল্লী অর্থনীতিকে সজীব ও সুদৃঢ় করার অন্যতম প্রধান কাজ। আগামী কালের ভারতে গ্রামোদ্যোগ আন্দোলনের কর্মীদের এই দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

পল্লী অর্থনীতিতে এই প্রাণ ও গতিবেগ সঞ্চারের জন্য অন্যতম প্রধান প্রয়োজন হল বর্তমান সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সাধন। সরকার মিশ্র অর্থনীতির প্রবর্তনে উৎসাহ দিতে পারেন ঠিকই। কিন্তু যেখানে দেখা যাবে যে, এরূপ মিশ্র অর্থনীতির ফলে দেশের বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ বহুলভাবে ব্যাহত হচ্ছে, সেখানে ভিন্ন নীতির প্রয়োজন আছে বৈকি। একই স্থানে কোন একটি দ্রব্য উৎপাদনের জন্য যদি সরকারী নীতির ফলে বৃহৎ শিল্প এবং গ্রামশিল্প চলতে থাকে তবে অর্থনীতির একজন প্রাথমিক ছাত্রও বলতে পারবে যে, প্রতিযোগিতার সাধারণ চাপে সেই গ্রামশিল্প কখনই টিঁকে থাকতে সক্ষম হবে না।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ঢেঁকি শিল্পের কথা। সরকার একদিকে ঢেঁকি শিল্পের প্রসারের জন্য উৎপাদনের উপর সাহায্য বাবদ

'সাবসিডি' দিচ্ছেন, অপরদিকে যদি সেই একই এলাকায় ধান ভানা কল (হাস্কিং মেশিন) বসাবার ঢালাও লাইসেন্স দেওয়া হয় তবে অচিরে দেখা যাবে যে, সেই অঞ্চলে কুটিরশিল্প রূপ ঢেঁকি ক্রমেই লুপ্ত হতে বসেছে। দুঃখের কথা এই যে, ঢেঁকি ও তেল ইত্যাদি শিল্পে গ্রামশিল্পকে সংরক্ষণের দৃষ্টিতে কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টে এই মর্মে সুস্পষ্ট আইন প্রণীত হওয়া সত্ত্বেও প্রাদেশিক স্তরে সেই আইন কার্যকর হল কিনা তা দেখার তেমন দরদী ব্যবস্থা না থাকায় পল্লী অর্থনীতির প্রাণ পিষ্ট হবার উপক্রম হয়েছে। পশ্চিম বাংলার গ্রামাঞ্চলে এইরূপ ধান ভানা কলের অবাধ আমদানীতে পল্লী অর্থনীতি তথা পল্লীবাসীর কর্মসংস্থান ভীষণ ভাবে ব্যাহত হচ্ছে। সুতরাং চোখের সামনে যেখানে কল চলবে, সেখানে গ্রামশিল্পের সমর্থনে প্রচার কিংবা সাবসিডির প্রলোভন বেশীদিন স্থায়ী হয় না। পরিণামে এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, এই 'মারাত্মক সহাবস্থান' চলতে থাকলে গ্রামশিল্পের শ্মশানযাত্রার পথ সুগম হয়ে আসবে। সরকার তথা গ্রাম-উদ্যোগের কর্মীবৃন্দের এই জটিল অবস্থা হতে উদ্ধার হবার পথ বের করতে হবে।

কেবল তাই নয়, নগর এলাকায় বৃহৎ শিল্পের প্রসারের ফলে যে পল্লী এলাকার গ্রামশিল্পগুলি ধ্বংসের পথে চলেছে, সেই সংকেতধ্বনি করেছেন প্রখ্যাত [illegible] বদ্ এবং গ্রেট বৃটেনের 'ন্যাশনাল কোল বোর্ডের' আথিক উপদেষ্টা মিঃ ই. এফ. শুমাখের। নগর এলাকার বৃহৎ শিল্পের অর্থনীতি গ্রামীণ অর্থনীতিকে গ্রাস করে যে বিষাক্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি করছে তা আজ স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে। তিনি বলেছেন, "সুতরাং এই পারস্পরিক দুষ্ট প্রভাবকে প্রতিরুদ্ধ করাই যে জাতীয় আর্থনীতিক পরিকল্পনার প্রথম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, সে কথা অনায়াসে বলা চলে। এর অর্থ হল, গ্রামীণ অর্থনীতির অকৃষিজাত উৎপাদনকে ক্রমান্বয়ে ধ্বংস করে ফেলার কাজে নগর এলাকা থেকে যে নিরঙ্কুশ প্রতিযোগিতা চলছে তাকে বন্ধ করতে হবে এবং তার পরিবর্তে সমগ্র গ্রামীণ অর্থনীতির সুসংহত উন্নতিবিধানের ব্যবস্থা করতে হবে।

"কেবলমাত্র কৃষির উন্নতির দিকে নজর দেওয়াই যথেষ্ট নয়। আমার মতে মোট জনসংখ্যার ৮৫% যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সেই গ্রামীণ অর্থনীতির ঘনায়মান দারিদ্র্যের মুখ্য কারণ হল অকৃষিজাত উৎপাদনের ক্রমিক বিলুপ্তি। এই ধ্বংসের ফলে গ্রামসমাজে যে কৃষ্টিমূলক দৈন্যদশা এসেছে তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হল কৃষির ক্ষয়িষ্ণুতা।"[১]

আমাদের এখন এই মূল সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। খাদি শিল্পের সম্মুখেও এই সমস্যা যেমন বিদ্যমান, অন্যান্য গ্রামশিল্পেরও অবস্থা একরূপ। এ কথা যদিও ঠিক যে, পূর্বের তুলনায় গ্রামশিল্পজাত দ্রব্যসমূহের উৎপাদন এবং বিক্রয় বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে, তথাপি জাতীয় অর্থনীতিতে এরূপ জোড়াতালি দেওয়া নীতির ফলে গ্রামশিল্পের ভবিষ্যৎ সুরক্ষা কখনই সম্ভব হবে না। আমরা চাই সমগ্র জাতীয় খাদি ও অন্যান্য গ্রামশিল্পের জন্য যে অর্থব্যয় হবে তা যেন পুরাপুরি পল্লী-অর্থনীতিকে পরিপুষ্ট ও সুদৃঢ় করতে সাহায্য করে। এজন্য যা বিশেষ রূপে প্রয়োজন তা হচ্ছে জাতীয় আর্থিক কাঠামোতে খাদি গ্রামোদ্যোগের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্ধারণ। বৃহৎ শিল্প ও গ্রামশিল্পেব উৎপাদন ও উৎপাদিত দ্রব্যসমূহের বিক্রয়ের জন্য ক্ষেত্র পৃথকীকরণের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে রয়েছে। উভয়প্রকার শিল্প-ব্যবস্থার মধ্যে ধ্বংসাত্মক প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা বন্ধ করে প্রত্যেকের জন্য প্রয়োগক্ষেত্র বা কার্যক্ষেত্রের ভিন্নতা সাধন বাঞ্ছনীয়। আর যেখানে সম্ভব সেখানে পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতাও চলতে পারে। কিন্তু সে সহযোগিতা যেন বৃহৎ শিল্প কর্তৃক গ্রামশিল্পকে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে না হয়। যেমন বলা যায় যে, যে অঞ্চলে ঢেঁকি চলবে সেখানে যেন কোন প্রকারেই হাস্কিং মেসিন চলার অনুমতি

১ Roots of Economic Growth, p. 43

শুমাখের জাতিতে জার্মান হলেও ইংলণ্ডের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে এখন সেখানেই বসবাস করছেন। ১৯৪৬-৫০ সাল পর্যন্ত ইংলণ্ডের নিয়ন্ত্রণ কমিশনের আর্থিক উপদেষ্টা রূপে কাজ করেন। ব্রহ্ম সরকারের আমন্ত্রণে সেখানে কিছুকাল কাজ করেছেন। ১৯৬২ সালে তিনি বিভিন্ন সংস্থার আমন্ত্রণে ভারতে এসে ভারতীয় আর্থিক ব্যবস্থা ও জাতীয় পরিকল্পনার উপর কতকগুলি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন।—লেখক

সূচক ব্যবস্থা করা না হয়। যদি দেখা যায় যে, সমগ্র দেশে চাউলের চাহিদা ঢেঁকির দ্বারা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না, কেবলমাত্র তখনই অন্য পন্থার আশ্রয় লওয়া যুক্তিযুক্ত হবে। আর যদি এই নীতি গ্রহণ করা হয় তবে কিছুকালের মধ্যেই দেখা যাবে যে, উপযুক্ত পরিকল্পনা, সংগঠন তথা উৎপাদন দক্ষতা থাকলে সমগ্র দেশের জন্য প্রয়োজনীয় চাউল, বস্ত্র, তেল, গুড়, আটা প্রভৃতি বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমূহের সরবরাহ দেওয়া বিকেন্দ্রিত শিল্পব্যবস্থায় সম্ভব। এইরূপ অবস্থা হলে আমরা তখন সহজেই বলতে পারব যে, এই এই দ্রব্যের উৎপাদনে এখন হতে পুরাপুরি বিকেন্দ্রিত শিল্পপ্রয়োগ করা হোক। বৃহৎ শিল্পগুলি যেন অনুপ্রবেশ না করে। এই হবে পল্লীশিল্প তথা পল্লী অর্থনীতি সুদৃঢ় করার কার্যকর পন্থা। জনমানসে এবং সরকারী দপ্তরে এই নীতি গ্রহণ করবার সপক্ষে কর্মীদের উপযুক্ত লোকশিক্ষা-মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ভবিষ্যৎ আন্দোলনের প্রগতির দৃষ্টিতে আমাদের এই পথে চিন্তা করতে হবে।

সংরক্ষণ বনাম সহায়তা

বর্তমান ভারতে গ্রামশিল্পের সুষ্ঠু বিকাশ সাধন তথা প্রগতির জন্য সরকারের তরফ হতে যা করা বাঞ্ছনীয় তা হচ্ছে সংরক্ষণের (Protection) ব্যবস্থা। সরকার গ্রামশিল্পের জন্য সহায়তা (aid, subsidy) দিচ্ছেন ঠিকই। কিন্তু কেবল আর্থিক সহায়তার দ্বারা সেই শিল্পের সুষ্ঠু বিকাশের পথ মোটেই কণ্টকমুক্ত হবে না। কেন না, উপরে যে সমস্যার কথা আলোচিত হয়েছে তার সমাধানের জন্য কোন-না-কোন প্রকারের রক্ষাকবচের প্রয়োজন আছে। গ্রামশিল্পের উপর সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থার কথা উঠলেই অনেকে বিরূপ সমালোচনা করেন। জাতীয় অর্থের অপচয় হবে এরূপ যুক্তি উত্থাপিত করেন। কিন্তু আজ ভারতে চিনি প্রভৃতি বৃহৎ শিল্পের জন্য এত দীর্ঘকালব্যাপী সরকারী সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা আছে কি ? ভারতে যে সকল বৃহৎ কেন্দ্রিত শিল্প চালু করা হয়েছে বা হবে, বিদেশী প্রতিযোগিতা হতে রক্ষার জন্য সেই সব শিল্পের সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

আছে বইকি। (অবশ্য আমরা যদি সেই শিল্পগুলির ক্রমিক উন্নতি চাই)। তদ্রূপ, যে সব গ্রামশিল্প জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে স্বীকৃতি পেয়েছে তাদের উপযুক্ত উন্নতি তথা স্থায়িত্ব বিধানের জন্য বৃহৎ শিল্পের প্রতিযোগিতা রূপ আক্রমণের হাত থেকে সংরক্ষণের ব্যবস্থাও অবশ্য প্রয়োজনীয়। আর এই সংরক্ষণ না থাকলে আর্থিক সহায়তা স্বরূপ যে অর্থ ব্যয় হবে তা ভস্মে ঘি ঢালার সমতুল হবে। তাই সহায়তার সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত সংরক্ষণেরও প্রয়োজন আছে। এই শিল্পের উপরে বৃহৎ শিল্পের আক্রমণ যাতে না হয় সেজন্য পরিমাণমত ট্যাক্সের প্রাচীর খাড়া করা হয়। এই হল সংরক্ষণ। কিন্তু ভারতীয় আর্থিক ব্যবস্থায় গ্রামশিল্পের জন্য এরূপ সংরক্ষণ আজ পর্যন্ত দেওয়া হয় নাই। আর যে সহায়তা সরকার দিচ্ছেন, অবস্থাভেদে তা কম বেশী হতে বাধ্য। সেজন্য এই আর্থিক সহায়তার উপর নির্ভর করে গ্রামশিল্প বাঁচতে পারে না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, গ্রামশিল্পের জন্য এই রক্ষাকবচের কোন ব্যবস্থা করা যায় কি না? সরকার আজ পর্যন্ত সংরক্ষণ দেন নাই। অপরপক্ষে বিরোধী দলগুলি বলবে যে, তাঁদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা না আসা পর্যন্ত তাঁরা এ সম্বন্ধে কোন কিছু করতে অপারগ। আজ সকল রাজনৈতিক দলই যেখানে সত্তাপরায়ণ, যেখানে সত্তা হাতে এলেও কতটুকু সংরক্ষণ দেওয়া হবে এই প্রশ্ন বিবেচনাধীন, সেখানে রক্ষাকবচ দেবে কে? গ্রামশিল্পকে রক্ষা করবার এই জরুরী দায়িত্ব নেবে কে? এ সম্বন্ধে আচার্য বিনোবাজী তাঁর পশ্চিম বাংলা পরিক্রমাকালে বীরভূমে শ্রীনিকেতন আশ্রমে কর্মীদের সমক্ষে সমাধানের যে সূত্র বলেছেন তা এই:

"আমি বলি এই রক্ষাকবচের বিশেষ প্রয়োজন। যে পরিকল্পনা এই রক্ষাকবচ দিতে পারে তার নাম 'গ্রামদান'।"[১]

সুতরাং গান্ধী বিনোবার ন্যায় রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ ব্যক্তিরা সরকারের

১ শ্রীনিকেতনে কর্মী বৈঠকে প্রদত্ত ভাষণ, ১০-১-৬৩

উপর নির্ভরতার বদলে জনশক্তির উদ্বোধনের দ্বারা স্বাভাবিক সংরক্ষণ সৃষ্টির কথা বলবেন। জনগণের মধ্যে এই নব চেতনা সৃষ্টি করাই কঠিন কাজ। গ্রামদান এই গ্রামভাবনা, গ্রামচেতনা তৈরির পথ প্রশস্ত করবে।

অনুন্নত দেশের আর্থিক শোষণের কাজে অবাধ বাণিজ্য নীতি যেমন ফলপ্রসূ হয়েছে, তেমনই গ্রামশিল্পের ধ্বংসের উদ্দেশ্যে আধুনিক উন্নত যানবাহন প্রণালীও মারাত্মক হয়েছে। উন্নত দেশগুলি অবাধ বাণিজ্যের আওতায় অনুন্নত দেশসমূহ হতে কাঁচা মাল আমদানী ও পাকামাল রপ্তানীরূপ লেনদেনের দ্বারা লাভবান হয়েছে। এর ফলে, বিশ্বের তাবৎ ঔপনিবেশিক দেশসমূহ ক্রমশঃ রিক্ত হয়ে নিঃস্ব হতে চলেছে। এই সম্বন্ধে কঠোর সত্য উল্লেখ করেছেন মিঃ শুমাখের—"ভারতবর্ষের উপর অবাধ বাণিজ্য জোরপূর্বক চাপিয়ে দিয়ে ইংলণ্ড ভারতের বিরুদ্ধে পাপকর্ম করেছে। ইংলণ্ডের কাছে এটা হয়ত খাদ্যস্বরূপ ছিল, কিন্তু ভারতের কাছে তা হয়েছে বিষবৎ।"[১] বৃহৎ শিল্প কর্তৃক পল্লীশিল্পের উপর আক্রমণ সম্বন্ধেও আমরা হয়ত পুনর্বার এইরূপ ভুল করবার পথে অগ্রসর হচ্ছি। সংরক্ষণের আশু প্রয়োজনীয়তা এখানেই।

১ Roots of Economic Growth, p-40.

সপ্তম অধ্যায়

গান্ধীজীর দৃষ্টিতে চরখা

গ্রামে গ্রামে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করাই ছিল গান্ধীজীর কল্পনার বিকেন্দ্রিত সমাজব্যবস্থার আদর্শ। স্বরাজের জন্য তিনি যে সংগ্রাম করেছিলেন তা আপাতদৃষ্টিতে বিদেশীর শৃঙ্খল মোচনের সংগ্রাম হলেও মূলতঃ ছিল ভারতের গ্রামীণ জীবনের ও গ্রামীণ সভ্যতার পুনরুদ্ধার করার সংগ্রাম। কারণ, গান্ধীজীর কাছে এটা সূর্যালোকের ন্যায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়েছিল যে, ভারতের সমাজ-জীবনের পুনর্গঠনের জন্য গ্রামীণ জীবনের পুনর্গঠন সর্বপ্রথমে প্রয়োজন। তজ্জন্য গ্রামসভ্যতাকে রচনা করার উদ্দেশ্যে তাঁর গঠনকর্মের কার্যক্রম উপস্থাপিত করলেন। আর গঠনকর্মের সমগ্র পরিকল্পনার মধ্যে সৌরমণ্ডলে সূর্যের ন্যায় চরখা এক অদ্বিতীয় স্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছে। চরখাকে কেন্দ্র করেই তাঁর গ্রামস্বরাজের কল্পনা। চরখাকে কেন্দ্র করেই তাঁর 'ধ্যানের ভারতের' স্বপ্ন।

সুতরাং গান্ধীজীর সমগ্র পরিকল্পনায় চরখার স্থান কোথায়, সামাজিক ও আর্থিক মূল্য নিরূপণের ক্ষেত্রে চরখার প্রয়োজনীয়তা, খাদি অর্থনীতির তাৎপর্য কোথায় ও কেন, চরখার মাধ্যমে গ্রাম স্বরাজ প্রভৃতি প্রশ্নের সঠিক ধারণা থাকা বিশেষ প্রয়োজন। গ্রামীণ জীবনের পুনরুদ্ধার ও পুনর্গঠনের জন্য গান্ধীজী যে বিকেন্দ্রিত আর্থিক তথা সামাজিক ব্যবস্থা রচনা করার কথা ভেবেছিলেন তাতে খাদি ও অন্যান্য পল্লীশিল্প কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত থাকবে। কারণ, তিনি এই চরখার মাধ্যমে অবহেলিত পল্লীবাসীর আর্থিক, সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক জীবন পুনর্গঠিত করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর এই চরখা বা খাদি আন্দোলন শৃঙ্খলিত, ভয়ে ভীত মানবগোষ্ঠীর মনে নূতন চেতনার স্ফুলিঙ্গ জ্বালাবার কাজে কতখানি সফল হয়েছে তার প্রমাণ আমরা পাই গান্ধীজীর দেশব্যাপী অহিংস অসহযোগ তথা সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মধ্যে।

অনেকে মনে করেন যে, গান্ধীজীর খাদি আন্দোলন মুখ্যতঃ পরাধীনতার বন্ধনমুক্তির একটি মাধ্যম মাত্র। কিন্তু তাঁরা চরখার প্রতি গান্ধীজীর সমগ্র দৃষ্টির সন্ধান পান নাই বলা চলে। কেবলমাত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের হাতিয়ার রূপেই গান্ধীজী যদি চরখাকে ব্যবহার করতেন তবে কেন তিনি স্বদেশে প্রস্তুত মিলবস্ত্রকেও প্রকৃত স্বদেশী বস্ত্র বলতে স্বীকৃত হন নাই ?

গান্ধীজীর পূর্বেও চরখা এই দেশে প্রচলিত ছিল। মুসলমান রাজত্বের সময় ঢাকার মসলিন বস্ত্র জগদ্বিখ্যাত ছিল। কিন্তু তখন চরখা ছিল দারিদ্র্যের প্রতীক। অহিংসার শক্তিতে এই চরখা তখন প্রাণবন্ত হয়ে উঠে নাই। ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে, রাজাদের আমলে এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময়েও নারী ও নিম্ন জাতির লোকেদের কাছ হতে বাধ্যতামূলক শ্রম আদায় করা হত। চরখা ছিল এইরূপ বাধ্যতা ও জবরদস্তিমূলক শ্রম তথা হিংসার অন্যতম প্রতীক। গরীব কাটুনীরা যেখানে তুটি পয়সা বা এক মুঠা শস্য পেত, সেখানে মসলিন বস্ত্র পরিহিতা মহিলারা প্রভূত বিলাসিতার মধ্যে চলাফেরা করতেন। শোষিত শ্রমের এ ছিল এক শোচনীয় দৃষ্টান্ত। কিন্তু গান্ধীজী এই চরখাকে নব মন্ত্রে, নব শক্তিতে দীক্ষিত করলেন। জাতির উত্থানের মন্ত্র এতে সঞ্চারিত হল। দেশব্যাপী জড়তা দূর করে আত্মনির্ভরতা, আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করে সমাজে এক নূতন চেতনার সৃষ্টি করল চরখার সমবেত ঘূর্ণন। তাই গান্ধীজী চরখার মাধ্যমেই স্বরাজের প্রথম পাঠ দান করেছিলেন এই সুপ্ত অবনত মানবগোষ্ঠীকে। এক নূতন জাগরণী শক্তিতে সঞ্জীবিত করলেন চরখাকে গান্ধীজীই। কেবল তাই নয়, পরাধীনতার অবসানের পর চরখার মাধ্যমেই তিনি এক অহিংস আর্থিক ও সামাজিক বিধান প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এই হচ্ছে খাদির প্রকৃত দর্শন।

চরখার ইতিকথা

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভারতে চরখার প্রচলন গান্ধীজীর পূর্বেও ছিল। গান্ধীজী সেই চরখাকে পুনরুদ্ধার করলেন। পুন-

রুদ্ধারের সেই ইতিহাস জানাও অত্যাবশ্যক। শুনলে অবাক হতে হয় যে, ১৯০৮ সালে লণ্ডনে প্রথম গান্ধীজী চরখা দেখেন। বিদেশী বন্ধন হতে মুক্তির মন্ত্র যাতে ধ্বনিত হবে সেই জিনিসের প্রথম সন্ধান পাওয়া গেল বিদেশের ভূমিতে। দক্ষিণ আফ্রিকা হতে এক প্রতিনিধি-দলের নেতারূপে তিনি তথায় যান। সেখানে অনেক উৎসাহী ভারতীয়দের সঙ্গে ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে হঠাৎ যেন তাঁর মনে এই ভাবনা উদিত হল যে, চরখা ব্যতীত স্বরাজ আসবে না। তখন তাঁর এমনও মনে হয়েছিল যে, সকলকেই সুতা কাটতে হবে। কিন্তু গান্ধীজী সেই প্রথম অবস্থায় চরখা ও তাঁতের মধ্যে পার্থক্য সঠিক বুঝতেন না বলে 'হিন্দ্ স্বরাজ' পুস্তকে চরখা বুঝাতে তাঁত শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

যদিও মানসলোকে চরখার প্রথম উদয় হয়েছিল ১৯০৮ সালে, কিন্তু এর প্রথম প্রয়োগ শুরু হল ১৯১৮ সালে। আর প্রথম খাদি-প্রতিজ্ঞা লওয়া হল ১৯১৯ সালে। কংগ্রেস কার্যসূচীতে চরখা স্থান পেল ১৯২১ সালে। তখন হতে চরখা তথা খাদির ইতিহাস ভারতের জাতীয় ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে রয়েছে।

চরখার সুতা হতে প্রথমে খাদি বস্ত্র উৎপাদনের ইতিহাসের এক সুন্দর বর্ণনা প্রসঙ্গে গান্ধীজী লিখেছেন—

"১৯১৫ সালে আমি প্রথমে তাঁত চালান শিখি। পরে সুতাকাটা শিখি। বিদেশী সুতা ও দেশী মিলের সুতা দিয়ে আমি নিজে বয়ন করেছি। বুনবার সময় আমার এই কথা মনে হয়েছিল যে, কাপড়ের কলগুলি আরও সুসংগঠিত হলে আমার এবং এরূপ হাজার হাজার তাঁতিদের অবস্থা কী হবে ?···আমাদের সুতা কাটা শেখাতে পারবে এমন একজন কাটুনীকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিলাম। সুতা কাটার কাজ যেখানে চলছে, এমন গ্রামের সন্ধানও আমি করছিলাম। অবশেষে এক গুজরাতী ভগ্নী যিনি অস্পৃশ্যদের মধ্যে সেবাকাজ করছিলেন, তাঁরই প্রচেষ্টায় বিজাপুরে (গুজরাট) কিছু মুসলমান মহিলা কাটুনীর সন্ধান পেলাম। সেই মুহূর্ত হতে চরখার পুনরুদ্ধারের মহান্ কাজ শুরু হল। এই আবিষ্কারের পর আমি স্থির

করলাম যে, আশ্রমে বিদেশী কিংবা দেশী মিলের সুতায় আর এক ইঞ্চি থানও বয়ন করা হবে না।"[১]

সুতা কেটে বস্ত্রবয়ন শিল্প ভারতে সুপ্রাচীন কাল হতে প্রচলিত আছে। ঋগ্বেদে বিভিন্ন শ্লোকে এরূপ উল্লেখ আছে যে, সমাজে সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও নারীরাও গরীব দুঃখাদের ন্যায় সুতা কাটতেন। প্রবীণ ব্যক্তিরা চরখা ও তাঁতকে যজ্ঞকর্মরূপে গণ্য করতেন।[২] তৎকালে কৃষিকাজের ন্যায় সুতা কাটা ও বস্ত্রবয়ন শিল্প সর্বজনীন ছিল।

প্রকৃতপক্ষে গান্ধীজী ১৯১৮ সালে খাদি আন্দোলনের সূত্রপাত করলেন। কিন্তু তখন খদ্দরের ধুতি তৈরী করা এক দুরূহ কাজ ছিল। গান্ধীজী তাই বলেছিলেন, "আমি চটের মত মোটা বস্ত্র অথবা কম্বল পরিধান করতেও রাজী আছি, তথাপি মিলের ধুতি পরব না।"[৩] সত্য সংকল্প, শুভ সংকল্পের শক্তি অসাধারণ। একমাসের মধ্যেই মগনলাল গান্ধী ধুতি বুনলেন।

বন্যা ও দুর্ভিক্ষ পীড়িত, অনাহারগ্রস্ত দুঃস্থ জনতার সাহায্যের উদ্দেশ্যেই চরখা ও খাদি কাজের প্রথম পত্তন হয়েছিল। দুঃস্থ জনসাধারণকে কর্মের বিনিময়ে সাহায্যদানই হবে উত্তম রিলিফ কাজ। চরখায় এই আপাত-সাহায্যকর্ম উত্তমরূপেই সম্পন্ন হয়েছে বলা যায়। এর পরে ১৯৩৪-৩৫ সালে কাটুনীদের জীবনধারণের জন্য নিম্নতম মজুরি দান এবং খাদি বিক্রয়ের পরিবর্তে খাদি গ্রামবাসীরাই পরিধান করবে—এই নীতির উপর গান্ধীজী গুরুত্ব দিলেন। খাদির তৃতীয় পর্যায় শুরু হয় ১৯৪৪-৪৫ সালে। জেল হতে মুক্তির পর গান্ধীজী খাদির নব-সংস্করণের প্রস্তাব করলেন। খাদির কাজ বিচ্ছিন্নভাবে না করে গ্রামবাসীদের সমগ্র জীবনের সঙ্গে তা যুক্ত করে এক সমগ্র সেবার

১. Khadi—Why & How, p. 2

২. ঋগ্বেদ ১০ম, ৫৩-৬ শ্লোক, ১৩০-১ শ্লোক

৩. Khadi—Why & How, p. 204

বৈপ্লবিক পরিকল্পনা গান্ধীজী তাঁর সহকর্মীদের নিকট পেশ করলেন। খাদির সমগ্র শক্তি যেন এরূপ সমগ্র গ্রামসেবার মাধ্যমে গ্রামবাসীর জীবনে প্রতিফলিত হয় এই ছিল গান্ধীজীর সংকল্প। স্বাধীনতার পরে খাদির চতুর্থ পর্যায় শুরু হয়েছে—খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশনের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে খাদি ও পল্লীশিল্পের প্রসারলাভ এবং জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় খাদি ও অন্যান্য গ্রামশিল্পের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ। গান্ধীজীর কল্পনার আদর্শ গ্রামস্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য আর্থিক ও শাসনতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ একান্ত প্রয়োজন। এই বিরাট্ কাজ একদিনে নিষ্পন্ন হবে না। ধাপে ধাপে, স্তরে স্তরে সামগ্রিক বিকেন্দ্রীকরণের পথে অগ্রসর হতে হবে। এই পরিকল্পনাকে খাদি ও পল্লীশিল্প কেন্দ্রিত করাই হবে আগামী কালের খাদি আন্দোলনের যাত্রাপথ।

কেন এই চরখা ?

সাধারণ দৃষ্টিতে এমন মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, গান্ধীজী বুঝি দেশ হতে ইংরাজ বিতাড়নের উদ্দেশ্যেই চরখা আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন। অর্থাৎ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তিনি প্রধানতঃ চরখার কার্যক্রম প্রচলন করেছিলেন। সেজন্য তাঁদের দৃষ্টিতে স্বাধীনতা লাভের পরে খাদির কার্যক্রম চালিয়ে যাবার কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই।

কিন্তু দেশব্যাপী খাদি আন্দোলনের প্রচলনের ও প্রসারের জন্য গান্ধীজী আজীবন যে প্রচেষ্টা করেছেন তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, চরখার সূতার মধ্যে তিনি আরও বৃহত্তর, মহত্তর কিছুর সন্ধান পেয়েছিলেন। না হলে এই চরখার সূতার মধ্যে তিনি সমগ্র জাতির রাজনৈতিক বন্ধনমুক্তিরূপ মহান্ সংগ্রামের সঙ্গে আর্থিক তথা সামাজিক সমতা বিধানের আদর্শকে রূপায়িত করার কথা কেমনভাবে কল্পনা করতেন ? তাছাড়া, জাতির পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে গান্ধীজী যে রচনাত্মক কার্যক্রমের প্রস্তাব কার্যকর করলেন তাতেও এই চরখাকেই তিনি মূল কেন্দ্রে সংস্থাপিত করেছেন।

সেজন্য রাজনৈতিক কারণ ছাড়াও চরখার পিছনে আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণ সমূহের সমাবেশ হয়েছে। প্রথমতঃ, দীর্ঘকালের পরাধীনতার জন্য জাতির মেরুদণ্ড ভগ্নপ্রায় হয়ে আসছিল। স্বাধীন মর্যাদাবোধ, আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতা প্রভৃতি গুণের বিকাশ প্রায় স্তব্ধ হয়ে এসেছিল। অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও জড়তা যেন সমগ্র জাতিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। উদ্যমশীলতা, স্বতন্ত্র চিন্তাশক্তি, সাহসিকতা লুপ্ত হয়ে জাতি জীবন্মৃত অবস্থায় দিন অতিবাহিত করছিল। দেশবাসী অন্য কোন পথ না পেয়ে ভাগ্যের উপরে সবকিছু সমর্পণ করে একটি ভয়ে ভীত, ক্ষয়িষ্ণু জাতিতে পরিণত হওয়ার মুখে গান্ধীজী এলেন। তাদের স্বাধীনতা ও নির্ভীকতার উদার মন্ত্রে দীক্ষিত করবার মানসে অহিংস বিপ্লবী গান্ধী গণসংযোগের মাধ্যম রূপে পুরাকালের চরখাকে উজ্জীবিত করলেন। দেশের লাখ লাখ গ্রামে সুপ্ত অবনত জনতার হাতে ঘরে ঘরে এক নূতন কর্মপ্রয়াসের সৃষ্টি করলেন গান্ধীজী। স্বাধীনতার জন্য জাতিকে প্রস্তুত করে তোলাই প্রথম কাজ যে কোন সমাজবিপ্লবীর। লোকের মানসলোকে স্বাধীনতার আগুন জ্বালাতে হবে। জাতিকে নির্ভীক হতে হবে। অকাতরে জীবন আহুতি দেবার শিক্ষা নিতে হবে। জাতিকে এইভাবে গঠন করার উদ্দেশ্যেই গান্ধীজীর গঠনমূলক কর্মের প্রবর্তনা। সেইজন্য, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৈব দুর্বিপাকের সময় লক্ষ লক্ষ অসহায় পরিবারের ক্ষুধার অন্ন দিয়েছে চরখা। চরখার লক্ষ্য কী সে সম্বন্ধে গান্ধীজী একবার বলেছিলেন—

"চল্লিশ কোটি নরনারীর সকলে যদি চরখা চালায় তবে লক্ষ লক্ষ লোকের পরিধানের জন্য যথেষ্ট খাদি উৎপন্ন হবে। কিন্তু কাজের দিক দিয়ে এটাই বড় কথা নয়। চরখাকে অবলম্বন করে ৪০ কোটি মানুষের মধ্যে সহযোগিতামূলক যে কর্মপ্রয়াস জাগ্রত হবে তারই মূল্য সবচেয়ে বেশী।"

[প্রার্থনাসভা—১৩-১২-৪৭]

সুতরাং সহযোগিতা ও স্বেচ্ছাপ্রদত্ত শ্রমের ভিত্তিতে গান্ধীজী

ব্যাপক গণচেতনা উদ্বুদ্ধ করার কাজে ব্যাপৃত হয়েছিলেন। চরখার এই নীরব একতার শক্তিকে অহিংসব্রতী গান্ধী স্বরাজের সংগ্রামে প্রযুক্ত করলেন। এই হচ্ছে চরখার রাজনৈতিক রূপ। বিরাট্ বিচ্ছিন্ন সুপ্ত জাতির মনে গান্ধীজী তাই চরখার মাধ্যমেই স্বরাজের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করলেন।

দ্বিতীয়তঃ, আমাদের সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলনের ফলে তারই ভ্রান্ত মোহে শরীরশ্রমকে ঘৃণা করা শুরু হল। শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীর দল হাতে কাজ করাকে অমর্যাদাকর বিবেচনা করতে লাগল। চরখায় সূতা কাটার মাধ্যমে গান্ধীজী আপামর জনসাধারণের মধ্যে শরীরশ্রমের প্রতি আগ্রহ ও মর্যাদবোধ জাগাতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। শ্রমনিষ্ঠা যে-কোন সমাজের সমতাযুক্ত বিকাশের জন্য অতীব প্রয়োজনীয়। শ্রমবিমুখতা জাতীয় প্রগতির পথে একটি প্রধান অন্তরায়। গান্ধীজী এই অন্তরায় দূরীকরণের কাজে হাত দিয়েছিলেন।

তৃতীয়তঃ, শ্রমবিমুখতার ন্যায় জাতিভেদ, শ্রেণীভেদ, উচ্চ-নীচভেদ, ধর্মভেদ প্রভৃতি অসংখ্য বিভেদে ভারতীয় সমাজ ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। সূতা কাটার ন্যায় সামূহিক সহযোগিতামূলক কার্যক্রমের দ্বারা গান্ধীজী এই ছিন্নবিচ্ছিন্ন সমাজকে, ধনী-গরীবকে, শিক্ষিত-অশিক্ষিতকে হিন্দু-মুসলমানকে এক মিলনের সূত্রে বাঁধতে উদ্যোগী হলেন। একতা ও সহযোগিতা হচ্ছে সমাজদেহের দুইটি প্রধান বাহু। এই দুই বাহু যাতে একত্রে কাজ করে তজ্জন্য গান্ধীজীর খাদি আন্দোলন। সর্বজনীন সূতা কাটার কাজ পুরাদমে চললে সমাজে নিঃসন্দেহে একটি সাধারণ একতাবোধ দেখা দেবে পরস্পরের মধ্যে। সামাজিক সমতা বিধানের ক্ষেত্রে চরখার গুরুত্ব এইখানে।

চতুর্থতঃ, ইংরাজ রাজত্বের সর্বাপেক্ষা মারাত্মক কুফল বলা যায়, পাশ্চাত্যের বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের অবাধ প্রচলনের ফলে স্বদেশী পল্লীশিল্প তথা পল্লী অর্থনীতির বিলোপ সাধন। পল্লীপ্রাণ ভারতের আত্মা যেন ধীরে ধীরে শীর্ণ বিশীর্ণ হল পল্লীশিল্পগুলির এইরূপ নৃশংস ধ্বংসের ফলে। গান্ধীজী তাঁর চরখা ও গ্রামোদ্যোগ আন্দোলনের দ্বারাই

মৃতপ্রায় পল্লী অর্থনীতি তথা গ্রামীণ সভ্যতাকে পুনর্জীবিত করার দুর্জয় সংকল্পে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করার ব্রত গ্রহণ করলেন। চরখা গ্রামীণ সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র। তার মূর্ত প্রতীক। তার প্রাণ-বায়ু। গ্রামীণ অর্থনীতির এই ব্যাপকতার অর্থেই গান্ধীজী 'খাদি অর্থনীতি' নামেও একে অভিহিত করতেন।

সর্বশেষে বলা যায়, গান্ধীজী যে শোষণহীন অহিংস শান্তিপূর্ণ সমাজ রচনার কল্পনা করেছিলেন তা একদিকে সমাজে শোষণ ও শাসনের মুলোৎপাটন যেমন করবে, তেমনই অপরদিকে পৃথিবীতে জাতিতে জাতিতে শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করবে, বিশ্বশান্তির পথ সুগম করবে—এক অখণ্ড মানবজাতির বন্দনাগান গাইবে। আধুনিক প্রচলিত সভ্যতা হতে এই আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ ও সভ্যতা ভিন্ন হবে। তাই এক নূতন সভ্যতা ও সংস্কৃতির আবাহন করবে গান্ধীজীর চরখা।

সুতরাং ভারতের মাটি হতে বিদেশী শাসনের অঙ্কুর নির্মূল করে একটি নূতন সমাজব্যবস্থার ভিত্তি রচনা করাই ছিল গান্ধীজীর খাদি আন্দোলনের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব। এই সমাজ হবে অহিংস সমাজ, শোষণহীন এবং সামাজিক সমতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ।

চরখার প্রধান প্রধান তত্ত্ব ও যুক্তিগুলি উপরে আলোচিত হল। কিন্তু গান্ধীজী বিভিন্ন সময়ে ইয়ং ইণ্ডিয়া, হরিজন প্রভৃতি পত্রিকায় সুতা কাটার পক্ষে যে যুক্তিগুলি দিয়েছেন সেগুলির একটি সংযোজন আশা করি পাঠকসাধারণের নিকট সুবিধাজনক হবে ঃ

(১) যাদের অবসর আছে এবং যারা অভাবগ্রস্ত এই দুই শ্রেণীর লোককেই চরখা হাতে হাতে কাজ দেয়।

(২) হাজার হাজার ব্যক্তির নিকট এ সুপরিচিত।

(৩) এ সহজেই শিক্ষা করা যায়।

(৪) বাস্তবিকপক্ষে, এতে তেমন কোন মূলধনের প্রয়োজন হয় না।

(৫) চরখা অতি সহজে ও সস্তায় তৈরি করা যায়।

(৬) জনসাধারণের এর প্রতি অনুকূল মনোভাব আছে।

(৭) দুর্ভিক্ষ ও বিপর্যয়ের সময় এর দ্বারা আশু সাহায্য মিলে।

(৮) বিদেশী বস্ত্র কিনতে যে পরিমাণ অর্থ বিদেশে চলে যেত, কেবলমাত্র চরখাই তা বন্ধ করে (বিশেষতঃ প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে)।

(৯) এইভাবে যে বিপুল অর্থ রক্ষিত হয় তা গরীব জনসাধারণের মধ্যে বণ্টিত হয়।

(১০) খুব সামান্য পরিমাণ সাফল্যেরও অর্থ হবে জনগণের মধ্যে সেই পরিমাণ আশু লাভ।

(১১) জনসাধারণের মধ্যে সহযোগিতা অর্জনের কাজে চরখা একটি বিশেষ শক্তিশালী মাধ্যম।

(১২) পুরুষ কিংবা স্ত্রী যিনি দৈনিক আধঘণ্টা সুতা কাটেন, তিনি সর্বোত্তম উপায়ে জনসেবা করেন; মুষ্টিমেয় শ্রেণীবিশেষের সঙ্গে অসংখ্য গরীব জনতার এ এক অচ্ছেদ্য বন্ধন।

(১৩) চরখা শরীরশ্রমের এক পবিত্র প্রতীক।

(১৪) আধ্যাত্মিক মুক্তির পথে আমার নিকট চরখা প্রবেশদ্বার স্বরূপ।...যাঁরা ব্রহ্মচর্য পালনের চেষ্টা করেন, তাঁদের নিকটেও আমি চরখা উপস্থিত করি। যাঁরা এই কর্মময় জগতে বাস করে দেশসেবার জন্য আগ্রহী, আবার ব্রহ্মচর্য পালন করতেও তেমনই যত্নশীল, আমার ন্যায় সেইরূপ অগণিত দেশবাসীর জন্য আমি এই ব্যবস্থাপত্র রেখেছি।[১]

চরখার বিপ্লবীরূপ

অনেকে মনে করেন যে, দরিদ্র, অর্ধনগ্ন পল্লীবাসীর জন্যই বুঝি গান্ধীজী তাঁর চরখার কাজ আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু কোন দেশে সমাজ পরিবর্তনের মহান্ যজ্ঞে সকলের পবিত্র পরশ প্রয়োজন। সেখানে শিক্ষিত সমাজকে অপাংক্তেয় করে রাখা যায় না। তাই তাঁদের নিকট গান্ধীজীর আবেদন—

"আপনাদের সামনে আমি চরখার আর্থিক দিকের কথা বলছি না। আমি কেবল এইটুকু চাই, আপনারা এর আধ্যাত্মিক দিক

১, Ideology of Charkha

হৃদয়ঙ্গম করুন। সুতা কেটে ও খদ্দর পরিধান করেই গরীবদের প্রতি আপনাদের সহানুভূতি প্রকাশ করবেন। কিন্তু দরিদ্রের কাছে অর্থই ভগবান। এই সকল ক্ষুধার্ত জনতার নিকট অন্য কোন আবেদন স্থায়ী হয় না।”

তাই এই ক্ষুধার্ত, কর্মহীন, অর্ধনগ্ন জনতার হাতে আর্থিক আত্মনির্ভরতার এমন এক পথের সন্ধান দিল চরখা, যা তাকে শ্রমের সুযোগ দিয়ে মানুষ হিসাবে বাঁচার সম্মান দিল। শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে দেশের এই সামাহীন দারিদ্র্যের প্রত্যক্ষ পরিচয় স্থাপিত হল। এইভাবে যে সম্মিলিত শক্তির সূচনা হল, তা দুর্জয়, অপ্রতিরোধ্য। চরখা তাই সমাজের সকলের সঙ্গে সকলের প্রেমের রাখী বাঁধার কাজে নীরব বাহন। চরখার বিপ্লবী রূপের এই হচ্ছে কল্পনা। এইজন্যই গান্ধীজী বলেছেন—

“ভারতের পল্লীজীবনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে চরখা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন যার ফলে জনসাধারণের ভিতর এমন এক শক্তির উদ্বোধন হবে যা আপনাআপনিই স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করবে।”[১]

খাদি কেবলমাত্র জীবিকার একটি পেশা নয়। শোষিত গ্রাম-সমাজকে পুনর্গঠিত করে জনগণের মধ্যে নূতন জীবনের বাণী বহন করে আনাই হবে চরখার উদ্দেশ্য। গান্ধীজী তাই শেষের দিকে চরখাকে গ্রামবাসীদের জীবনের সঙ্গে সর্বতোভাবে যুক্ত করার কথা বললেন তাঁর বিখ্যত ‘নবসংস্করণের’ প্রস্তাবে। খাদির আর্থিক মূল্য সরকারও আজ স্বীকার করছেন। দুর্গত জনসমষ্টির সাহায্যের জন্য রাস্তাঘাট তৈরির ন্যায় সাধারণ সাহায্যের (রিলিফ) দৃষ্টিতে চরখার প্রয়োজনীয়তা বহুপূর্ব থেকেই স্বীকৃত। কিন্তু সর্বোপরি আমাদের এ কথা প্রমাণ করতে হবে যে, এক সুদৃঢ় অহিংস গ্রামীণ অর্থনৈতিক ভিত্তি নির্মাণের উদ্দেশ্যে চরখার আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। জাতীয় অর্থনীতিকে বিকেন্দ্রিত গ্রামীণ অর্থনীতির পথে মোড় ঘুরাবার কাজ নিষ্পন্ন করতে হবে। গ্রামকে নির্বিচারে শহরের

১. Swaraj through Charkha

শোষণের সামগ্রী হতে না দিয়ে স্বাবলম্বী, স্বতন্ত্র, আত্মনির্ভরশীল গ্রামসমাজ গঠনের পথে আমাদের শক্তি নিয়োজিত করতে হবে। গ্রাম শহরের সেবাদাসীরূপে না থেকে গ্রাম ও শহরের মধ্যে সমানতার সম্বন্ধ আনতে হবে। গান্ধীজীর কল্পনায় এই ছিল খাদি আন্দোলনের বৃহত্তর উদ্দেশ্য। সে কাজ এখনও নিষ্পন্ন হতে বাকী আছে। পথ এখনও বহুদূব। তাই স্বাধীনতার পর চরখার এই পূর্ণাঙ্গ বৈপ্লবিক রূপের প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত বিরাম নাই। সর্বাঙ্গীণ গ্রামসংগঠনের দৃষ্টিতে খাদি গ্রামোদ্যোগ কমিশনের 'নয়া মোড়' কার্যক্রম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

পল্লীজীবনে চরখা

গ্রামের মানুষদের কাছে চরখার মূল্য অতীব প্রয়োজনীয়। একশ',-দেড়শ' বছর পূর্বেও গ্রামের অসংখ্য অসহায় পুরুষ ও বিশেষ করে নারীদের কাছে চরখা ছিল সম্মানজনক জীবিকা নির্বাহের একটি প্রধান উপায়। এ যেন এক প্রকারের সামাজিক নিরাপত্তার (social security) স্বীকৃত পথ। দৈব দুর্বিপাকে কিংবা সাংসারিক বিপর্যয়ের ফলে হঠাৎ যদি কোন মানুষ একেবারে অসহায় অবস্থায় পতিত হয় তবে তাঁর নিম্নতম গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করার কোন রকম দায়িত্ব কি সমাজের নাই? এক সময়ে রাজা, জমিদারেরা এই সব দুঃস্থ অনাথাদের জন্য দানপত্র প্রভৃতির ব্যবস্থা করতেন। আধুনিক কালে রাষ্ট্রীয় কর্মশালা, অনাথ আশ্রম প্রভৃতির আমদানী হয়েছে। কিন্তু এছাড়া, সমাজের পক্ষ হতে যদি এমন কোন সৎ জীবিকার সন্ধান করে দেওয়া যায় তবে মনে হয় তা হবে সর্বোত্তম ব্যবস্থা। এর ফলে অসহায়ের মনে যেমন আসবে আত্ম-বিশ্বাস, তেমনি কর্মের মাধ্যমে জীবন নির্বাহের ব্যবস্থা হওয়ার জন্য তার আত্মমর্যাদাবোধও ফিরে আসবে। চরখা, ঢেঁকি প্রভৃতি গৃহশিল্প এই সব লাখ লাখ দুঃস্থ অসহায়দের জীবনে আশার বাণী সঞ্চারিত করেছে।

এই প্রসঙ্গে একটি পুরাতন কাহিনীর উল্লেখ করা হচ্ছে যা থেকে

দেখা যাবে যে, চরখা কেমনভাবে ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে যেতে বসেছে। আর সে সময়েও চরখা গ্রামীণ নারীদের কাছে কত মুল্যবান সম্পদ্ বলে মনে করা হত। ১৮২৮ সালের কথা। শান্তিপুরের একজন মহিলা কাটুনী তার দুর্দশার কথা জানিয়ে তৎকালীন বাংলা মুখপত্র 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশের জন্য একখানি পত্র পাঠিয়েছিল। দীর্ঘকাল পরে পত্রখানি পুনরুদ্ধার করে খাদি প্রতিষ্ঠানের শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁর 'রাষ্ট্রবাণী' পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত করেন এবং গান্ধীজীর নিকটেও এর একটি ইংরেজী প্রতিলিপি পাঠান। খুব বেদনাদায়ক কাহিনী। সেজন্য একটু দীর্ঘ হলেও পত্রটি পুরাপুরিই এখানে উদ্ধৃত করার ইচ্ছা সংযত করতে পারছি না (অবশ্য ইংরেজী হতে অনূদিত)।

একজন কাটুনীর নিবেদন

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

আমি একজন কাটুনী। অশেষ কষ্টভোগের পরে আমি এই চিঠি লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছি। দয়া করে আপনার পত্রিকায় এটি প্রকাশ করবেন। আমি শুনেছি যে, এই চিঠি আপনার পত্রিকায় ছাপা হলে এমন অনেকের কাছে পৌছাবে যাঁরা আমার দুঃখের অবসান করতে পাবেন। একজন গরীব দুঃস্থজনের লেখা চিঠি বলে একে অবহেলা করবেন না।

আমি খুবই অভাগিনী। আমার এই কাহিনী যদিও খুব বড তথাপি সংক্ষেপে আমি তা বিবৃত করব।

আমার বয়স যখন ৫½ গণ্ডা (২২), আমি তখন তিনটি মেয়ে নিয়ে বিধবা হই। আমার স্বামী মৃত্যুর সময়ে কিছুই রেখে যেতে পারেননি যা হতে আমার শ্বশুর, শাশুড়ী ও তিন মেয়ের খরচের ব্যবস্থা হয়। স্বামীর শ্রাদ্ধে আমার অলঙ্কার বিক্রী করে দিই। অবশেষে যখন অর্থাভাবে অনাহারের দ্বারদেশে এসে পৌছলাম তখন ভগবান যেন আমাকে পথ দেখালেন। আমি তকলি ও চরকাতে সূতা কাটা আরম্ভ করলাম।

সকালে ঘরের সাফাই কাজ শেষ করে আমি দুপুর পর্যন্ত সূতা কাটতাম। পরে রান্না করে পিতামাতা ও মেয়েদের খাওয়াবার পরে নিজে খেয়ে নিয়ে

তকলিতে সরু সূতা কাটতাম। এই ভাবে আমি প্রায় এক তোলা সূতা কাটতাম। তাঁতিরা আমাদের বাড়ী হতে চরখার সূতা টাকায় তিন তোলা হিসাবে কিনে নিত। তাছাড়া, তাঁতিদের কাছ হতে প্রয়োজনমত অর্থ ঋণ চাইলেই তা পাওয়া যেত। এজন্য অন্ন বস্ত্রের চিন্তা আমাদের করতে হত না।

কয় বছরের মধ্যেই আমি ৭ গণ্ডা (২৮৲) টাকা পেলাম। এই দিয়ে আমি এক মেয়ের বিবাহ দিলাম। আর এই ভাবে তিনটি মেয়ের বিবাহ হল। সামাজিক প্রথামত আমি ঘটক ও অন্যান্যদের সকল প্রাপ্য টাকা দিয়েছিলাম বলে আমার মেয়েদের কোনরকম অপমান সহ্য করতে হয়নি। আমার শ্বশুর যখন মারা গেলেন তখন শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে ৪৪৲ টাকা খরচ করেছিলাম। তাঁতিরা এই টাকা আমাকে ঋণ দিয়েছিল, আর তা আমি দেড় বছরের মধ্যেই শোধ করেছিলাম। এ সকলই হয়েছিল চরখার কল্যাণেই।

কিন্তু এখন তিন বছর যাবৎ আমি ও আমার শাশুড়ীমাতা খাদ্যাভাবে আছি। তাঁতিরা এখন বাড়ীতে সূতা কিনতে আসে না। কেবলমাত্র এই নয়। বাজারে সূতা পাঠালে পূর্বের মুল্যের সিকি ভাগ দামেও তা বিক্রী হয় না। আমি জানি না কেমন করে এমন হল। অনেকের কাছেই আমি এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছি। তাঁরা বলেন যে, বিলাতী সূতা প্রচুর পরিমাণে আমদানী করা হচ্ছে। তাঁতিরা সেই সূতা ক্রয় করে কাপড় বুনে। আমার এক অহংকারের ভাব ছিল যে, আমার সূতার সমকক্ষ বিলাতী সূতা হতে পারবে না। কিন্তু যখন আমি বিলাতী সূতা পেলাম তখন দেখলাম যে, তা আমার সূতা অপেক্ষা ভাল। আমি শুনেছি যে, এর মূল্য সের প্রতি তিন অথবা চার টাকা। আমি আমার কপাল চাপড়িয়ে বললাম, 'হে ভগবান, আমার চেয়ে গরীব দুঃখী ভগ্নীরা আছে। আমি ভেবেছিলাম যে, বিলাতের সকল মানুষ বুঝি বড়লোক। কিন্তু এখন দেখছি যে, সেখানে আমার চেয়ে দরিদ্র মেয়েও আছে।' আমি ভালভাবেই বুঝতে পারলাম যে, দারিদ্র্য বশতঃই ঐ সকল গরীব মেয়ে সূতা কাটে। তারা তাদের শ্রমজাত দ্রব্য সেখানে বিক্রী করতে সমর্থ হয় না বলেই এতদূরে এখানে পাঠিয়েছে। যদি তাদের সূতা এখানে ভাল দরে বিক্রী হত তবে তার কিছু অর্থ ছিল। কিন্তু এতে কেবলমাত্র আমাদের সর্বনাশ হয়েছে। মানুষেরা এই সূতা হতে উৎপন্ন কাপড় দুই মাসের জন্যও ব্যবহার করতে পারে না। কেন না, তা পচে

যায়। সেইজন্য আমি সেখানকার কাটুনীদের এই অনুরোধ জানাই যে, তাঁরা যদি আমার এই নিবেদন বিবেচনা করেন তবে তাঁরা বিচার করে দেখবেন যে, এখানে স্থতা পাঠান ভাল কি খারাপ!

একজন লাঞ্ছনাভোগকারী কাটুনীর

শান্তিপুর নিবেদন[১]

এই করুণ আবেদনটি হতেই প্রতীয়মান হবে যে, এরূপ কত অসংখ্য অসহায় নিঃসম্বল অনাথিনীর জীবনে চরখা দিয়েছে সহায়, সম্বল, আশা, ভরসা। কিন্তু আরও দুঃখের কথা এই যে, উপরিউক্ত দুঃখিনী ভগ্নী জানতেন না যে, আমাদের এই স্বদেশী শিল্পপ্রথাকে পরিকল্পিত ভাবে হত্যা করবার উদ্দেশ্যেই বিদেশী কলে প্রস্তুত সস্তা সুতা এখানে আমদানী করা হত। কোন কাটুনীর হাতে কাটা সুতা এ নয়।

এ তো বিগত দিনের কাহিনী। আধুনিক কালের পরিকল্পিত উন্নয়নের যুগের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। গান্ধীজীর চরখাকে বাদ দিলে দেশের পল্লী অঞ্চলের অর্থনীতিতে তার ফলাফল কী হবে? যে দেশের অর্থনীতিতে আজ পর্যন্ত বেকারি রূপ চিরস্থায়ী সমস্যা বিদ্যমান, সে দেশে বিকল্প কোন কাজের ব্যবস্থা না করে প্রচলিত একটি শিল্পকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যেতে দেওয়া কি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেয়? হোক না তার উৎপাদনক্ষমতা কম, তা থেকে আয়ের সম্ভাবনা স্বল্প? কিন্তু সর্বাঙ্গীণ আর্থিক অনটনের পরিপ্রেক্ষিতে যেখানে অন্য কোন কর্মের সংস্থানই করা সম্ভব হচ্ছে না, সেখানে গ্রামবাসীদের কর্মহীন দিনগুলিতে চরখার সাহায্যে সামান্য কিছুও আয় করা আর্থিক দৃষ্টিতে লাভজনক নয় কি? আর এই বিপুল সংখ্যক কর্মক্ষম জনসংখ্যা যেখানে কাজের অভাবে, খাদ্যের অভাবে দিনাতিপাত করতে বাধ্য হচ্ছে, তার ফলে জাতির সামগ্রিক উপার্জন, জাতীয় আয় বাড়ছে না কমছে? অর্থনীতির এই অতি সাধারণ সূত্রকে অবহেলা

১ Khadi—Why and How, p. 42

করা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে? এই প্রসঙ্গে এক অতি মূল্যবান আলোচনা করেছেন প্রখ্যাত আমেরিকান চিন্তাশীল অর্থশাস্ত্রী রিচার্ড গ্রেগ্ ভারতের আর্থিক ব্যবস্থার উপরে লিখিত 'এ ফিলসফি অফ্ ইণ্ডিয়ান্ ইকনমিক ডেভেলাপমেণ্ট' নামক তাঁর একটি সাম্প্রতিক পুস্তকে। লেখক পাশ্চাত্যের আধুনিক আর্থিক প্রগতির সঙ্গে ভারতীয় আর্থিক উন্নয়নের তুলনামূলক ও তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন। ভারতীয় আর্থিক উন্নয়নের ব্যাপারে আগ্রহশীল প্রত্যেকেরই পক্ষে বইখানি অবশ্যপাঠ্য বলা যায়।

১৯৫১ সালের লোকগণনার হিসাবে দেখা যায় যে, প্রায় ১১০,০০০,০০০ লোক প্রত্যক্ষভাবে সর্বসময়ের জন্য কৃষিকাজে নিযুক্ত ছিল। ভারতে অদ্যাবধি কৃষিক্ষেত্রে সারা বছরের জন্য উপযুক্ত কাজের ব্যবস্থা থাকে না বলে বছরে গড়ে তিনমাস কাল এই পরিমাণ অধিবাসী বেকার থাকে। এর অর্থ, ঐ সময়ে সারা ভারতে কর্মরত মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭৮% অংশ বছরে তিনমাস কর্মহীনভাবে দিন কাটায়। এই সংখ্যা ১৯৫০ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ। গ্রেগ্ সাহেব গ্রেট বৃটেনের চরম বেকারির সময়ের সঙ্গে ভারতের এই চিরস্থায়ী ব্যবস্থার তুলনা করেছেন। ১৯৩০ সালের পূর্বের সময়ে সেখানে সর্বাপেক্ষা চরম বেকারির যুগ গেছে ১৯২১ সালের জুন মাসে—তৎকালীন ভয়াবহ আর্থিক মন্দা এবং কয়লা শিল্পের ধর্মঘটের জন্য। তখন এতে সমগ্র গ্রেট বৃটেনের জনসংখ্যার মাত্র $\frac{1}{20}$ অংশ অধিবাসী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তাইতেই ইংলণ্ডের রাজনৈতিক মহলে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। গ্রেগ্ সেজন্য ক্ষোভের সঙ্গে এই মন্তব্য করেছেন, "এক-বিশাংশ জনসংখ্যার স্থলে যদি এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসী সেখানে স্বল্পকালীন কর্মহীন থাকত তবে তাঁরা কি করতেন? আর ভারতে বছরের পর বছর অবিরামভাবে এই জিনিস চলে!"[১]

পাশ্চাত্যের প্রগতিশীল দেশসমূহে শিল্পসংস্থাগুলির যন্ত্রপাতিসমূহ

১. A Philosophy of Indian Economic Development, p. 20

যখন কোন কারণে অলস থাকে (অর্থাৎ, নিষ্ক্রিয় থাকে), তজ্জনিত মারাত্মক ব্যয় নির্বাহের জন্য তারা চিন্তিত হয়ে ওঠে। তদ্রূপ, ভারতবর্ষে গ্রামীণ কর্মহীনতা জনিত ব্যয় জাতিকে কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত করে তা কি আজও ভেবে দেখার সময় হয়নি ?

গ্রামীণ কর্মহীনতার আর্থিক চিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, ১৯৫০-৫১ সালে কৃষিশ্রমিকদের সর্বভারতীয় দৈনিক গড় আয় ছিল ১৭.৫ আনা পুরুষদের জন্য, আর নারীদের জন্য ১০.৩ আনা। অর্থাৎ, উভয়ের গড় আয় দাঁড়াবে ১৩.৯ আনা। অথচ, ১৯৫৭ সালে অম্বর চরখায় কাটুনীরা আয় করেছে দৈনিক গড়ে ১২ আনা বা তার বেশী। আর পুরাতন বাক্স চরখায় তদনুপাতে ঐ সময়ে গড় দৈনিক আয় ছিল তিন আনা। উপরিউক্ত ১১ কোটি লোক যে তিনমাস কাল বেকার থাকে, ঐ সময়ে বাক্স চরখায় এবং অম্বর চরখায় সূতা কাটলে আয় হবে দৈনিক গড়ে তিন আনা এবং বারো আনা হিসাবে যথাক্রমে ১৮৫.৬২ কোটি এবং ৭৪২.৫০ কোটি টাকা। ভারতীয় কৃষিনির্ভর জনসংখ্যার বেকারিজনিত ব্যয়ের পরিমাণ হচ্ছে এই পরিমাণ অর্থ। অর্থাৎ, ১৯৫৬ সালের ভারতের মোট জনসংখ্যার (৩৯ কোটি) মধ্যে এই অর্থ বিভক্ত করলে দেখা যাবে যে, মাথাপিছু ব্যয় হবে যথাক্রমে ৪.৭৬ এবং ১৯.০০ টাকা। এই হচ্ছে আমাদের গ্রামীণ জনতার বেকারি ব্যয়।[১]

আর যদি এরা দৈনিক গড়ে ১৩.৯ আনা হিসাবে মজুরি লাভ করত তবে মোট উপার্জিত অর্থ (৮৬০ কোটি টাকা) কেন্দ্রীয় সরকারের ১৯৫৬-৫৭ সালের মোট রাজস্ব বাবদ আয় (৫৬১.৮৪ কোটি টাকা) অপেক্ষা দেড়গুণের চেয়ে বেশী হত। ১৯৫৫-৫৬ সালে মোট তুলাজাত বস্ত্র রপ্তানীর আয় (৬৩.৫০ কোটি টাকা) অপেক্ষা তেরগুণের চেয়ে বেশী। কিংবা ১৯৫৫-৫৬ সালে ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য, যোগাযোগ ও পরিবহণ দপ্তরের মোট আয়ের (১৮০০ কোটি টাকা) ৪৭% ভাগের সমান।

১. A Philosophy of Indian Economic Development, p. 21

অথবা, মনে করা যাক যে, কৃষিক্ষেত্রে আয়ের বদলে এই কর্মহীন জনগণ যদি ঐ সময়ে সাধারণ বাক্স চরখায় দৈনিক আট ঘণ্টা হিসাবে সুতা কাটত, তবে সেই আয়ের পরিমাণ ১৯৫৬-৫৭ সালে মোট পাটজাত দ্রব্য রপ্তানীর আয় অপেক্ষা অনেক বেশী এবং ঐ সালে তুলাজাত বস্ত্র রপ্তানী অপেক্ষা ২'৯ গুণ অধিক হত।

গ্রেগ্ সাহেব আর এক দৃষ্টিতে হিসাব করে দেখাচ্ছেন যে, ভারতে সমস্ত বস্ত্রকল সমূহে ১৯৫৬ সালে গড়ে ৮০৬৭৯১ জন শ্রমিক দিনে তিন কিস্তিতে কাজ করত। এদের সকলের মিলিত আয়ের পরিমাণ ছিল ১৯৫৪ সালে ১০১, ৯৩, ৯৭০০০ টাকা। অথচ, কৃষিকর্মে নিযুক্ত যে ১১ কোটি লোক গড়ে তিনমাস বেকার অবস্থায় থাকে, তাদের অর্ধেকও যদি দৈনিক ১৩'৯ আনা হিসাবে আয় করত তবে মোট আয়ের পরিমাণ হত ৪,৩০,০৩,১২,৫০০ টাকা। এই আয় বস্ত্রকল শ্রমিকদের সর্বমোট আয় অপেক্ষা চারগুণেরও অধিক। সুতরাং দেখা যায় যে, বেকার কৃষিশ্রমিকদের মধ্যে অর্ধেক সংখ্যক শ্রমিককেও যদি কর্মহীন তিনমাসকাল কাজ দেওয়া যায় তবে জাতীয় ধনভাণ্ডারে এর ফলে যে আয় হবে তা বস্ত্রকল শ্রমিকদের সর্বমোট আয় অপেক্ষা চারগুণেরও বেশী। সেজন্য এই সম্ভাব্য বিপুল পরিমাণ সম্পদ্ নষ্ট হতে দেওয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ যখন গান্ধীজীর অনুসৃত পন্থায় তা রোধ করা যায়?[১] কর্মক্ষম মানুষকে বেকার বসিয়ে রাখা আর্থিক দৃষ্টিতে লাভবান, না, তাদের আপন পরিবেশের মধ্যেই স্বল্প আয়ের উপায় করে দেওয়া অর্থনীতিবিরুদ্ধ কাজ? আমরা যেন এক ভ্রান্ত গোলকধাঁধার পাকে আবর্তিত হয়ে মরছি।

খাদি অর্থনীতি

গান্ধীজী যে বিকেন্দ্রিত গ্রামীণ আর্থিক ব্যবস্থার সমর্থক ছিলেন, তা বর্তমান কালের প্রচলিত আর্থিক চিন্তাধারা হতে বহুলাংশে পৃথক্। সস্তা দামে ক্রয় করে চড়ামূল্যে বিক্রয় করা, অধিকতম

১. A Philosophy of Indian Economic Development, p. 24.

অধিকতম মুনাফার দৃষ্টিতে উৎপাদন প্রথা নিয়ন্ত্রিত করা, পারস্পরিক সহযোগিতার বদলে গলা-কাটা প্রতিযোগিতা, জাতিতে জাতিতে সহযোগিতার ভিত্তিতে ব্যবসাগত লেনদেন প্রচলনের স্থলে একের বাজার বলপূর্বক দখল করা প্রভৃতি যে সব বহুলপ্রচলিত নীতির দ্বারা আধুনিক কালের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত হয়, গান্ধীজী তার কোনটিরই পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি যে শোষণহীন সহজ সরল সমাজব্যবস্থার কল্পনা করেছেন তার মৌল আর্থিক সূত্রগুলি উপরিউক্ত সূত্র হতে ভিন্ন। সেইজন্য গান্ধীজী বলতেন, "রাজনীতিতে অহিংসা যেমন এক নূতন পদ্ধতি, তেমনই অর্থনীতিতে খাদিশাস্ত্রও এক নূতন উদ্ভাবন।"[১]

গান্ধীদর্শনের ভিত্তিভূমি সত্য ও অহিংসা। সেই অহিংসা নীতির প্রয়োগ তিনি আর্থিক ক্ষেত্রেও করেছিলেন। এই অহিংসা-মূলক খাদি-গ্রামোদ্যোগ-প্রধান যে আর্থিক ব্যবস্থা, তাকেই তিনি 'খাদি অর্থনীতি' রূপে অভিহিত করেছেন।

খাদি অর্থনীতির ভিত্তি হচ্ছে মানবিক চিন্তা। সমাজের দীনতম মানুষটির কল্যাণ চিন্তা করাই এই অর্থনীতির কাম্য। প্রতিযোগিতা এবং মূল্যভাবনার (Price) স্থান সেজন্য এতে নাই। কেন না, মানুষ মেরে লাভ করার ক্রুর উদ্দেশ্যে খাদি অর্থনীতি প্রবর্তিত হয় নাই। খদ্দরের মৌলিক কল্পনার মধ্যেই রয়েছে মানুষে মানুষে সহযোগিতা, প্রেম ও ভ্রাতৃত্ববোধ। প্রতিযোগিতাই উত্থানের সিঁড়ি—এই মামুলি শ্লোকবাক্যে গান্ধীজী মোটেই বিশ্বাসী ছিলেন না। সস্তার নেশা আজ সমাজে ভীষণভাবে শিকড় গেড়ে বসেছে। অপরদিকে, গান্ধীজী মনে করতেন, "হোটেল এবং গৃহস্থের রন্ধনশালার মধ্যে কোন প্রতিযোগিতা নাই। বাড়ীর গৃহিণীর মস্তিষ্কে কখনও এমন চিন্তা আসে না তাঁর শ্রমের মজুরি কত হল, কতটুকু সময় লেগেছে কাজে ইত্যাদি। সে কেবল জানে যে, সন্তান পালন করার ন্যায় গৃহস্থালী ও রন্ধনশালা সুচারুরূপে পরিচালনা করাও কর্তব্য কর্ম।"[২]

১. Young India, 4. 6. '31.
২. Young India, 16. 7. '31.

এখন দেখা যাক, খাদি অর্থনীতির মূল নীতিগুলি কি ?

(১) "উৎপাদন ও বণ্টনের বিকেন্দ্রীকরণই খাদি বিজ্ঞানের মূল কথা। খদ্দর যেখানে উৎপন্ন হবে, এর ব্যবহারও তার নিকটতম স্থানেই হওয়া উচিত।"[১] বর্তমান কালে প্রায়ই এমন দেখা যায় যে, কোন জিনিস যেখানে উৎপন্ন হয় সেখানে ব্যবহৃত না হয়ে বহুদূরে বা বিশ্বের যে কোন স্থানে বিক্রয়ের জন্য পাঠানো হয়। কিন্তু খদ্দরের ক্ষেত্রে এই নীতি প্রযুক্ত নয়। গান্ধীজীর মতে খাদি শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, খদ্দর স্থানীয় ভাবে যেমন উৎপন্ন হবে গ্রামে গ্রামে, তদ্রূপ গ্রামে গ্রামেই তা বিক্রয় হবে। এই হচ্ছে গ্রাম স্বাবলম্বনের নীতি। এর ফলে ব্যবসায়ীদের কুচক্রে পড়তে হয় না জনসাধারণকে। বিক্রয়ের জন্য আধুনিক কালে যে জটিল বিশ্ব-বাণিজ্যের আবর্ত সৃষ্টি হয়, খদ্দরের ক্ষেত্রে এই জটিলতার কোন প্রয়োজন নাই। কেন না, নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যসমূহের উৎপাদন ও বণ্টনপ্রথা যত স্থানীয় ভিত্তিতে হবে, সমাজের আর্থিক ব্যবস্থা তত জটিলতামুক্ত থাকবে। বড় বড় মহাজন, দালাল, ব্যবসায়ীদের অবৈধ আধিপত্য তত সংকুচিত হবে। শ্রমিক সমস্যা, অধিক উৎপাদন, বিক্রয় সমস্যা প্রভৃতি এই যুগের বিবিধ আর্থিক ক্রুটিগুলি আমাদের সমাজজীবনকে প্রভাবিত করতে সমর্থ হবে না।

(২) "খাদ্য ও বস্ত্রে প্রতিটি গ্রামকে স্বাবলম্বী করাই হচ্ছে খদ্দরের মূল তত্ত্ব।"[২]

মানুষের মৌলিক প্রয়োজনের মধ্যে খাদ্য ও বস্ত্রই প্রধান। গান্ধীজী যে গ্রামস্বরাজের কল্পনা করেছিলেন তাতে বিশেষতঃ এই দুইটি দ্রব্যের উৎপাদনের ব্যাপারে প্রতিটি গ্রাম আপন প্রয়োজনের পূর্তির জন্য যথেষ্ট পরিমাণ উৎপাদন করবে। (বস্ত্র স্বাবলম্বন বলতে মাত্র সুতা কাটা ও কাপড় বুনা বুঝায় না। তুলা চাষও এর অন্তর্ভুক্ত। আর এই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে বস্ত্র স্বাবলম্বনের তত্ত্ব।) প্রতিটি গ্রাম যদি এইভাবে খাদ্য ও বস্ত্রের ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীল হয়

১. Harijan, 2, 11. '35
২. Young India. 17. 7. '24

তবে বর্তমানে গ্রামের উপর শহরের শোষণের মাত্রা কমবে। গ্রামশক্তি সংগঠিত হবে। গ্রামবাসীদের আর্থিক স্বাতন্ত্র্য আসবে। আর এসবের ফলে মুমূর্ষু গ্রামগুলির আর্থিক জীবন সম্পৎশালী ও শ্রীসম্পন্ন হবে।

(৩) খাদি অর্থনীতির তৃতীয় মূলসূত্র স্বরূপ গান্ধীজী বলেছেন, "চরখা দেশের একজন কর্মক্ষম পুরুষ কিংবা স্ত্রীকে কর্মচ্যুত করে না। দেশের লক্ষ লক্ষ কর্মহীন লোকের প্রতিটি অলস মুহূর্তকে উৎপাদন-মূলক কাজে লাগানো চরখার মর্মকথা।" [১]

ভারতের ন্যায় জনবহুল দেশে সকল সক্ষম লোকের জন্য উপযুক্ত কর্মের ব্যবস্থা করাই একটি বৃহত্তম জাতীয় সমস্যা। অর্থের অভাব অপেক্ষা তাদের কাছে কাজের অভাবই অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। দরিদ্রের কুটিরে যে উপায়ে অবসর মুহূর্তে কাজ দেওয়া যায় তা হচ্ছে চরখা। যে-কোন জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় ব্যাপক কর্মের এই সম্ভাবনাকে লঘু করা যায় না।

স্বাবলম্বনের পরিধি যত অধিক বিস্তৃত করা যায় তত শোষণ-মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। গ্রাম স্বাবলম্বন, বিকেন্দ্রিত উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থা চালু করাই খাদি অর্থনীতির অন্তর্নিহিত তত্ত্ব। খদ্দর উৎপাদনের জন্য অধিক পরিমাণে বাইরে থেকে আমদানী করা তুলার উপর নির্ভরশীল হওয়া স্বাবলম্বনের নীতিবিরুদ্ধ। গ্রামবাসীরা আপন প্রয়োজনের অনুপাতে নিজ গ্রামেই উৎপন্ন তুলা হতে সূতা কেটে কাপড় বুনে প্রয়োজন মিটাবে—এই হবে স্বাবলম্বন-খাদির উদ্দেশ্য। কিন্তু খাদি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বহু কেন্দ্রে দেখা গেছে যে, উৎপাদিত বস্ত্রের খুব কম অংশই স্থানীয় অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়েছে। অধিকাংশই শহরের বিক্রয়ভাণ্ডারে প্রেরিত হয়েছে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে। ব্যবসায়ী-খাদির এই দৃষ্টি খাদির প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে না। এমনকি, কাপড় ধোলাই, রং করা ইত্যাদি আনুষঙ্গিক কাজও গ্রামবাসীরা গ্রামেই করবে। এইভাবে উৎপন্ন

১. Young India. 23. 1. '30

খাদি হবে প্রকৃত সস্তা বস্ত্র। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, শহরবাসীরা সেক্ষেত্রে খাদিবস্ত্র কোথায় পাবে? এর উত্তর, শহরবাসীদেরও সম্ভবমত কিছু সময় সুতা কাটা উচিত। দ্বিতীয়তঃ, গ্রামবাসীদের উদ্বৃত্ত কাপড় শহরে বিক্রয়ের জন্য পাঠানো যেতে পারে। কিন্তু কাটুনী কিংবা তাঁতি নিজেরা খাদি উৎপন্ন করে অধিকাংশই যদি শহরে পাঠিয়ে দেয় তবে বুঝতে হবে সেখানে খাদি অর্থনীতির সুষ্ঠু বিকাশ হয়নি। গ্রাম স্বাবলম্বন, স্থানীয় উৎপাদন ও বণ্টন প্রভৃতি মূলতত্ত্বগুলি সেজন্য গ্রামবাসীদের উত্তমরূপে জ্ঞাত করানো হবে কর্মীদের প্রাথমিক দায়িত্ব।

সময়ে সময়ে স্বাবলম্বন-খাদি সম্বন্ধে নানা চিত্তাকর্ষক আলোচনা, প্রশ্নোত্তর প্রভৃতি হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছিল যে, খদ্দরের উৎপাদন ও বণ্টন যদি মূলতঃ গ্রামকেন্দ্রিত হয় তবে মোট উৎপাদনের কত ভাগ গ্রামে থাকবে আর কত ভাগ শহরে বিক্রয়ের জন্য পাঠানো যুক্তিসঙ্গত হবে? যদিও এসব আলোচনা প্রধানতঃ ১৯৩৫ সালেই হয়েছিল, তথাপি অদ্যাবধি খদ্দর উৎপাদন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে এই প্রশ্নের গুরুত্ব রয়েছে বলে তার উল্লেখ করা হচ্ছে। শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রমুখ খাদি বিশেষজ্ঞগণ হিসাব করে স্থির করেছেন যে, স্বাবলম্বী খাদির অর্থ এই হবে যে, খাদি উৎপাদক তিন গজ পরিমাণ বস্ত্র পরিধান করলে দুই গজ মত বস্ত্র বাইরে বিক্রী করতে পারেন। "স্বাবলম্বী খাদির পরীক্ষা এতেই হবে যে, পরিধানকারী তাঁর শ্রম বাদ দিলে প্রায় বিনা পয়সায় খদ্দর পাবেন। স্বাবলম্বী খাদি কখনই বিস্তার লাভ করবে না, যদি না দেশব্যাপী এর জন্য চাহিদা ও স্থানীয় বাজারের নিশ্চয়তা স্থিরীকৃত থাকে।"[১]

এই প্রসঙ্গে 'বিকেন্দ্রিত উৎপাদন' দ্বারা গান্ধীজী ঠিক যে অর্থনৈতিক আদর্শের কথা ভাবতেন সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। ল্যাঙ্কাশায়ারেও কিছু বস্ত্র কুটিরে প্রস্তুত হয়, কিন্তু তা সেই গৃহের বাসিন্দাদের ব্যবহারের জন্য নয়। তদ্রূপ, জাপানেও

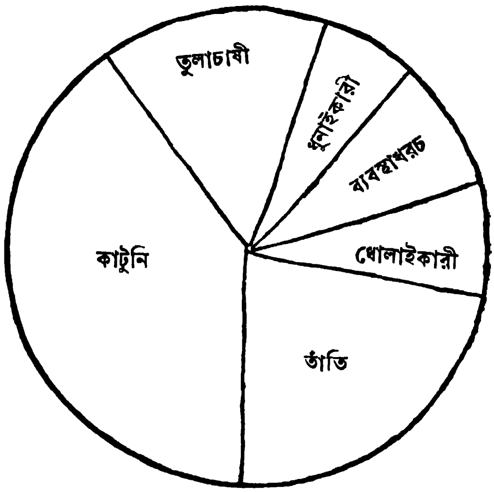
১. Harijan, 2. 11. '35

বহু ছোটখাট দ্রব্য কুটিরে প্রস্তুত হয়। কিন্তু তা সরকারী অর্ডার অনুযায়ী হয়, শিল্পীর ব্যবহারের জন্য নয়। এই প্রকারের বিকেন্দ্রিত উৎপাদন ব্যবস্থা গান্ধী মতাদর্শের অনুসারী নয়। গান্ধীজীর মতে, "বিকেন্দ্রীকরণের দ্বারা আমি এই বুঝি যে, কারিগর তার নিজের জন্য অথবা প্রতিবেশীর ব্যবহারের জন্যই কেবলমাত্র উৎপাদন করবে, বিক্রয়ের জন্য নয়।" ১

বিকেন্দ্রিত উৎপাদন পদ্ধতির দ্বারা মূলতঃ স্থানীয়ভাবে উৎপাদন ও বণ্টন প্রক্রিয়া নিষ্পন্ন হওয়ার ফলে উৎপন্ন সম্পদ্ ও অর্থের অধিকতর সমবণ্টন সমাজে সম্ভব হয়। সমবণ্টন না হলে আর্থিক ও সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠার কাজ বিঘ্নিত হবে। আধুনিক কেন্দ্রিত উৎপাদন পদ্ধতির এই একটি মারাত্মক ত্রুটি যে, যদিও এর ফলে প্রভূত পরিমাণে উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু সেই উৎপাদন ব্যবস্থা মুষ্টিমেয় ধনী ব্যবসায়ী ও শিল্পপতির করায়ত্ত থাকায় বা রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় সমাজের সাধারণ অধিবাসীর তার উপর কোন অধিকার থাকে না। জনসাধারণের সেই অবস্থায় চাতক পক্ষীর ন্যায় পুঁজিপতি ব্যবসায়ী বা সর্বনিয়ামক রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী হওয়া ছাড়া উপায়ান্তর থাকে না। স্বাধীন জনশক্তি নির্মাণের পথে এ একটি প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। মানুষের জীবনধারণের মুল চাবিকাঠি যদি এইভাবে রাষ্ট্র বা পুঁজিপতির মুঠোয় আবদ্ধ থাকে তবে তা মোটেই শুভ লক্ষণ নয়। গান্ধীজী এই কারণেও বিকেন্দ্রিত উৎপাদন তথা সমাজ স্বাবলম্বনের উপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করতেন। পরিকল্পনার লক্ষ্য হওয়া উচিত কেবলমাত্র উৎপাদন বৃদ্ধি করাই নয়। তার সঙ্গে যদি সমাজের কল্যাণ বৃদ্ধি না হয় তবে বুঝতে হবে কোথাও কিছু প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে বৃহত্তর সমাজকল্যাণ সাধিত হয়নি। বিকেন্দ্রিত উৎপাদন পদ্ধতির প্রতীক স্বরূপ চরখা উৎপন্ন সম্পদ্ ও অর্থের সমবণ্টন বহুলাংশে সিদ্ধ করে। এক টাকার খাদি বস্ত্র কিনলে বিভিন্ন প্রকার

১. Khadi—Why & How, p. 202

কারিগর তথা শিল্পীর মধ্যে সেই অর্থ কিভাবে বন্টিত হয় তার একটি হিসাব নীচে দেওয়া হল :



কাটুনি	...	০'৩৮ পঃ
তাঁতি	...	০'২২ ,,
ধোলাইকারী	...	০'০৮ ,,
ব্যবস্থাখরচ	...	০'০৯ ,,
তুলাচাষী	...	০'১৭ ,,
ধুনাইকারী, পাঁজতৈরিকারী	...	০'০৬ ,,
		১'০০ টাকা

উপরের এই সাধারণ তথ্য হতেই দেখা যায় যে, বিভিন্ন শ্রেণীর ছোট ছোট কারিগর তথা শিল্পীবৃন্দের হাতে অর্থের এই অধিকতর ন্যায্য বণ্টন হওয়ার ফলে সমাজের মধ্যে রাতারাতি কোটিপতি হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকবে। অধিকতর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ, উচ্চহারে খাজনা ব্যবস্থা প্রভৃতি আধুনিক সমাজবাদী পদ্ধতির পরিবর্তে গান্ধীজী সমতা বিধানের উদ্দেশ্যে বিকেন্দ্রীকরণের বৈপ্লবিক সম্ভাবনা প্রবর্তনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। এর লক্ষ্য ছিল সমাজে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ শক্তির আধিক্যের বদলে সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থায় স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ শক্তিকে

শক্তিশালী করে তোলা। রাষ্ট্রনির্ভরতাকে সংকুচিত করা মানুষের স্বাধীন জীবন ধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়।

এখন দেখা যাক মিলে উৎপাদিত বস্ত্রের জন্য ব্যয়ের তুলনামূলক হার কি? আমেদাবাদের পাঁচটি বৃহৎ বস্ত্রকলের উৎপাদন ব্যয়ের একটি গড় হিসাবে দেখা যায়ঃ

উৎপাদন ব্যয়ের বিষয়		গড় শতকরা হার
মজুরি	...	১৭'০
গুদাম	...	১২'০
জ্বালানি	...	৩'৫
সুদ	...	২'৫
কমিশন	...	২'৫
ট্যাক্স	...	৫'৫
তুলা	...	৫২'০
ক্ষয়ক্ষতি	...	৩'০ [১]

যদিও হিসাবটি কিছু পুরাতন, তথাপি আমাদের আলোচনার দৃষ্টিতে অদ্যাবধি তুলনাযোগ্য। এইভাবে দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র ও গ্রাম শিল্পভিত্তিক বিকেন্দ্রিত উৎপাদন ব্যবস্থায় আধুনিক কেন্দ্রিত শিল্প-প্রথার কতকগুলি অপরিহার্য ব্যয় কমানো যায়। যেমন, জ্বালানি, সুদ, কমিশন, ট্যাক্স, ক্ষয়ক্ষতি ইত্যাদি। এই খরচগুলি অনেক সময় এই কারণে করতে হয় যে, উৎপাদিত দ্রব্যের অধিকাংশ স্থানীয় বাজারে বিক্রয়ের পরিবর্তে দূরবর্তী স্থানে পাঠানো হয় আর তাও আবার হয়তো বেশ কিছুকাল পরে বাজারে বিক্রয়ার্থে প্রেরিত হয়। কাঁচামাল যেখানে উৎপন্ন হয়, সম্ভবমত সেই নিকটবর্তী স্থানে পাকামালে পরিণত করার ব্যবস্থার বদলে এক দেশের কাঁচামাল অন্য দেশে প্রেরিত হয় কারখানায় পাকামাল তৈরির জন্য। আবার সেই উৎপাদিত পাকামাল পুনরায় প্রথম দেশে (অর্থাৎ, যে দেশ হতে কাঁচামাল আমদানী করা হয়েছে) রপ্তানী করা হয়। এর ফলে

১. Ref: A Philosophy of Indian Economic Development, p 42

অযথা জটিলতার সৃষ্টি হয়। ইংরাজীতে একটি সুপ্রচলিত প্রবাদবাক্য আছে: 'নিউক্যাসেলে কয়লা বয়ে নিয়ে যাওয়া।' এর অর্থ এই যে, নিউক্যাসেলে কয়লা খনি অঞ্চলে যেখানে প্রচুর কয়লা পাওয়া যায়, সেখানে কয়লা আমদানী করা মূর্খতার পরিচায়ক। সেইজন্য বিশ্ববিখ্যাত শিল্পপতি হেনরী ফোর্ড একবার বলেছেন, "৫০০ মাইল দূর হতে কোন জিনিস ক্রেতা জনসাধারণের নিকট বহন করে নিয়ে যাওয়া অন্যায়, যদি সেই দ্রব্য ২৫০ মাইলের মধ্যে পাওয়া যায়।"[১] গান্ধীজীও তাই বলেছেন যে, ভারতবর্ষ হতে তুলা রপ্তানী করে ইংলণ্ডে প্রস্তুত সেই বস্ত্র পুনরায় ভারতে আমদানী করে গরিব গ্রামবাসীদের কাছে বিক্রয় করা নিশ্চিতরূপে অন্যায়। শুধু তাই নয়। গ্রামে তুলার চাষ করে চাষী আপন ঘরে বসে চরখায় সুতা কেটে গ্রামের তাঁতিকে দিয়ে বুনে নিলে নিঃসন্দেহে তা লাভজনক হতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন, মিলগুলির আক্রমণ হতে গ্রামশিল্পগুলিকে রক্ষার জন্য উপযুক্ত সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা ও তৎসহ জনমানসে অনুকূল মানসিকতা সৃষ্টি করা। কেন না, আমরা আধুনিক অর্থনীতির জটিলতায় পড়ে যেন ভাবতেই পারি না যে, এই প্রকার সহজ স্বয়ংক্রিয় স্বাবলম্বী উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তন সম্ভব।

অনেকে মনে করেন যে, চরখা চালাবার কথা বলার অর্থই হচ্ছে দেশকে পিছনের দিকে নিয়ে যাওয়া, প্রগতির বিরুদ্ধে চলা। গান্ধীজী চরখার মাধ্যমে দেশে সেই প্রগতিবিরোধী আবহাওয়া আনতে চেয়েছিলেন। চরখার মানেই হচ্ছে যন্ত্রবিরোধী মানসিকতা। অনেকের মতে গান্ধীজীর চরখা প্রীতির এই হচ্ছে মূল কারণ। কিন্তু আমরা পাল্টা প্রশ্ন করতে পারি না কি যে, সুপ্রাচীন বলেই কি চরখা বর্জনীয়? হাতুড়ি, কুড়ুল, ছুঁচ প্রভৃতি যন্ত্রও তো সুপ্রাচীন; তথাপি অতি আধুনিক দেশেও এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিত্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বর্জন করা যায়নি। সেজন্য আধুনিক সমাজের কাছে গান্ধীজীর জিজ্ঞাসা এই যে, চরখায় যান্ত্রিক অধোগতি অথবা যন্ত্রে নৈতিক অবনতি—

১. Ref: A Philosophy of Indian Economic Development, p. 47

এর কোন্‌টি অধিক ভয়াবহ? চরখা দ্বারা গান্ধীজী সকল যন্ত্র উচ্ছেদ করতে চাননি বলেই বলেছেন,

"খদ্দর যন্ত্রকে ধ্বংস করতে চেষ্টা করে না, কিন্তু এ তার অন্যায় বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করে। দরিদ্রতম মানুষটিকে তার কুটিরে সেবা করার উদ্দেশ্যেই চরখা যন্ত্রের ব্যবহার করে। চরখা স্বয়ং একটি অতি নিখুঁত যন্ত্রবিশেষ।"[১]

খাদি আন্দোলন কি আধুনিক সকল প্রকার বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ-বিদ্যার বিরোধী? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্র চালনার মধ্যে কি কোনপ্রকার আধুনিকতা প্রয়োগ করা যায় না? কিন্তু আমরা প্রায়ই ভুলে যাই যে, যন্ত্র ছোট কি বড় এর উপরেই বিজ্ঞান বা প্রয়োগবিদ্যা প্রধানতঃ নির্ভরশীল নয়। ছোট ঘড়ি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিমাপ যন্ত্র বা বৃহৎ বৃহৎ যন্ত্র—এ সকলের মধ্যেই বৈজ্ঞানিক কলা আছে। খাদি বিজ্ঞানের মধ্যেও তাই বস্ত্র উৎপাদনের বিজ্ঞান পুরামাত্রায় আছে। বরং বিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে 'থার্মো-ডাইনামিক্‌সের দ্বিতীয় সূত্র' রূপে অভিহিত করা হয়, খাদির কার্যক্রমের মধ্যে অর্থনীতির ক্ষেত্রে সেই নীতিরই ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়।[২]

গান্ধীজীও যে বিজ্ঞানভক্ত ছিলেন, যন্ত্রে উন্নত প্রয়োগ সমর্থন করতেন তার প্রমাণ উন্নত মডেলের চরখা প্রচলনের উদ্দেশ্যে পুরস্কার ঘোষণা। কোন উন্নত চরখা অথবা ধুনাই যন্ত্র সহ চরখা সেট আবিষ্কারের জন্য নিখিল ভারত চরখা সঙ্ঘ ১৯২৯ সালে একলক্ষ টাকার (৭৭০০ পাউণ্ড) পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। অবশ্য, নিম্নোক্ত সর্তসমূহ পালিত হওয়া সাপেক্ষে:

(১) চরখাটি আকারে হালকা ধরনের হবে যাতে ভারতবর্ষের যে কোন গ্রামীণ কুটিরে বসে তা হাত অথবা পায়ের সাহায্যে চালানো যায়।

(২) এটি এমন হওয়া উচিত যাতে একজন স্ত্রীলোকও অধিক পরিশ্রম না করে দিনে আট ঘণ্টা কাজ করতে পারে।

১. Young India, 17.3.'27
২. Ref: A Philosophy of Indian Economic Development, p 91

(৩) হাতে ধুনাই করা পাঁজ যেন এই যন্ত্রে ব্যবহার করা যায়; বা ধুনাইয়ের আবশ্যকতা যেন থাকে।

(৪) আট ঘণ্টা অবিরাম চালালে যেন ১২-২০ নম্বরের সূতা ১৬০০০ গজ উৎপন্ন হয়।

(৫) যন্ত্রটির মূল্য ভারতে যেন ১৫০ টাকার অধিক না হয়।

(৬) যন্ত্রটির গঠননৈপুণ্য উত্তম হওয়া বাঞ্ছনীয় যাতে করে মাঝে মাঝে ছোটখাট পরিবর্তনযোগ্য সরঞ্জাম ইত্যাদি বদল করলে কুড়ি বছর পর্যন্ত কাজ করা যায়। এইরূপ সরঞ্জামাদি পরিবর্তনের ব্যয় যেন যন্ত্রটির মূল্যের ৫% বার্ষিক ব্যয়ের অধিক না হয়। শেষোক্ত সর্ত দুইটিতে বিচারক মণ্ডলীর নাম ইত্যাদি আছে।

গ্রামীণ জনতার কল্যাণের চিন্তাই এই বৈজ্ঞানিক উন্নতিবিধানের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

পল্লীজীবনের পূর্ণাঙ্গ পুনর্গঠনের জন্য গান্ধীজী চরখা ও অন্যান্য পল্লী শিল্পের সমবায়ে একটি কৃষি ও শিল্পভিত্তিক সমাজ গঠন করতে চেয়েছিলেন। সেজন্য তিনি এই সমাজে চরখার স্থান নির্ণয় প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "খাদি হবে গ্রামীণ জীবনে সৌরমণ্ডলে সূর্যের ন্যায়। আর বিভিন্ন শিল্পগুলি গ্রহ-উপগ্রহের ন্যায় চতুষ্পার্শ্বে আবর্তিত হবে।"[১] স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় খাদি ছিল শ্রীজওহরলালের ভাষায় 'স্বাধীনতার উর্দি' (Livery of freedom), আর বিনোবাজীর কথায়, স্বাধীনতার পরে নূতন সমাজ গঠনের জন্য খাদি হবে 'সর্বোদয়ের পতাকা'।

খাদি মনোভাব

স্বাধীনতার পরে খাদি ও অন্যান্য পল্লীশিল্পজাত দ্রব্যসমূহের উৎপাদন এবং বিক্রয় বেড়েছে। খদ্দর উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য এসেছে। তাই স্বাভাবিক কারণে খাদি বস্ত্রের ব্যবহার যে বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রশ্ন করা যায় যে, গান্ধীজী যে

১. Harijan, 16 11. '34

অর্থে খাদি পরিধানের কথা বলতেন, সেই আদর্শ সন্ধানের পথে কি আমরা সত্যিই অগ্রসর হচ্ছি খদ্দরের বিক্রয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে? আমরা কি আমাদের সমাজে খাদি অর্থনীতির মৌল তত্ত্বগুলির প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠার জন্য তৎপর হয়েছি?

অনেকের নিকট খাদি কেবলমাত্র 'মিটিং কা কাপড়া' স্বরূপ। অনেকে হয়ত আবার কিছু সরকারী আনুকূল্য প্রাপ্তির আশায় খদ্দর পরিধান করেন। মূল প্রশ্ন হচ্ছে যে, খাদি পরিধানের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মধ্যে কি খাদি মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে? গান্ধীজীর কথায় বললে, "যখনই আমরা খাদি পরিধান করব আমাদের তখন স্মরণ করা উচিত যে, দরিদ্রনারায়ণের নামে এবং ভারতের মুমূর্ষু জনতার জন্যই তা করছি।"[১]

খাদি মনোভাবের অর্থ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সরলতা এবং অসীম ধৈর্য। খাদি উৎপাদন সম্বন্ধে যাঁদের সামান্য জ্ঞানও আছে তাঁরাই জানেন যে, কাটুনি ও তাঁতিদের কী পরিমাণ ধৈর্যের সঙ্গে কাজ করতে হয়। আমাদেরও 'স্বরাজের সূতা' কাটবার সময় সেরূপ ধৈর্যশীল হতে হবে। অনুরূপভাবে খাদি মনোভাবের মধ্যে অসীম বিশ্বাস অন্তর্ভুক্ত। এই বিশ্বাস হচ্ছে সত্য ও অহিংসায় বিশ্বাস। আবার "এর অর্থ বিশ্বের সকল মানুষের সঙ্গে একাত্মবোধ। প্রতিবেশীর ক্ষতি হতে পারে এমন সব কিছুই বর্জন করতে হবে।"[২] সেই এক কল্পনা দরিদ্রনারায়ণের উত্থান, তাদের কল্যাণ। স্বদেশ ব্রত, চরখা, গ্রামশিল্প প্রভৃতি প্রত্যেকটির মধ্যেই এই ভাবের প্রকাশ।

সস্তা না চড়া

মিলের কাপড়ের তুলনায় খদ্দরের দাম বেশী। এ কথা সত্য। সুতরাং চড়া দামে খদ্দর পরা অপেক্ষা সস্তায় মিলের কাপড় পরা অধিকতর লাভজনক—খদ্দরের বিরুদ্ধে এ যুক্তি দেখানো হয়। কিন্তু খদ্দরের মূল্য বেশী কেন, কিংবা দামে চড়া হওয়া সত্ত্বেও কেন

১, ২. Khadi—Why & How, p. 114

খাদি পরিধান করার কথা গান্ধীজী বলেছেন, বৃহত্তর জাতীয় অর্থনীতির দৃষ্টিতে তা জানা আমাদের একান্ত আবশ্যক।

শক্তিচালিত যন্ত্রের উৎপাদনের তুলনায় হস্ত-উৎপাদনের মূল্য সব সময়েই অধিক হবে। কিন্তু কোন জিনিসের প্রকৃত উৎপাদককে বেকার রাখার পরিবর্তে তার হস্তশ্রমের বাবদে জীবনধারণের জন্য নিম্নতম মজুরি (Living wage) দিলেই মূল্যবৃদ্ধির কথা উঠবে কেন? মিলের আক্রমণে যেসব গ্রামীণ শিল্পী ও কারিগর কর্মহীন বেকার হল, সেই সকল নিরন্ন জনতার অনশন, অর্ধাশনের কথা কে চিন্তা করবে? খাদির বর্ধিত মূল্য এদেরই প্রাণরক্ষা করে। এইজন্য আমরা বরং এ কথা বলব যে, খাদি দামে চড়া বলেই তা আমাদের পরা উচিত। গান্ধীজীর কথায়, টাকা পয়সার বিচারে বড় বড় সংগঠিত কলগুলি (স্বদেশী ও বিদেশী) সর্বদাই হস্তশ্রমকে পরাস্ত করবে। মিথ্যা ও হৃদয়হীন অর্থনীতির স্থলে সত্য ও মানবীয় অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করাই খাদির উদ্দেশ্য। আত্মঘাতী প্রতিযোগিতার বদলে সহযোগিতাই মানবজাতির ধর্ম।[১] সস্তা ও চড়ার প্রচলিত যুক্তিকে তাই সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে বিচার করে দেখতে হবে।

পশ্চিম হতে অবাধ বাণিজ্য এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতির আমদানীর ফলে লাভের মাত্রা বৃদ্ধি করাই মুখ্য বিচার্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সর্বাপেক্ষা সস্তায় কিনে সর্বোচ্চ মূল্যে তা বিক্রী করে বৃহত্তম লাভের জন্য যে অর্থনীতি সচেষ্ট তা আর যাই হোক মানবিক ন্যায়নীতির অনুসারী নয় খাদি অর্থনীতির মূল নীতি প্রচলিত অর্থনীতি হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমাদের পারিবারিক জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই দেখা যাবে যে, বৃদ্ধ্ পিতামাতা ও শিশুসন্তান যারা কোনরূপ আয় করতে পারে না, পরিবারের উপর তারা আর্থিক দিক থেকে নির্ভরশীল। তাই বলে তাদের উপর আমরা নিষ্করুণ হই না। বরং এইরূপ অশক্ত পিতামাতার উপর সর্বাধিক দৃষ্টি দেওয়াই ধর্ম ও ন্যায়-নীতির কাজ বলে বিবেচনা করি। তেমনই খাদিকে কেবলমাত্র টাকা

১. Harijan. 13. 7. '35.

পয়সার মানদণ্ডে বিচার না করে জাতীয় কল্যাণের ভিত্তিতে বিচার করলে দেখা যাবে যে, খাদি লক্ষ লক্ষ নিরন্ন অসহায় পরিবারের সামাজিক নিরাপত্তার একটি বাস্তব পন্থা। এই সব অসহায়দের বাঁচার অধিকার স্বীকার করার অর্থই এই যে, খাদি দামে চড়া হলেও তা স্বদেশী বস্ত্র, পবিত্র হস্তশ্রমের প্রতীক। কারণ, অর্থ হতে জীবন সব সময়ে বড়। তাই এ কথা বলতে পারি যে, মিলের কাপড়ের সঙ্গে যদি কর্মহীন অসংখ্য কাটুনি ও তাঁতির বেকারি ভাতা যোগ করা যায় এবং আর্থিক সমবণ্টনের ভিত্তিতে তার মূল্যাংকন করা হয় তবে তাই হবে খাদি বস্ত্রের মূল্য। অর্থাৎ সূত্রাকারে বললে—

$$\left.\frac{\text{মিলবস্ত্র} + \text{বেকারি ভাতা} + \text{আর্থিক সমবণ্টন}}{\text{সমতা}}\right\} = \text{খাদির মূল্য}$$

এইসব গরীব কাটুনিদের জীবন ধারণের উপযোগী মজুরি দেবার জন্য গান্ধীজী যখন ১৯৩৫ সালে প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি করলেন তখন চরখা সঙ্ঘের কর্মীরা বলেছিলেন যে, মজুরি যদি আরও বৃদ্ধি করা যায় তবে খাদির মূল্যও নিঃসন্দেহে আরও বাড়বে। গান্ধীজীর বক্তব্য ছিল, একজন দক্ষ কাটুনি বা শিল্পী আট ঘণ্টা শ্রমের বিনিময়ে যেন কমপক্ষে আট আনা উপায় করতে সক্ষম হয়। অথচ, ঐ সময়ে পূর্বে একজন কাটুনিকে ঘণ্টায় মজুরি দেওয়া হত দুই পাই, আর একজন তাঁতিকে কমপক্ষে একআনা এবং অনেক ক্ষেত্রে দুই আনা দেওয়া হত। অর্থাৎ, কোন পরিবারে দুইজন কাটুনি থাকলে এই হিসাবে মাসে ত্রিশ টাকা আয় হতে পারে।

বাদ প্রতিবাদের ঝড় উঠল। খাদির দাম আরও বৃদ্ধি করলে বিক্রয়ের উপর তার প্রতিক্রিয়া নিশ্চিতরূপে দেখা দেবে। কিন্তু গান্ধীজী তাঁর এই নূতন সংকল্পে অটল থাকলেন। তিনি কর্মীদের প্রথমে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, চরখা ও গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘকে ন্যায্য পথে অগ্রসর হবার জন্য যোগ্য ও সাহসী হতে হবে। যাঁরা খাদি ক্রয় করেন তাঁদেরও বিশ্বাস আনা চাই যে, দরিদ্রনারায়ণদের জন্যই এই মূল্য বৃদ্ধি করা হবে, প্রতি একশত টাকার মধ্যে পঁচানব্বই

টাকা যেখানে তাদের হাতেই যাবে। অবশেষে আট আনার স্থলে তিন আনা পর্যন্ত মজুরি বৃদ্ধি পেল।

মজুরিবৃদ্ধিজনিত খাদির কম বিক্রয় হওয়ার সম্ভাবনা এবং তার ফলে অনেক কাটুনি বেকার হওয়ার প্রশ্নও গান্ধীজীর কাছে এসেছিল। এর উত্তরে গান্ধীজী বললেন, "আমাদের ভুলতে হবে যে, খাদি বস্ত্র মিলের কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে। খাদি হচ্ছে খাদি আর মিল কাপড় মিলেরই কাপড়। মিলবস্ত্রের উৎপাদক সবসময় সস্তার দিকে লক্ষ্য দিবেন; আর আমরা দৃষ্টি দেব ন্যায়বিচার এবং ন্যায্য মজুরির প্রতি। সেজন্য এই দুইয়ের মধ্যে কোন তুলনাই চলে না। বাস্তব অসুবিধার সমাধানের জন্য আমাদের ব্যবস্থা খরচ কমাতে হবে, বিজ্ঞাপন বন্ধ করতে হবে। খাদির প্রতি যাঁরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তাঁদের কাছে এ হবে একটা পরীক্ষা স্বরূপ। আর খদ্দর ব্যবহার-কারীদের নিকট এ হচ্ছে আত্মশুদ্ধির প্রশ্ন। আমাদের ব্রত হচ্ছে দরিদ্রনারায়ণের সেবা এ কথা ভুললে চলবে না।"[১]

মিলের সঙ্গে তুলনামূলক দৃষ্টিতে খদ্দরের দাম বেশী হবে এ কথা স্বাভাবিক। কিন্তু এই চড়া মূল্যে খদ্দরের প্রচলনের জন্য চেষ্টা করা অর্থনীতির দৃষ্টিতে যুক্তিসঙ্গত হবে কিনা এ প্রশ্নও অনেকে করেন। অর্থাৎ, অর্থনীতির তত্ত্ব অনুযায়ী বর্ধিত মূল্যের খাদি কি সমর্থনযোগ্য কোন প্রস্তাব? এর সহজ সরল উত্তর হল যে, যদি এই প্রশ্নের দ্বারা এরূপ মনে করা হয় যে, খদ্দর জাপানী কিংবা দেশী মিলে প্রস্তুত দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াবে তবে আমরা জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে, কখনই না। কিন্তু এই নেতিবাচক উত্তরের পশ্চাতে ইতিবাচক প্রশ্নও জড়িত আছে। হস্তশ্রম কখনই যান্ত্রিক শ্রমের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে সমর্থ হয় না। গ্রামের বর্তমান বাস্তব অবস্থা কি? বিদেশী যন্ত্রশিল্পের আক্রমণের ফলে যেমন আমাদের স্বদেশী শিল্পসমূহ অবলুপ্ত হতে থাকল তদ্রূপ শহরের বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের আক্রমণের ফলে গ্রামের ঢেঁকি, ঘানি, গুড়, চর্মশিল্প

১. Khadi—Why & How, p. 125

প্রভৃতি লুপ্ত হতে বসেছে। শহরের এই নীরব আক্রমণকে লক্ষ্য করেই গান্ধীজী সক্ষোভে একবার বলেছিলেন, "গ্রামগুলিকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে ইতিহাসের কোন চেঙ্গিস খানই এরূপ নিপুণ তথা লাভদায়ক পন্থা উদ্ভাবন করতে সক্ষম হবেন না।" [১] কিন্তু এসব প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও গান্ধীজী যখন বলেন যে খাদি একমাত্র প্রকৃত অর্থনৈতিক প্রস্তাব তার অর্থ কি? এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে গান্ধীজী বলেছেন, "লাখ লাখ গ্রামবাসীর দৃষ্টিতে খদ্দর একমাত্র প্রকৃত অর্থনৈতিক প্রস্তাবরূপে আখ্যাত হবে, যতদিন না ভারতের প্রত্যেকটি গ্রামে সকল কর্মক্ষম প্রাপ্তবয়স্ক (ষোল বছরের উর্ধ্বে) পুরুষ ও স্ত্রীলোকের জন্য খেত-খামারে, কুটিরে অথবা কারখানাতেও অধিকতর উপযোগী কোন কাজের এবং পর্যাপ্ত মজুরির ব্যবস্থা করা যায়; অথবা যতদিন না গ্রামের পরিবর্তে অনেক শহর নির্মিত হয়, যাতে করে গ্রামবাসীরা সুনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী হয়। এত সবিস্তারে বর্ণনা এই কারণে করা হল যে, এখনও দীর্ঘকালের জন্য খাদির গুরুত্ব অটুট থাকবে।" [২]

গ্রামবাসীদের কর্মহীনতা এবং কাজ না করার অলস মানসিকতার দরুন এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে, তারা যেন জীবন্ত মৃতরূপে জীবন ধারণ করছে। কাল যেখানে ছিল নৈরাশ্যের কৃষ্ণছায়া, খাদি সেখানে আশার আলোর সন্ধান দেয়। সেইজন্য গান্ধীজীর কাছে, "প্রতি গজের হিসাবে খাদির দাম মিলবস্ত্র হতে চড়া হলেও সামগ্রিক দৃষ্টিতে এবং গ্রামবাসীদের নিকট খাদি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা উপযোগী একটি আর্থিক ও বাস্তব প্রস্তাব যার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নাই।" [৩] এখানে খাদি অর্থে অন্যান্য গ্রামশিল্পও অন্তর্ভুক্ত।

প্রকৃত প্রস্তাবে, খদ্দর স্বাবলম্বনের প্রতীক। সেইজন্য সুতা কেটে তা দিয়ে বস্ত্র তৈরি করে আপন গৃহে তা ব্যবহার করলে সেই খাদি প্রায় বিনামূল্যেই পাওয়া যায়। স্বেচ্ছাকাটুনি যদি আপন গৃহকোণে উৎপন্ন কার্পাস বৃক্ষ হতে তুলার দ্বারা আপন শ্রমে সুতা কাটেন এবং

১. Khadi—Why and How, p. 38   ২. Harijan, 20, 6, '36
৩. Harijan, 20.6.'36

তা স্থানীয় তাঁতিকে দিয়ে বুনাবার ব্যবস্থা করেন তবে অতি সহজেই তাঁর এবং পরিবারের প্রয়োজনীয় বস্ত্র তৈরি হতে পারে, বিশেষ করে অম্বর চরখায়। এ বিষয়ে বর্তমান লেখকের নিম্নোক্ত বইখানিতে প্রদত্ত একটি হিসাব অনুধাবনযোগ্য।[১]

অনেকে প্রশ্ন তোলেন যে, খাদিকে বাঁচাবার জন্য বর্তমানে যে রিবেট ইত্যাদি সরকার কর্তৃক প্রদত্ত হয় তা বন্ধ করা উচিত। অন্য কথায়, তাঁদের বক্তব্য এই যে, এইভাবে সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত খাদিকে আদর্শের নামাবলী গায়ে জড়িয়ে কতকাল বাঁচিয়ে রাখা আর যুক্তিসঙ্গত হবে? মিলের কাপড়ের উপর সেস্ ধার্য করে খদ্দরের জন্য রিবেট দেওয়ার নীতির তাঁরা বিরোধী। কিন্তু তাঁরা কি জানেন না যে, বিদেশী বস্ত্রের প্রতিযোগিতা হতে স্বদেশী মিলকে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ১৯৩২ সাল হতে সরকার আমদানী শুল্ক ধার্য করেছেন? এই আমদানী শুল্কের পরিমাণ বর্তমানে প্রায় ৬০%, ১০০% সমহার অনুযায়ী। এই শুল্কের বোঝা বর্ধিত মূল্যের আকারে কি জনসাধারণ বহন করে নাই? কৃত্রিম সিল্কজাত বস্ত্র, কোন কোন রাসায়নিক দ্রব্য, সাইকেল, মোটর গাড়ী প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্পজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রেই এইরূপ আমদানী শুল্ক ধার্য করা হয়। যে-কোন উন্নয়নশীল দেশের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য বিদেশী দ্রব্যের প্রতিযোগিতা হতে সংরক্ষণমূলক শুল্ক ব্যবস্থা গৃহীত হওয়া স্বাভাবিক। তাছাড়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রসহ পাশ্চাত্যের প্রায় সকল দেশেই বৃদ্ধ ও অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য সরকার সামাজিক নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে খাজনা ধার্য করেন। ভারতের বর্তমান অবস্থায় এরূপ ট্যাক্সের বোঝা চাপানো আর সম্ভবপর নয় বলে এইরূপ কোন সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা করা কি যুক্তিযুক্ত হবে না যে, যে সব গ্রাম ও কুটির শিল্পের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে লাখ লাখ অসহায় জনসাধারণ আপন উদ্যমে জীবিকার্জনের নিম্নতম ব্যবস্থা করে, সেই পল্লীশিল্পগুলিকে শহরের অনুরূপ বৃহৎ শিল্পের প্রতিযোগিতা হতে রক্ষা করা দরকার? বৃহত্তর সামাজিক কল্যাণ-

১. গান্ধীমত ও পথ, পৃঃ ৪৮

সাধনের দৃষ্টিতেই এই ক্ষেত্রেও পল্লীশিল্পগুলির সংরক্ষণ একান্তরূপে আবশ্যক নয় কি? সমাজে যারা বৃহত্তম তারা যদি নগণ্য হেয় অসহায় ও অপাংক্তেয় থাকে তবে তা হবে মানবতাবিরোধী কাজ। খাদি এই সামাজিক আদর্শের কথাই প্রচার করে।

সেইজন্য বিনোবাজী বলেন যে, খাদি পরিধানই দয়ার কাজ। মনে করুন, ২০ গজ মিলের কাপড়ের কেনা দাম পড়ে ১৫.০০, আর খাদিতে লাগে ৩০.০০, এই ত্রিশ টাকার মধ্যে খাদির মুল্য ধরুন ১৫.০০, বাকী ১৫.০০ হল দয়া, প্রেম ও করুণা। এ ধর্মের কাজ। এইজন্য এই ১৫ টাকা ধর্মের খাতে লিখলে অন্য প্রকার তীর্থযাত্রা বা দানধর্মের প্রয়োজন নাই। এই হল খাদির প্রকৃত বিচার। সেজন্য খাদি কেবল মাত্র এক টুকরা বস্ত্র নয়, এ এক বিচার। এ এক আদর্শের প্রতীক।

চরখা ও অহিংসা

পুর্বোক্ত আলোচনা হতে প্রতীয়মান হবে যে, চরখাকে গান্ধীজী কত ব্যাপকদৃষ্টিতে দেখতেন। চরখায় সুতা কেটে গ্রামের গরীব নিরন্ন জনসাধারণ তুটা পয়সা উপার্জন করুক—গান্ধীজীর কাছে কেবল মাত্র এইটুকুই চরখার উদ্দেশ্য ছিল না; পরন্তু চরখার মাধ্যমে অহিংস সমাজ রচনা করাই ছিল তাঁর কাম্য। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে সেবাগ্রামে খাদিকর্মীদের সমক্ষে তাঁর সারগর্ভ ভাষণঃ

"আমি যখনই অহিংসার কথা ভাবি তখনই চরখার ছবি আমার সামনে ভেসে ওঠে। অব্যক্তরূপে অহিংসার স্বরূপ আমরা বুঝতে পারি না। সুতরাং সেই নিরাকারকে আমাদের নিকট মূর্ত করে তোলার জন্য আমরা কোনকিছুর সন্ধান করছিলাম। চরখা আমার কাছে এইরূপে প্রতিভাত হয় আর সেই কারণেই আমি চরখার উপাসনা করি। আমার চরখাকে উপাসনা করার অন্তর্নিহিত ভাবটি যদি আপনারা অনুভব না করেন তবে একশ বছরের মধ্যেও অহিংসা সম্বন্ধে কোন ধারণা আপনারা করতে সক্ষম হবেন না।" [১]

১. Khadi—Why and How, p 172.

গান্ধীজীর কাছে অহিংসা পরলোকের ধর্ম ছিল না। তিনি পৃথিবীর মানুষ ছিলেন, তাই ইহলোকেই অহিংসার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন এবং এই পৃথিবীর মানুষ ও সমাজে অহিংসার প্রয়োগ করে গেছেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে। যাঁরা হিংসার নীতিতে বিশ্বাসী তাঁদের গৃহে প্রবেশ করলে কি দেখা যায়? দেখা যায়, ঢাল, তলোয়ার, বন্দুক, ব্যাঘ্র ও হরিণের চর্ম প্রভৃতি। গান্ধীজী যখন মুসোলিনীর প্রাসাদে গিয়েছিলেন তখন তিনি দেখেছিলেন যে, তাঁর গৃহে দেওয়ালে অস্ত্রশস্ত্র শোভা পাচ্ছে।

তিনি এই প্রসঙ্গে একটি অতি সুন্দর উপমা দিয়ে বলেছেন, "অস্ত্রশস্ত্র ঠিক যেমনটি হিংসার প্রতিচ্ছবি, চরখাও তদ্রূপ অহিংসার প্রতীক। এই অর্থে যে, এর মাধ্যমেই আমরা অতি প্রত্যক্ষ রূপে অহিংসাকে উপলব্ধি করি।...মুসোলিনীর প্রাসাদে তরবারি যেন এই কথাই বলত, 'আমাকে স্পর্শ করলেই আমি তোমাকে ছেদন করব।' হিংসার একটি অব্যর্থ ছবি এর থেকে পাওয়া যায়। তদ্রূপ, ঠিক এমন ভাবে চরখার শক্তি আমাদের দেখাতে হবে যাতে করে কেবলমাত্র এর প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই অহিংসার কথা প্রতীয়মান হয়।" ১

১৯৩৯ সালে যখন দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ শুরু হল তখন গান্ধীজী বারংবার দেশবাসীকে গ্রাম স্বাবলম্বনের নীতিতে প্রত্যাবর্তনের জন্য সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। যুদ্ধের ভয়াবহ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিদেশ হতে আমদানী বন্ধ হতে বাধ্য। তাই যে দেশ যত অধিক পরিমাণে আত্মনির্ভরশীল হতে পারে তত তার পক্ষে তা মঙ্গলজনক। এই সময়ে একটি প্রবন্ধে তিনি লিখলেন, "মনে রাখবেন যে, চরখায় বিশ্বাস না থাকলে আপনাদের অহিংসা উত্তমরূপে কার্যকর হবে না। আপনারা নগর-সভ্যতার উপর অহিংসার ভিত্ নির্মাণ করতে পারেন না। আত্মনির্ভরশীল গ্রামের উপর তা নির্মাণ করা সম্ভব। এমনকি, হিটলারও ইচ্ছা করলে এরূপ সাতলাখ অহিংস গ্রামকে বিনষ্ট করতে সমর্থ হতেন না। বরং এই কাজের অন্তিমে

১. Khadi—Why and How, p. 170.

তিনি স্বয়ং অহিংসায় দীক্ষিত হতেন। আমার কল্পনানুযায়ী, গ্রামীণ অর্থনীতি সম্পূর্ণরূপে শোষণ পরিহার করে। আর শোষণ হচ্ছে হিংসার সারবস্তু। সেইজন্য অহিংস হওয়ার আগে প্রথমে গ্রামীণ মনোবৃত্তি সম্পন্ন হতে হবে। আর গ্রামীণ মনোভাব আনতে হলে চরখায় বিশ্বাস থাকতে হবে।"[১]

সুতরাং নানাভাবে গান্ধীজী চরখার সামগ্রিক দর্শন প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন। হরিভক্তের কাছে নামগান ও মালা জপ করা যেমন, অহিংসার পুজারী গান্ধীর নিকটেও চরখা ছিল ঠিক তদ্রূপ সাধকের সাধনসামগ্রী। খাদিকর্মীরা যাতে চরখার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন সেইজন্য গান্ধীজীর চেষ্টার অন্ত ছিল না। তাঁর এই সতর্কবাণী বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ

"চরখা স্বরাজের বাহন হতে পারে না, এমনকি তার চাকাও ঘুরবে না, যদি না জাতির অহিংসায় বিশ্বাস থাকে। স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী দেশ-প্রেমিকরা চরখাকে হীনদৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত। তাঁরা এর কোন ঐতিহাসিক নজীর খুঁজে পান না।...অন্যান্য দেশ রক্তবন্যা প্রবাহের দ্বারা যেভাবে স্বাধীনতা লাভ করেছে, তাঁরা সেই দৃষ্টান্ত দেন। হিংসাবিহীন চরখা তাঁদের নিকট মামুলি ব্যাপার বলে প্রতীয়মান হয়।"[২]

চরখার নব সংস্করণ

আপাত-সাহায্যের দৃষ্টিতে চরখার প্রচলন অপেক্ষা গান্ধীজী চেয়েছিলেন চরখার মাধ্যমে গ্রাম ও গ্রামীণ জীবনে প্রবেশ করে তার পুনর্গঠন করা। এই উদ্দেশ্যে চরখা সঙ্ঘ সারা দেশে ছোট বড় খাদি সংস্থা সৃষ্টি করেছিলেন। এক দৃষ্টিতে এই সব কেন্দ্র ছিল গান্ধীজীর পন্থায় গ্রামসংগঠনের এক একটি আখড়া বিশেষ। কেবলমাত্র কিছু সুতা কেটে তা দিয়ে কাপড় বুনে শহরে বিক্রয় করাই এর উদ্দেশ্য নয়।

১. Harijan, 4. 11. '39

২. Harijan, 9. 4. '40

১৯৩৫ সাল হতেই গান্ধীজী গ্রামবাসীদের ব্যবহারের জন্য খাদি উৎপাদনের কথা বলছিলেন। কিন্তু ১৯৪২ সালে ভারতব্যাপী আন্দোলনের সময় সরকারী দমননীতির ফলে কেন্দ্রগুলি যখন ভেঙে তছনছ করে দেওয়া হল তখন গান্ধীজীর কাছে এ কথা স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল যে, সরকার কেবলমাত্র তার ইচ্ছার দ্বারাই খাদি সংস্থাগুলি বিনষ্ট করে ফেলতে পারে। অর্থাৎ, জনগণের জীবনে খাদির মূল প্রবেশ করেনি। তাই জেল হতে মুক্তি পাবার পরে তিনি খাদি কাজের পুনর্গঠনের কথা গভীরভাবে চিন্তা করছিলেন। গান্ধীজী অনুভব করলেন যে, নিশ্চয়ই এতাবৎ অনুসৃত কর্মপন্থায় কোন ভুল আছে। চরখার আর্থিক দিকের উপরই যেন গুরুত্ব বেশী দেওয়া হয়েছে এযাবৎ। এর গভীর তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি তেমন দৃষ্টি দেওয়া হয়নি বলেই এই অপূর্ণতা।

তাঁর এই অন্তরের বেদনা, খাদিকর্মের এই অপূর্ণতা এবং নূতন চিন্তা তিনি সহকর্মীদের সমক্ষে উপস্থাপিত করলেন। এই উদ্দেশ্যে ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ১লা থেকে ৩রা পর্যন্ত সেবাগ্রামে একটি অখিল ভারত সম্মেলনে গান্ধীজী খাদির এই নব অধ্যায়, নূতন উত্তরণ বা নবযুগের মূল্যবান প্রস্তাব রাখলেন। পরবর্তী কালে তা 'চরখার নব সংস্করণ'রূপে খ্যাত হয়েছে। তিনি বললেন—

"খাদির এক যুগ শেষ হয়েছে। গরীবদের জন্য খাদি কিছু সম্পন্ন করেছে। এখন আমাদের দেখাতে হবে, তারা কেমনভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে? খাদি কিরূপে অহিংসার প্রতীক হতে পারে? এই হবে আমাদের প্রকৃত কাজ।"[১]

গ্রামবাসীদের প্রয়োজন মিটানোই হবে চরখার প্রধান কাজ। সেইজন্য গ্রামের প্রতি গৃহে চরখা নিয়ে যেতে হবে। চরখাকে বিচ্ছিন্নভাবে না চালিয়ে সমগ্র গ্রামসেবার দৃষ্টিতে পরিচালিত করতে হবে। গ্রামবাসীর জীবনের মর্মমূলে চরখা ও তার সমগ্র দর্শনের পরিচয় পাওয়া চাই। চরখাই যে অহিংস আর্থিক

১. Khadi—Why & How, p. 163.

স্বাবলম্বনের প্রতীক এ বিশ্বাস আমাদের থাকা চাই। প্রত্যেক গ্রাম তখন হবে স্বাধীন দেশের এক একটি প্রাণকেন্দ্র। গ্রামবাসীর সমগ্র জীবনের ছন্দ যেন চরখার তালে ধ্বনিত হয়। হিন্দু মুসলমানের সমস্যা, অস্পৃশ্যতার সমস্যা, গ্রাম ও শহরের পারস্পরিক সম্পর্কের সমস্যা প্রভৃতি সমাধান করাই হবে চরখা সঙ্ঘের প্রকৃত কাজ। আর কর্মীদের এর জন্যই জীবনধারণ করতে হবে; প্রয়োজন হলে জীবন সমর্পণ করতে হবে। চরখার নব সংস্করণের এই হল মূল কথা।

পুরাকালে চরখা ছিল ঠিকই। কিন্তু রাজা মহারাজারা তখন বাধ্যতামূলক বেগার শ্রম আদায় করতেন। চরখার কাটুনিরা পেত অতি সামান্য মজুরি। এরূপ বেগার শ্রমের উল্লেখ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে পর্যন্ত আছে। কিন্তু চরখাকে আমাদের অহিংসার প্রতীকরূপে প্রমাণিত করতে হবে। পুরাকালের দারিদ্র্য, অনাহার, অবিচার, বেগার শ্রম প্রভৃতি যে সব কলঙ্ক চরখার সঙ্গে জড়িত ছিল, আজ তার পরিবর্তে চরখাকে শক্তিশালী অহিংসা, নূতন সমাজব্যবস্থা, নূতন আর্থিক কাঠামোর প্রতীকরূপে রূপায়িত করতে হবে। আমাদের নব ইতিহাস রচনা করতে হবে। এই প্রসঙ্গে বিশেষ জোরের সঙ্গে গান্ধীজী বললেন, "কিন্তু এই সব সত্ত্বেও যদি আপনারা বিশ্বাস না করেন যে স্বরাজ অর্জনের ক্ষমতা চরখার আছে, তবে আমি বলব আপনারা আমাকে পরিত্যাগ করুন। এখানেই আপনারা সংকটস্থলে এসে দাঁড়িয়েছেন। আপনারা যদি বিশ্বাস না রেখে আমার সঙ্গে চলেন তবে আপনারা আমাকে প্রবঞ্চিত করবেন আর তাতে দেশের ক্ষতি করা হবে। আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ জানাব, আমার জীবনসায়াহ্নে আর এইভাবে আমাকে ঠকাবেন না।" [১]

তিন দিনের এই আলোচনা ও তার পরে চরখা সঙ্ঘের তদানীন্তন সম্পাদক শ্রীজাজুজীর সঙ্গে গান্ধীজীর দৈনিক একঘণ্টা হিসাবে যে অত্যন্ত মূল্যবান আলোচনা হয়েছিল (৭ হতে ১৪ অক্টোবর, ১৯৪৪)

১. **Khadi—Why & How, p. 171.**

তা পূর্ণরূপে সকল জিজ্ঞাসু গান্ধীবাদী কর্মী তথা অনুরাগীবৃন্দের গভীরভাবে অধ্যয়ন করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। খাদি আন্দোলনের ইতিহাসে এই আলোচনা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বলা যায়। সম্পূর্ণ আলোচনাটি 'Khadi—Why and How' শীর্ষক পুস্তকে বিধৃত আছে।

জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে যদি খাদির অচ্ছেদ্য যোগ না থাকে, যদি কাটুনি ও তাঁতিদের কেবলমাত্র তাদের পাওনা মজুরি মিটিয়ে দিয়েই আমরা সন্তুষ্ট থাকি, তবে বুঝতে হবে খাদি কাজের প্রকৃত ভিত্ নির্মিত হয়নি। সেই খাদি 'ব্যবসায়ী খাদি', 'বিচারশূন্য খাদি'। গান্ধীজী খাদির এই সীমিত প্রগতির অপূর্ণতার প্রতি বিশেষভাবে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন। অপরদিকে, জনগণকে আদর্শ অর্থনীতির স্বরূপ, বর্তমানের শোষণমূলক আর্থিক কাঠামো, হিংসামুক্ত বা অহিংস সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে শিক্ষাদান করতে হবে। কাটুনি যদি মদ্যপায়ী ব্যক্তি হয়, তবুও তাকে বর্জন না করে তাকে কাজ দিতে হবে; তার সঙ্গে প্রেমপূর্বক আচরণ করে হৃদয়ে প্রবেশ করে তাকে এই নেশা ধীরে ধীরে ত্যাগ করার জন্য মিষ্টভাবে অনুরোধ জানাতে হবে। তিনি বলেছেন, "আমার লক্ষ্য কেবলমাত্র খাদির কাজ করাই নয়, পরন্তু গ্রামবাসীর সমগ্র জীবনে প্রবেশ করাই আমার লক্ষ্য।" [১]

গান্ধীজী নিজেকে এই সময়ে যেন তীব্রভাবে আত্মনিরীক্ষণ করছিলেন। খাদির অন্তিম যে দর্শন প্রস্ফুটিত হওয়া উচিত ছিল এই সময়ের মধ্যে তা সফল না হওয়ায় তিনি যেন পথের সন্ধান করছিলেন। প্রত্যেক সমাজ পরিবর্তনের কাজের মধ্যেই মাঝে মাঝে এরূপ আত্মনিরীক্ষণ করা বিশেষরূপে বাঞ্ছনীয়। গ্রামবাসীদের অবসর সময়টুকু কাজে লাগিয়ে খাদি কাজের মাধ্যমে ছয় আনা, আট আনা পয়সা মজুরি হিসাবে কাটুনীদের দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু এ তো সাময়িক সাহায্য ছাড়া আর কিছুই নয়। হয়ত রাষ্ট্রশক্তির নিয়ন্ত্রণক্ষমতা নিজেদের হাতে এলে বাইরের কাপড়ের কলগুলিকে ধীরে ধীরে বন্ধ করে দিয়ে চরখায় কাটুনি ও তাঁতিদের সর্বসময়ের জন্য কাজের ব্যবস্থা

১. Khadi—Why & How, p. 187.

করা সম্ভব। কিন্তু এখন যেটুকু করা হচ্ছে তা যথেষ্ট নয়। দেখতে হবে সুতা কাটা ছাড়া আর কি কি কাজের ব্যবস্থা করা যায় যাতে করে আমাদের গঠনকর্মের ভিত্ আরও সুদৃঢ় হতে পারে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে খাদি উৎপন্ন করে তা বোম্বাই, কলকাতার ন্যায় বড় বড় শহরে বিক্রয়ের জন্য পাঠালেই আমাদের এই বৃহত্তর সমাজ পুনর্গঠনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না, তাতে যত উচ্চ মজুরিই কাটুনিকে দেওয়া হোক না কেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজী কর্মপদ্ধতির আমূল পুনর্গঠনের প্রস্তাব করলেন।

পরিশেষে, নব রূপায়ণের এই দুরূহ দায়িত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে কর্মীদের সমক্ষে গান্ধীজীর সেই অমোঘ বাণীর উল্লেখ করে আমরা এই প্রসঙ্গের শেষ করব। তিনি বললেন,

"সুতা কাটার তত্ত্ব জেনে বুঝে সুতা কাট। যারা সুতা কাটবে, তারা তা পরিধান করবে। যাঁরা খাদি পরবেন, তাঁরা যেন সুতা কাটতে ভুলে না যান।"

"সুতা কাটার তত্ত্ব জানার অর্থ এই যে, চরখা অহিংসার প্রতীক। চিন্তা করলেই এ সম্বন্ধে ধারণা সুস্পষ্ট হবে।"

"সুতা কাটা বলতে জমি হতে কার্পাস চয়ন, তুনাই, ধুনাই, পাঁজ করা, সুতা কাটা ও বয়ন করা পর্যন্ত সকল কর্ম বুঝায়।" [১]

চরখার প্রশ্নে তাঁর হৃদয় কী গভীরভাবে দগ্ধ হচ্ছিল নিম্নের উক্তিটিতে তার আভাস পাওয়া যাবে :

"চরখা সম্পর্কে আমার বিশ্বাস যদি কেবলমাত্র মূর্তিপূজায় পর্যবসিত হয় তবে হয় আপনারা আমার এই দেহ চরখার কাষ্ঠখণ্ডের দ্বারা ভস্মীভূত করুন নতুবা আমি স্বয়ং এই হাতে চরখায় অগ্নি প্রজ্বালন করব।" [২]

১. Economics of Peace, p, 189

২. Khadi—Why & How, p. 173

স্বাধীনতার পরে খাদি

স্বাধীনতার পরে খাদির কাজের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে পুনরায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন হয়েছে। সরকার খাদি ও গ্রামশিল্পের উন্নতিকল্পে, প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদন অনুযায়ী ১৯৫৩ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে অখিল ভারত খাদি ও গ্রামশিল্প বোর্ড স্থাপিত করেন। পরে শাসনতান্ত্রিক সুবিধা ও কাজের প্রগতিবিধানের দৃষ্টিতে একটি আইনসম্মত কমিশন গঠন করা হয়—অখিল ভারত খাদি ও গ্রামশিল্প কমিশন, ১৯৫৭ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে। খাদি কমিশনই প্রকৃত প্রস্তাবে খাদি বোর্ডের পরামর্শ ও প্রস্তাব অনুযায়ী কার্যকরী সমিতিরূপে বিভিন্ন পরিকল্পনা কার্যে রূপায়িত করে।

কমিশন সর্বভারতীয় ভিত্তিতে বিশেষ করে খাদি কার্যক্রমের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। খাদি ব্যতীত কমিশনের আওতায় বর্তমানে এই ১৪টি গ্রামশিল্প রয়েছে :

(১) মধুমক্ষিকা, (২) কুটির দিয়াশলাই, (৩) মৃৎশিল্প, (৪) অভোজ্য তেল হতে সাবান, (৫) চর্মশিল্প, (৬) তেলঘানি, (৭) হস্তনির্মিত কাগজ, (৮) গুড় ও খান্দ্‌সারী, (৯) তাল ও খেজুর গুড়, (১০) ধান ও শস্য কুটাই—ঢেঁকি, (১১) রেশা শিল্প (Fibre), (১২) কর্মকার ও ছুতার (চরখা ও সরঞ্জামাদি উৎপাদনের জন্য), (১৩) গোবর গ্যাস ও (১৪) কুটির চূণা-পাথর উৎপাদন।

ভারতে বর্তমানে মোট ৫,৬৪,৭০০ গ্রামের মধ্যে এক লক্ষের কিছু বেশী গ্রামে চরখা ও খাদির প্রচলন হয়েছে। তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে খাদি ও গ্রামশিল্পের খাতে সরকারী বরাদ্দের পরিমাণ নিম্নরূপ :

				মোট বরাদ্দের
প্রথম পরিকল্পনা	—	১৪'৮২ কোটি টাকা	—	০'৪৪%
দ্বিতীয় পরিকল্পনা	—	৮৪'০০ "	—	১'২৪%
তৃতীয় পরিকল্পনা	—	৯২'৪ "	—	০'৭৮%

অন্য কথায় বলা যায়, তিনটি পরিকল্পনায় মোট ২১,৯১০ কোটি

টাকার বরাদ্দের মধ্যে খাদি ও গ্রামশিল্পের জন্য বরাদ্দের পরিমাণ ১৯১'২২ কোটি টাকা ; অর্থাৎ, প্রায় ০.৮৭%।

খাদির উৎপাদন (সিল্ক, পশম এবং তুলা) ১৯৫৩-৫৪ সালে যেখানে ছিল ১১৫'৬৩ লক্ষ বর্গগজ, ১৯৬১-৬২ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৭৬২'০২ লক্ষ বর্গগজ হয়। অর্থাৎ, ছয়গুণের অধিক (৫৫৭%) উৎপাদন বৃদ্ধি। অপরদিকে, খাদিতে নূতন কর্মসংস্থানের অবস্থা ১৯৫৩-৫৪ সালে যেখানে ছিল ৩'৭৯ লাখ, ১৯৬১-৬২ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৭'৪৬ লাখ হয়। অর্থাৎ ৩৪০% অধিক বৃদ্ধি। ১৯৬১-৬২ সালে খাদি ও অন্যান্য গ্রামশিল্পে মিলিতভাবে ২৩'৬ লাখ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছিল, তন্মধ্যে ৭৪% জন খাদিতে নিযুক্ত ছিল।

উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিক্রয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৫৩-৫৪ সালে যেখানে বিক্রয় ছিল ১২৯'৯৮ লাখ টাকা, ১৯৬১-৬২ সালে তার পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮৭৭'৫৪ লাখ টাকা ; অর্থাৎ, নয় বছরে ১৪ গুণ বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এসবের সঙ্গে খাদি কাজে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও যথেষ্ট বেড়েছে। ১৯৫৩-৫৪ সালে ১৮৬টি সংস্থা ছিল, সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৬১-৬২ সালে দাঁড়ায় ১৪১৭টি।[১] অন্যান্য গ্রামশিল্পজাত দ্রব্যসমূহের উৎপাদন ও বিক্রয় ১৯৬১-৬২ সালে ছিল যথাক্রমে ২৬১৯'৬৩ লাখ টাকা এবং ২১০৮'৮১ লাখ টাকা।[২] উৎপাদনের পরিমাণ সম্বন্ধে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় নাই।

সুতরাং উপরিউক্ত সংখ্যাগুলি হতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, পূর্বের তুলনায় পরিকল্পিত প্রগতির যুগে খাদি ও অন্যান্য গ্রামশিল্পের উৎপাদন, বিক্রয় প্রভৃতি বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনা কাল শুরু হবার সময় হতে খাদি কমিশনের পূর্বের কার্য-ধারার পরিবর্তন করে খাদি ও অন্যান্য পল্লীশিল্পের কার্যক্রমকে নূতন

১. উপরিউক্ত সংখ্যাগুলি খাদি কমিশনের প্রকাশিত 'A Decade of Efforts for the Promotion of Khadi and Village Industries'—Khadi Gramodyog-Ma?, 1963 হতে গৃহীত।

২. Khadi World—Dec, 1962

পথে মোড় ঘোরাবার প্রচেষ্টা লওয়া হয়েছে। এই পরিবর্তিত কার্যধারার নামকরণ করা হয়েছে 'নয়া মোড়', অর্থাৎ নূতন পথে মোড় লওয়া। 'নয়া মোড়' পরিকল্পনার মর্মকথা এই যে, খাদি ও পল্লীশিল্পগুলির পরিচালনা বিচ্ছিন্নভাবে না করে সমগ্র পল্লীজীবনের ও গ্রামীণ অর্থনীতির একটি অচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে চালিত করতে হবে। অর্থাৎ, গান্ধীজী 'চরখার নব সংস্করণের' প্রস্তাব দ্বারা খাদিকর্মে যে যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধনের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন, কমিশন দশ বৎসরের কর্ম পরিচালনার পরে সেই পথে পদক্ষেপ করবার সংকল্প নিয়েছে 'নয়া মোড়' কার্যক্রমের মাধ্যমে। সমগ্র গ্রামীণ জীবন ও অর্থনীতিতে গতিবেগ সঞ্চারের উদ্দেশ্যে এবং গ্রাম-বাসীদের চিন্তায় গ্রামপরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করাই হবে পরবর্তী কালের খাদি গ্রামোদ্যোগ আন্দোলনের মুখ্য কর্মধারা। চরখা কিংবা অন্য দুই একটি গ্রামশিল্পের মাধ্যমে গ্রামের কিছু লোক জীবিকা অর্জন করবে। অবশিষ্ট গ্রামের বৃহত্তর অংশের সঙ্গে এই কার্যক্রমের কোন সংযোগ থাকবে না বা সমগ্র গ্রাম উন্নয়ন কার্যসূচীতে খাদি গ্রামোদ্যোগের জন্য কোন নির্দিষ্ট স্থান চিহ্নিত করা হবে না। সেক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন ভাবে এই সব পল্লী-শিল্পের প্রাণবায়ু কতদিন টিঁকে থাকবে ? উত্তর হচ্ছে, সমগ্র গ্রামের তরফ হতে পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে। এই পরিকল্পনা হবে কৃষি-গ্রামশিল্পপ্রধান। তবেই না গ্রামের অর্থনৈতিক কাঠামোয় গ্রামশিল্পের স্থান সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে, সমগ্র গ্রামের আর্থিক কর্মধারার সঙ্গে খাদি-গ্রামোদ্যোগের এক অচ্ছেদ্য বন্ধন সৃষ্টি হবে। আর তাই হবে গ্রামীণ অর্থনীতিকে বাঁচাবার পথ। নয়া মোড় পরি-কল্পনার এই লক্ষ্য। তজ্জন্য ৫০০০ জনসংখ্যা বিশিষ্ট এক একটি সঙ্ঘবদ্ধ গ্রাম-এলাকায় ইহা কার্যকরী করা হবে। এইরূপ এলাকার নাম দেওয়া হয়েছে 'গ্রাম একাই'। কর্মপন্থা এইরূপ হবে যে, সমগ্র একাই এলাকায় প্রাথমিক সমীক্ষার দ্বারা গ্রামের সকল প্রকার সম্পদ, জনসংখ্যা ও কর্মের পরিকল্পনা হবে, যাতে প্রতিটি গ্রাম-একাইয়ের প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যক দ্রব্যসমূহের উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা স্থানীয়

ভিত্তিতেই করা সম্ভব হয়। গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের জন্যও এই কার্যক্রম বিশেষ ফলপ্রসূ হতে পারে। তৃতীয় পরিকল্পনা কালে সমগ্র দেশে এরূপঃ ৩০০০ গ্রাম-একাই তৈরির লক্ষ্য স্থির হয়েছে।

এ সব হল খাদির আদর্শ তথা বিচারের বহিরঙ্গের দিক। কিন্তু বাইরের এই আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে কি দেশের অর্থনীতিতে খাদি-গ্রামশিল্পের প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় হয়েছে? জনমানসে কি খাদি মনোভাব বেড়েছে? গ্রামীণ অর্থনীতি কি যথাসম্ভব স্বাবলম্বী স্বাধীন হতে পেরেছে? এই মানদণ্ডগুলি পূর্ণ না হলে আমরা কখনই বলতে পারি না যে, গান্ধীজীর কল্পিত চরখা গ্রামস্বরাজ স্থাপনের অভিমুখে এগিয়ে চলেছে। এই মৌলিক সমস্যা সমূহের সমাধানের জন্য আমাদের গভীর মনোযোগ দিতে হবে।

ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, বাদশাহী আমলে নগরাঞ্চলে অনেক রাষ্ট্রনৈতিক আলোড়ন-বিলোড়ন ঘটলেও গ্রামগুলির স্বাধীন সত্তায় কোনরূপ সরকারী হস্তক্ষেপ হয়নি। ইংরেজ আমলে দেশ পরাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামশিল্প সমূহকে ধ্বংস করে গ্রামগুলিকেও সরকারের উপর নির্ভরশীল করা হল। অর্থাৎ, দেশ পরাধীন, গ্রামও পরাধীন। আর আজ কি হয়েছে? বিনোবাজী বলেন যে, দেশ স্বাধীন হওয়া সত্ত্বেও গ্রামগুলির আর্থিক স্বাধীনতা আসেনি। সুতরাং গ্রামের আর্থিক স্বাতন্ত্র্যের কার্যক্রম গ্রহণ করাই হবে বর্তমানে খাদি-গ্রামশিল্পের প্রধান লক্ষ্য। খাদির মূলতত্ত্বটি হল স্বাধীনতা, পরমুখাপেক্ষিতা বা দাসত্ব নয়। কিন্তু আজ খাদির মর্যাদা কোথায় নেমে এসেছে? বিভিন্ন পৌরপ্রতিষ্ঠান ও সরকারী সংগঠনে অধস্তন কর্মচারীদের জন্য খাদির ব্যবহার বাধ্যতা-মূলক করা হয়েছে। এর অর্থ কি এই নয় যে, খদ্দরধারী অধস্তন পিয়ন বা আর্দালী মিল-পোশাকে সজ্জিত অফিসারদের কুর্নিশ ঠুকবে প্রতি পদে? খাদির পক্ষে এই ব্যবস্থা কি মর্যাদাসূচক? অবশ্য আইনের দ্বারা সকল কর্মচারীকে আবশ্যিক ভাবে খাদি ব্যবহারে বাধ্য করা ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিপন্থী কাজ। কিন্তু শুধু অধস্তন কর্মচারীদের বেলাতেই এ নিয়মের ব্যতিক্রম কেন?

সরকারের কর্তব্য হল প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তির জন্য কাজের সংস্থান করা। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, সরকারী রিবেট, সাবসিডি ইত্যাদি প্রদানের ফলে খাদির বিক্রয় বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিকই। আর অধিক কাল খাদির প্রগতিকে এভাবে রিবেট-সাবসিডির মোহজালে আবদ্ধ করে রাখা খাদির সুষ্ঠু বিকাশের পক্ষেই ক্ষতিকারক হবে বলে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের অভিমত। সেজন্য, বিক্রয়ের উপর রিবেট দানের পরিবর্তে বিনোবাজী প্রস্তাব করেছেন যে, দেশের বর্তমান অবস্থায় প্রায় ত্রিশ কোটি লোক আছে যাদের জন্য মাথাপিছু ১২ গজ বস্ত্রের বুনাই খরচ রেহাই দিলে ৩৬০ কোটি গজ কাপড় বুনাই-ব্যয় হতে মুক্ত হবে। রিবেটের বদলে বুনাই-ব্যয়মুক্ত করার এই প্রস্তাব বর্তমানে বিবেচিত হচ্ছে। প্রকৃত উদ্দেশ্য এই হওয়া উচিত যে, সরকারী সহায়তা যথাসম্ভব কম নিয়ে জনসাধারণ চলার চেষ্টা করবে। রাষ্ট্রশক্তি এইভাবে ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হতে থাকবে। সত্যিকারের জনগণের জন্য যে সরকার—তার লক্ষ্যও এই হওয়া উচিত। উপরন্তু, সম্প্রতি দেশে চীনা আক্রমণ জনিত যে সংকটজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তাতে রিবেট ব্যয় হতে সরকারকে অব্যাহতি দেওয়া সম্ভব হলে বলা যাবে যে, দেশের এই অবস্থায় খাদি তার যোগ্য কাজই করেছে।

আসল কথা, গ্রামসরকারের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই খাদির বিচার হওয়া উচিত। ভূমিসমস্যা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সমস্যাগুলির সমাধান যদি সরকারী হস্তক্ষেপ ব্যতীতই করা যায় তবে তা হবে গ্রামস্বরাজ স্থাপনের পথে একটি বিরাট্ পদক্ষেপ। আর গ্রামস্বরাজের ক্ষেত্রে সরকারী সহায়তার উপর নির্ভরশীল না হয়েই খাদির নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা উচিত। এই কাজের নৈতিক দিকটিও এর বাস্তব দিকের ন্যায় সমান জরুরী। যদি মিলের উপর ট্যাক্স বসিয়ে পাওয়া সরকারী সাহায্যের উপর নির্ভর করে খাদিকে অগ্রসর হতে হয় তবে তা জাতীয় অর্থনীতি এবং মনস্তত্ত্বের দিক হতে নিদারুণ ক্ষতিকর হবে—এইরূপ মন্তব্য আচার্য বিনোবা করেছেন নবদ্বীপে সর্বভারতীয় খাদিকর্মীদের জন্য আহূত এক সভায় (৫ই-

৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩)। উক্ত সভাতেই তিনি ত্রিমুখা কর্তব্যকর্মের নির্দেশ দিয়েছেন—

(১) খাদির কাজকে পুনর্বিন্যস্ত করা,

(২) খাদিকে সর্বসাধারণের করে তোলা,

(৩) খাদিকে আত্মনির্ভরশীল করার জন্য দৃঢ় সংকল্প নিয়ে অন্তিম প্রচেষ্টা চালানো।

"খাদির কাজে নিযুক্ত কর্মীদের এই প্রেরণাকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করে খাদিকে তার স্বাধীনতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার সংকল্পকে শেষবারের মত গ্রহণ করা উচিত। খাদিকে হয় আত্মনির্ভরশীল হতে হবে, নয় তো তাকে চিরদিনের মত বিদায় নিতে হবে। গ্রামসমাজে খাদি হল রাম, ভূদান সীতা, নয়ী তালিম লক্ষ্মণ আর শান্তিসেনা হনুমান।" [১]

১. নবদ্বীপ ভাষণ—বিনোবা

অষ্টম অধ্যায়

সর্বোদয় সমাজে যন্ত্রের স্থান

যন্ত্রের স্বরূপ ও ব্যবহার

১৯০৯ সালে যখন তাঁর যুগান্তকারী পুস্তিকা 'হিন্দ্ স্বরাজে' গান্ধীজী আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা তথা তার আনুষঙ্গিক উপাদান-গুলির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করলেন তখন হতেই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল দুনিয়ার নানা প্রান্তে। আধুনিক সমাজের যন্ত্রের প্রতি উন্মত্ততার বিরুদ্ধে গান্ধী যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন ওই বইয়ে, তার জন্য তাঁকে প্রচুর ধিক্কার, পরিহাস-উপহাস ও বিদ্রূপের সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু ভারতের মানুষ হয়ে, ভারতীয় অবস্থার পরিবর্তন সাধনে ব্রতী হয়ে গান্ধীজী যন্ত্র, শিল্পায়ন প্রভৃতি সম্বন্ধে যে পথের কথা বলেছিলেন তা কি গ্রহণযোগ্য নয়? কালের বিচারে সেই পথ ও নীতিই বরং বৈজ্ঞানিক ও বাস্তব অর্থনীতিসম্মত বলে বিবেচিত হচ্ছে। আমরা ঘোর অবিচার করি যখন বলি যে, গান্ধীজী যন্ত্রমাত্রেরই বিরোধী ছিলেন। সেইজন্য তিনি যন্ত্র ও তার ব্যবহার সম্বন্ধে ঠিক কী ধারণা পোষণ করতেন আর কেনই বা তা করতেন সে সম্বন্ধে সম্যক্‌রূপে অধ্যয়নের পর মন্তব্য করা শ্রেয়। গান্ধীজী রেলগাড়ী, মোটর গাড়ী প্রভৃতি বৃহৎ যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করতেন, কিন্তু ঢেঁকি, ঘানি, চরখা, তাঁত প্রভৃতি গ্রামশিল্পের স্থলে বৃহৎ শিল্পের প্রবর্তনের ঘোর বিরোধী ছিলেন। এই বিরোধিতার পিছনের যুক্তিটি জানলে আমাদের সন্দেহ ও সংশয়ের ছায়া দূরীভূত হবে। গান্ধীজীর চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য নিহিত রয়েছে এতে।

কোন কিছু উপাদান যে উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় তার উপরেই নির্ভর করে সেই দ্রব্য বা উপাদান ভাল কি মন্দ। সৎ উদ্দেশ্যের জন্য প্রযুক্ত হলে তাকে উত্তম বলা হয়। আর ক্ষতিকর কোন কাজে তা ব্যবহৃত হলে তাকে আমরা খারাপ বলি। যেমন, একটি ছুরি যদি

কোন কিছু হত্যা করার কাজে ব্যবহৃত হয় তবে তা হবে হিংসাত্মক অস্ত্র। আর সেই ছুরিই যদি ফল কাটার কাজে প্রযুক্ত হয় তবে তাকে আর হিংসাত্মক বলা যাবে না। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরক পদার্থ সমূহ যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে ধ্বংসাত্মক কাজে নিয়োজিত করা যায়, তেমনই তাকে নিয়োজিত করা যায় কোন পার্বত্য পথ কাটায়, কূয়া, বাঁধ ইত্যাদির নির্মাণকার্যে, খনির কাজে। যন্ত্রের ক্ষেত্রেও ঠিক এই সর্বজনীন সহজ নিয়ম প্রয়োগ করা যায়। কোন যন্ত্রের প্রবর্তনের ফলে যদি শোষণ পূর্বাপেক্ষা অধিক হয় তবে তা সমাজের পক্ষে কল্যাণজনক নয়। অপরদিকে, যন্ত্রের প্রবর্তনের ফলে যদি উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, শোষণ না করে যন্ত্র উৎপাদকের দক্ষতা বৃদ্ধি করে, তবে সেই যন্ত্র আমাদের পক্ষে গ্রহণীয়। সেইজন্য যন্ত্র কি যন্ত্রবর্জন, প্রশ্ন তা নয়। প্রশ্ন হল, যন্ত্র ব্যবহারের ফলে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণবৃদ্ধি হল কিনা। যন্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই মানদণ্ড গ্রহণ করার কথাই গান্ধীজী বলেছেন।

যন্ত্র ব্যবহারের এই বিভিন্নতার জন্য আচার্য বিনোবা সাধারণতঃ তিনপ্রকার যন্ত্রের উল্লেখ করেছেন: (১) সময়সাধক, (২) সংহারক ও (৩) উৎপাদক।

(১) ট্রেন ও বিমান যন্ত্রের দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি না হলেও সময় বাঁচে। দশহাজার ঘোড়াও একত্রে একটি বিমানের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারে না। তাই আমরা এরূপ যন্ত্র চাই।

(২) কামান, বন্দুক, বোমা প্রভৃতি সংহারক যন্ত্রের স্থান অহিংস সর্বোদয় সমাজে নাই।

(৩) উৎপাদক যন্ত্র আবার দুই প্রকারের হয়: পূরক ও মারক। যেখানে লোকসংখ্যা অধিক এবং যন্ত্রের প্রবর্তনে লোকে বেকার হয়ে যায়, যন্ত্র সেখানে মারক। কিন্তু যেখানে লোকংসখ্যা কম এবং কাজের পরিমাণ অধিক, সেখানে সেই যন্ত্রই পূরক। ভারতের ন্যায় জনবহুল দেশে ট্রাক্টর চাষ শুরু হলে কৃষিজীবীদের মধ্যে বেকারত্ব প্রচণ্ডভাবে বাড়বে। কিন্তু আমেরিকা বা রাশিয়ায় ট্রাক্টর মারক যন্ত্র নয়, উৎপাদক বলে তা গণ্য হবে। সেইজন্য যন্ত্রের উপযোগিতা

অনুসারে তা গ্রহণ বা বর্জন করা বিধেয়। যন্ত্র বলেই যন্ত্রের উপর কোনপ্রকার আসক্তি রাখা অন্যায়।

গান্ধীজী যন্ত্র মাত্রেরই বিরোধী নন

নানা জন নানা সময়ে গান্ধীজীকে যন্ত্র ও তার ব্যবহার, যন্ত্রের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী প্রভৃতি বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। সেই সব প্রশ্নোত্তর অনুধাবন করলে যন্ত্র সম্বন্ধে গান্ধীজীর মূল বক্তব্যটি স্পষ্ট বুঝা যাবে। এই উদ্দেশ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে এই আলোচনায় বিস্তৃত উদ্ধৃতি দেবার প্রয়োজন অনুভব করেছি।

"আপনি কি সকল যন্ত্রেরই বিরোধী ?"

এই প্রশ্নের জবাবে গান্ধীজী জোরের সঙ্গে বললেন, "কখনই নয়; কিন্তু এর নির্বিচার সম্প্রসারণের বিরোধী। যে সকল সহজ সরল যন্ত্রপাতি ব্যক্তি মানুষের শ্রম বাঁচায় এবং লাখ লাখ কুটিরে কর্মরত কারিগরদের বোঝা হালকা করে, আমি সেই সকল যন্ত্রপাতি সমর্থন করি।" (ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৭-৬-'২৬)

আরও পরিষ্কার করে বলেছেন, 'আমি যন্ত্র মাত্রেরই বিরোধী নই। যন্ত্রের প্রতি এই উন্মত্ততার বিরোধী।'[১] শ্রমলাঘবকারী যন্ত্ররূপে যা পরিচিত, সেরূপ উন্মত্ততার বিরোধী। মানুষ শ্রম লাঘব করতে করতে এমন অবস্থায় পৌঁছায় যখন হাজার হাজার ব্যক্তিকে কর্মহীন করে খোলা রাস্তায় অনাহারে মরবার জন্য ঠেলে দেওয়া হয়। আমি কেবলমাত্র অল্প কিছু সংখ্যকের জন্য নয়, বরং সকলের জন্যই সময় ও শ্রম কমাবার পক্ষপাতী। আজকাল যন্ত্র অল্প কয়েক ব্যক্তিকে বহু লোকের কাঁধে চড়বার সুযোগ করে দেয়। শ্রম কমাবার কোন সদিচ্ছাবশতঃ নয়, লোভই এর প্রকৃত কারণ। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই আমি আমার সময় শক্তি দিয়ে লড়াই করছি।"

[Young India, 13.11.'24]

১. **'What I object to is the craze for machinery, not machinery as such.'**

যন্ত্রকেন্দ্রিত বহুল উৎপাদন প্রথার ফলে আজ জনবহুল দেশে কর্মহীনতা ব্যাপকভাবে দেখা যাচ্ছে। সেজন্য কর্ম লাঘব করার বদলে সকলের কর্মের সংস্থান করাই হবে আজিকার প্রধান প্রশ্ন। গান্ধীজীর সংগ্রাম ছিল মানুষের হাত হতে কাজ কেড়ে নেয় ও তাকে অনাহারে রাখে এমন যন্ত্রের বিরুদ্ধে। বিজ্ঞানাচার্য আইনস্টাইনও অকপটে স্বীকার করেছেন, "অর্থব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণের ফলে এক অভিনব সমস্যা এসেছে। যন্ত্রবিদ্যার প্রগতি সকলের কর্ম সংস্থানের বদলে অধিকতর মাত্রায় বেকার সৃষ্টি করে।" যন্ত্র মানুষের সেবা করবে। মানুষকে বেকার করে অসহায় করবে এমন যন্ত্র কারুর কাম্য নয়। গান্ধীজীর দৃষ্টিতে তাই 'ব্যক্তিই প্রধান বিবেচ্য বিষয়'।[১] সেজন্য মানুষই ছিল তাঁর সকল চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু। মানুষের কল্যাণ করাই ছিল তাঁর জীবনের স্বপ্ন।

"যন্ত্রের কুনীতিগুলি বাদ দিয়ে তার ভালটুকু গ্রহণের কথা আপনি বলেন না কেন?" এই প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বললেন, "মানুষরূপী জীবন্ত যন্ত্রকে অলস, অচল করে রাখতে পারি না। আমাদের এত বেশী পরিমাণ মানবশক্তি বেকার হয়ে আছে যে শক্তিচালিত অন্য কোন যন্ত্রের স্থান হওয়া সম্ভব নয়।"[২]

এখানেও দেখা যায় মানুষের কল্যাণচিন্তাই তাঁকে সর্বদা অনুপ্রাণিত করে রেখেছে।

কোন এক প্রশ্নকর্তা তাঁকে যখন জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি তা হলে যন্ত্রযুগের বিরোধী দেখছি", তার উত্তরে তৎক্ষণাৎ গান্ধীজী বললেন—

"এ কথা বলার মানে আমার মতামতের বিকৃত অর্থ করা। আমি এমনিতে যন্ত্রের বিরোধী নই; কিন্তু যন্ত্র যখন আমাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে তখন আমি এর ঘোর বিরোধী।"[৩]

১. Young India, 13. 11, '24.

২. Harijan, 7. 12. '35

৩. Harijan, 27. 2. '37

বিজ্ঞান ও যন্ত্র

গান্ধীজী যন্ত্রের বিরোধী হয়ত নন, কিন্তু তিনি বোধহয় অতিসাধারণ সেকেলে কিছু যন্ত্রপাতি পল্লীশিল্পীদের হাতে দিতে চান। আধুনিক উন্নত যন্ত্র বোধহয় তাঁর কল্পনাবিরোধী। এরূপ নানা আলোচনাও অনেকের মনে ওঠে। গান্ধীজীর পরিষ্কার বক্তব্য এই যে, "কুটির যন্ত্রের ক্ষেত্রে যে কোন প্রকার উন্নতিই আমি অভ্যর্থনা করব। কিন্তু আমি জানি যে, হস্তশ্রমকে স্থানচ্যুত করে শক্তিচালিত ট্রাক্টর প্রবর্তন নিশ্চিতই অন্যায় হবে, যদি না কর্মচ্যুত লাখ লাখ কৃষককে নিজগৃহে বিকল্প কোন কাজের দায়িত্ব দেওয়া যায়।"[১] আরও পরিষ্কার করে বললেন, "সর্বসাধারণের কল্যাণে নিয়োজিত সকল যান্ত্রিক উন্নতিরই আমি প্রশংসা করি।"[২] ['I would prize every invention made for the benefit of all'.]

সুতরাং বলা যায় যে, যান্ত্রিক প্রগতিমাত্রের প্রতিই তাঁর জাতক্রোধ ছিল না। কিন্তু উন্নতির নামে শোষণের ফাঁদ বিস্তৃত হওয়াতে ছিল তাঁর আপত্তি। এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞান ও যন্ত্রের পারস্পরিক সম্বন্ধ কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন। গান্ধীদর্শন বিজ্ঞান-বিরোধী নয়। বিজ্ঞান এক জিনিস, যন্ত্র আর এক জিনিস। যন্ত্র কিভাবে ব্যবহৃত হবে তা বিজ্ঞানের বিচার নয়। লোকসংখ্যা ও সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে অথবা দেশ, কাল ও পরিস্থিতি অনুসারে কোন্ যন্ত্র ব্যবহার করা সঙ্গত তা স্থির করা হবে। আজ যে যন্ত্র এক দেশে প্রচলিত অন্য দেশে সেই যন্ত্র উপযুক্ত নাও হতে পারে। বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যা দুই পৃথক্ বস্তু। এ সম্পর্কে তাই নূতন চিন্তার সময় এসেছে।

বর্তমান যুগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে সব জটিল যন্ত্র চালু আছে তা নিয়ন্ত্রিত করা কঠিন। "তবে কি সকল শক্তিচালিত যন্ত্রই বরবাদ হয়ে যাবে?" এরূপ প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন, "তা হতে পারে।

১. Young India, 5. 11. '25

২. Harijan, 22- 6- '35.

কিন্তু একটি কথা পরিষ্কার করতে হবে।...বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহকে সর্বপ্রথম লোভের কবল হতে মুক্ত করুন।" ১

সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বললেন, "ব্যতিক্রমও থাকবে। সিঙ্গার সেলাই কলের কথা ধরুন। মানুষের অতি প্রয়োজনীয় জিনিসের মধ্যে এ অন্যতম। স্ত্রীর ক্লান্তিকর শ্রমের দুর্দশা দেখেই সিঙ্গার সাহেব এই কল তৈরি করলেন। তাই এর মূলে আছে ষোল-আনা মানব-প্রেম।"

"কিন্তু সিঙ্গার মেশিন তৈরির জন্যও তো কারখানা চাই? তা যদি হয় তো শক্তিচালিত যন্ত্রও থাকবে।"—শ্রীরামচন্দ্রনের এই বক্তব্যের উত্তরে গান্ধীজী বললেন, "হ্যাঁ, কিন্তু আমি একজন সমাজবাদীর ন্যায় এতটুকু মানতে রাজী যে, এই সকল কারখানা রাষ্ট্রায়ত্ত হবে। এগুলি অতি সুন্দর ও আদর্শসম্মত ব্যবস্থায় চালিত হবে। লোভের জন্য নয়, মানবতার কল্যাণের নিমিত্ত। লোভের বদলে প্রেম স্থাপন করুন, বাকী সব ঠিক হয়ে যাবে।" ২

অতি মূল্যবান কথা। বিজ্ঞানের উন্নতিকে স্বাগত জানিয়ে তার আনুষঙ্গিক কুফলগুলি বর্জনের নিমিত্ত গান্ধীজীর এই মহান্ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে।

উৎপাদন পদ্ধতি

কোন অনুন্নত দেশের আর্থিক উন্নতি সাধন সর্বাপেক্ষা জরুরী প্রশ্নরূপে দেখা দেয়, বিশেষ করে সেই দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পর। শিল্পোন্নয়নের জন্য সাধারণতঃ আমরা প্রচলিত বৃহৎ কেন্দ্রিত শিল্প প্রতিষ্ঠার কথাই কল্পনা করি। কিন্তু পূর্বের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, দেশ, কাল, পরিস্থিতি অনুসারে প্রতিটি দেশের শিল্পোন্নয়নের পথ নির্ধারিত হওয়াই যুক্তিসম্মত পন্থা।

গান্ধীজীও শিল্পোন্নয়নের কথা নিশ্চয়ই কল্পনা করেছিলেন। কিন্তু

১. Young India, 13' 11. '24

২. তদেব

তা গতানুগতিক পন্থা হতে পৃথক্। নির্বিচারে যন্ত্র ব্যবহারের যেমন তিনি ছিলেন বিরোধী, তেমনি বিচারবুদ্ধিশূন্য হয়ে সকল কিছুর উৎপাদনের জন্যই কেন্দ্রিত বৃহৎ শিল্পায়নের মামুলি পথের 'মুখাপেক্ষী হওয়ারও বিরোধী ছিলেন। তবে গান্ধীজী কি প্রকারের শিল্পায়নের পথ চিন্তা করতেন?

"আপনি কি ভারতকে শিল্পায়িত করতে চান না?" এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, "নিশ্চয়ই চাই, কিন্তু তা আমার ধারণা মাফিক হতে হবে।"[১] এই ধারণা প্রচলিত ধারণা হতে পৃথক্। গান্ধীজী চাইতেন, বর্তমানের অতি প্রচলিত বৃহৎ শিল্পের বহুল উৎপাদন পদ্ধতির স্থলে বহুর দ্বারা উৎপাদন। অর্থাৎ, উৎপাদন পদ্ধতির বিকেন্দ্রীকরণ। উৎপাদন পদ্ধতিতে এই মৌলিক পরিবর্তন সাধনের জন্য গান্ধীজী খাদি ও গ্রামশিল্প আন্দোলনের ব্যাপক প্রসারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। কেন না, কেন্দ্রিত উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থাই সমাজে শোষণের সৃষ্টি করে। আর শিল্পোন্নত জাতিগুলি যখন অনুন্নত জাতিকে শোষণের জন্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয় তখন হিংসার উদ্ভব হয় ও পরিণামে যুদ্ধ দেখা দেয়। অতএব যুদ্ধমুক্ত, হিংসা-শূন্য অহিংস বিশ্বসমাজ গঠনের জন্য এইরূপ শোষণহীন বিকেন্দ্রিত উৎপাদন পদ্ধতি একান্তরূপে আবশ্যক। বহুর দ্বারা উৎপাদন প্রথার অর্থ এই যে, উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত কর্মবৃদ্ধি।

গান্ধীজী কেবলমাত্র উৎপাদন বৃদ্ধিই চাইতেন না। বর্ধিত উৎ-পাদনের ফলে যেন অধিকতর সমতাভিত্তিক বণ্টন ব্যবস্থাও সূচিত হয় এও তাঁর কাম্য ছিল। আর্থিক প্রগতির সঙ্গে সামাজিক সমতারও গতি সমতালে এগিয়ে যাওয়া চাই। সেজন্য কয়েকটি শহরাঞ্চলে শিল্পায়নের গতিকে সীমায়িত না রেখে গান্ধীজী সমগ্র দেশে শিল্পায়নকে বিস্তৃত করার কথা বলতেন। এইভাবে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে থাকা শিল্পীদের ব্যক্তিগত উৎপাদন যদি হাজার গুণ বেড়ে যায় তবে তাতে কি বহুল উৎপাদন বুঝায় না? উৎপাদনকে কয়েকটি স্থানে কেন্দ্রীভূত করার ফলে সুন্দর

১. Harijan, 27.2.'37

বণ্টন ব্যবস্থার জন্য পুনরায় উল্টা পথে ঘুরতে হবে। কিন্তু এই জটিল ব্যবস্থার স্থলে যদি যেখানে প্রয়োজন সেখানেই দ্রব্যের উৎপাদন ও বণ্টন নিয়ন্ত্রিত করা হয় তবে এর ফলে সমাজের মূল অর্থব্যবস্থা স্ব-নিয়ন্ত্রিত হয়, বাইরের মুনাফা ও ফাটকাবাজির সম্ভাবনা বহুলাংশে দূরীভূত হয়। উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা এইভাবে স্থানীয় ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়ার আরও সুবিধা এই যে, চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে সমতা রক্ষিত হয়; যে কোন সময়ে যে কোন কারণে উৎপাদকবৃন্দ দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করবার সুযোগ পায় না; বর্তমানের ন্যায় ভেজাল মিশাবার সম্ভাবনা থাকে না। পরিণামে, বর্তমানের ন্যায় প্রচুর সরবরাহ থাকা সত্ত্বেও মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ীর কারসাজিতে কালোবাজারী প্রভৃতি সমাজবিরোধী ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধি পায় না বা প্রাচুর্যের মধ্যে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি হতে পারে না। মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে বহুল উৎপাদন প্রথা সেইজন্য হিতকর নয়।

"উৎপাদন ও বণ্টন মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার জন্যই কি আপনি যন্ত্রের বিরোধী?" এইরূপ এক প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বললেন, "হ্যাঁ, আপনার কথা ঠিক। আমি কোনপ্রকার বিশেষ সুবিধার নীতি এবং একচেটিয়ার মনোভাবকে ঘৃণা করি। অপর সকলের সঙ্গে যা ভোগ করা যায় না তা আমার কাছে নিষিদ্ধ বস্তু। ব্যস্, এই যথেষ্ট।" [১]

উৎপাদন পদ্ধতির বিকেন্দ্রীকরণ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন, "মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে পুঁজি সীমাবদ্ধ থাকার বদলে ভারতের সাড়ে সাত লাখ গ্রামের আয়ত্তে তা থাকুক। এইটেই প্রয়োজন।"[২] সেজন্য উৎপাদনকে বিকেন্দ্রিত করে তাকে লোভের বদলে প্রয়োজনের মানদণ্ডে পরিচালিত করা প্রয়োজন। "তবে কি আপনি ভারতের আদর্শ ভবিষ্যৎ রূপায়ণে বহুল উৎপাদনের কথা চিন্তা করেন না?" গান্ধীজী বললেন, "বহুল উৎপাদন? হ্যাঁ, তা নিশ্চয়ই, কিন্তু জোরজবর-

---

১. Harijan, 2.11. '34

২. Young India, 23.3, '21

দস্তির সাহায্যে নয়। মোটের উপর চরখার মর্মবাণীও ত এই। এও বহুল উৎপাদন, কিন্তু তা জনগণের ঘরে ঘরে ব্যাপ্ত।" "ব্যক্তিগত উৎপাদনকে আপনি যদি এইভাবে বহুগুণে বাড়িয়ে চলেন তবে কি তাতে ব্যাপক উৎপাদন হবে না?" "কিন্তু আমি ভালভাবেই বুঝি যে, এই 'বহুল উৎপাদন' সম্পূর্ণরূপে একটি পারিভাষিক শব্দ। এর দ্বারা অতি জটিল যন্ত্রের সাহায্যে সর্বাপেক্ষা কম সংখ্যক ব্যক্তির চেষ্টায় উৎপাদন বুঝায়। আমি এ অন্যায় মনে করি।" [১]

এক সমাজবাদীর জিজ্ঞাসা

বৃহৎ যন্ত্র, বিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহার প্রভৃতি গান্ধীজী কতখানি সমর্থন করেন, এ সম্বন্ধে হামেশাই প্রশ্ন ওঠে। রেলগাড়ী, ছাপাখানা প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় বৃহৎ যন্ত্রের ব্যবহার বর্তমান সমাজে বর্জন করা যেখানে অসম্ভব, গান্ধীজীর কল্পিত সমাজে এগুলির স্থান হবে কিনা এরূপ সংশয় দূর হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। ১৯৩৫ সালে একজন সমাজবাদী বন্ধু গান্ধীজীর কাছে কতকগুলি প্রশ্ন নিয়ে উপস্থিত হন। তাঁদের মধ্যে যে প্রশ্নোত্তর হয় ওই বিস্তৃত প্রশ্নোত্তরটি অনুধাবন করলেই যন্ত্র সম্বন্ধে গান্ধীজীর বক্তব্য স্পষ্ট বুঝা যাবে।

সমাজবাদী প্রশ্ন করলেন, "আপনার গ্রামোদ্যোগ আন্দোলনে কি সকল যন্ত্রের বহিষ্কার বুঝায় না?" গান্ধীজী তখন সূতা কাটছিলেন। উত্তরে তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন, "এই চরখা কি একটি যন্ত্র নয়?"

সঃ—আমি এরূপ যন্ত্রের কথা বলছি না। বৃহৎ যন্ত্র সম্বন্ধেই আমার প্রশ্ন।

গাঃ—আপনি সিঙ্গার সেলাই কলের কথা বলছেন? তা ত গ্রাম-উদ্যোগ আন্দোলনে সংরক্ষণ পেয়েছে। আর এই দৃষ্টিতে যে কোন যন্ত্রেরই এই রক্ষাকবচ থাকবে যা মানুষকে তার শ্রমের সুযোগ হতে বঞ্চিত না করে বরং তার কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে; অপরদিকে, যে

১. Harijan, 2.11.'34

যন্ত্রের দাসত্ব স্বীকার করতে হয় না, খুশীমত যা ব্যবহার করতে পারা যায়।

সঃ—কিন্তু বড় বড় আবিষ্কার সম্বন্ধে আপনার মত কি? বিদ্যুৎ-শক্তির সঙ্গে কি আপনার কোন সম্পর্ক থাকবে না?

গাঃ—কে তা বলল? যদি গ্রামের প্রত্যেক কুটিরে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা যায়, তখন গ্রামবাসীরা এর সাহায্যে তাদের যন্ত্রপাতি চালাবে। এতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু তখন শক্তি-উৎপাদনের কেন্দ্রগুলি গ্রামসমাজ বা রাষ্ট্রের আয়ত্তে থাকবে, ঠিক যেমন গ্রামবাসীদের গোচারণভূমি থাকে।

সঃ—কিন্তু যেখানে বিদ্যুৎ বা কোন যন্ত্র নেই, সেখানে বেকার হাতগুলি কি করবে? আপনি কি তাদের কাজ দেবেন?

গাঃ—সকলের কল্যাণার্থে কৃত যে কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারেরই আমি প্রশংসা করি। কিন্তু তা সত্ত্বেও সকল আবিষ্কারই এক জিনিস নয়।… দৈহিক শ্রমে সাধ্যায়ত্ত নয় এরূপ জনকল্যাণমূলক বৃহৎ বৃহৎ যন্ত্রের স্থান নিশ্চয়ই থাকবে; কিন্তু সে সকলই হবে রাষ্ট্রায়ত্ত আর পুরাপুরি সকলের হিতকামী।

গান্ধীজী বলে চললেন, "কিন্তু আপনি একজন সমাজবাদী হয়ে যন্ত্রের নির্বিচার ব্যবহার সমর্থন করবেন না। ছাপাখানার কথা ধরুন। সেগুলি চলবে। শল্য চিকিৎসার যন্ত্রপাতির কথা ধরুন। কেউ তাঁর হাত দিয়ে কেমনভাবে এ সকল কাজ চালাবেন? আর এ সকলের জন্য বৃহৎ যন্ত্রের প্রয়োজন।" পরে তাঁর চরখাটি দেখিয়ে বললেন, "কিন্তু আলস্যরূপ রোগমুক্তির কাজে এই যন্ত্রটি ছাড়া অন্য কিছু তেমন ফলপ্রদ নয়। আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে বলতেও সূতা কাটছি। ফলে দেশের সম্পদ্ কিছু বাড়ছে। এই যন্ত্রকে সেইজন্য কেউ বাতিল করতে পারে না।"[১]

অপর এক উপলক্ষ্যে গান্ধীজী বলেন, "রেলগাড়ী, জাহাজ বা টেলিগ্রাফ এগুলির সঙ্গে আমার কোন ঝগড়া নাই। শিল্পবাদের

১. Harijan. 22. 6. '35

সমর্থন ছাড়াই পারে ত এগুলি চলবে। এইগুলিই শেষ নয়। রেলগাড়ী ও টেলিগ্রাফের জন্যও কোন রকম শোষণ বরদাস্ত করা হবে না।"[১]

উপরের আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, গান্ধীজী সর্বমানুষের কল্যাণমূলক আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি বর্জনের কথা বলেন নাই। বরং প্রয়োজন ও সম্ভব হলে গ্রামের কুটিরে বিদ্যুৎ প্রবর্তনের প্রস্তাবও তিনি সমর্থন করেছেন আজ হতে বহুকাল পূর্বে যখন ভারতের সকল বড় বড় শহরেও বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় নাই। কিন্তু গান্ধীজীর প্রতিবাদের মূল কারণটি আমাদের জানতে হবে। বৈজ্ঞানিক প্রগতিকে মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীর হাতে সঁপে সমাজের বৃহদংশ নির্বিবাদে তাদের শোষণ ও শাসন মেনে নেয়। গান্ধীজীর আপত্তি সেইখানে আর তাই ওই শোষণব্যবস্থার বিরুদ্ধে ছিল তাঁর সংগ্রাম। বিশেষ করে, মানুষের খাদ্য, বস্ত্রের ন্যায় অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমূহের উৎপাদন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে যদি শোষণের ব্যাপক সুযোগ থাকে তবে সে সমাজ সমতার পথে কখনও অগ্রসর হতে পারে না। গান্ধীজীর প্রতিবাদ এখানেই। তিনি বিজ্ঞানবিরোধী নন, যন্ত্রবিরোধী নন। তিনি ছিলেন শোষণ-বিরোধী, বৈষম্যবিরোধী, হিংসাবিরোধী। সেজন্য যন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর মোদ্দা কথা জানালেন, "সকল যন্ত্রের মূলোচ্ছেদ করাই আমার লক্ষ্য নয়। কিন্তু একে সীমায়িত করাই আমার কাজ।"[২]

যন্ত্রকে একেবারে বর্জন না করে প্রয়োজনমত মানবকল্যাণের সেবামূলক কাজে একে সীমায়িত রাখাই হবে যন্ত্রব্যবহারের মানদণ্ড। ছোট যন্ত্রের মধ্যেও বিজ্ঞান প্রযুক্ত হতে পারে বলে গান্ধীজী অবৈজ্ঞানিক ছিলেন না। বরং যন্ত্রব্যবহারের ক্ষেত্রে মানবসমাজের নিকট একটি নূতন মাপকাঠি নির্ণয়ের কাজই তিনি করেছেন।

গান্ধীজীর পরিকল্পিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় যন্ত্রের স্থান কতটুকু থাকবে এই সম্বন্ধে বিদেশের নানা পত্রপত্রিকায় বিদ্রূপ ও সমালোচনা কম

১. Young India, 7. 10. '26

২ Young India. 13. 11. '24

হয় নাই। প্রকৃত তথ্য না জানার দরুন কত রকম ভ্রান্তিমূলক ধারণা প্রচারিত হয় নিম্নের প্রচারটি তার প্রমাণ।

ওয়েস্টার্ন্ ইণ্ডিয়া ন্যাশানাল লিবারল্ এসোসিয়েশনের প্রচার সমিতির ছয় নম্বর প্রচারপত্রে নিম্নলিখিত ভ্রমাত্মক ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশিত হয়েছিল :

"গান্ধীরাজ প্রতিষ্ঠিত হলে ভারতের অবস্থা কেমন হবে?

—রেল থাকবে না। হাসপাতাল থাকবে না। যন্ত্র থাকবে না।

—কোন সৈন্য বা সেনাবাহিনীর প্রয়োজন হবে না। কারণ, গান্ধী অন্য দেশকে আশ্বাস দেবেন যে, ভারতবর্ষ তাদের কাজে হস্তক্ষেপ করবে না, আর সেইজন্য তারাও ভারতের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না।

—আইন বা আদালতেরও কোন প্রয়োজন হবে না। কেন না, প্রত্যেক ব্যক্তিই হবে নিজের আইন। প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজের খুশিমত কাজ করার স্বাধীনতা থাকবে। খুব স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন হবে, কেন না প্রত্যেকেই খদ্দরের ল্যাঙ্গট পরে বিচরণ করবে ও উন্মুক্ত স্থানে নিদ্রা যাবে।"

গান্ধীজী নিজ চিন্তাধারা স্পষ্ট করে উত্তরে বললেন—

"প্রথম কথা, ভারতবর্ষ 'গান্ধীরাজ' স্থাপনা করার প্রযত্ন করছে না। স্বরাজ স্থাপনের জন্যই সে প্রাণপণ চেষ্টা করছে।···'গান্ধীরাজ' একটি আদর্শ অবস্থা এবং সেই অবস্থায় ওই পাঁচটি নিষেধাত্মক কথা একটি সত্যকার চিত্র উপস্থিত করবে। কিন্তু কেউ স্বপ্নেও কল্পনা করেন না, আর আমি তো অবশ্যই করি না যে, স্বরাজে রেল থাকবে না, হাসপাতাল থাকবে না, যন্ত্র থাকবে না, সেনা ও নৌবাহিনী থাকবে না, আইন ও আদালত থাকবে না। পক্ষান্তরে, রেল থাকবে, তবে সৈন্যবাহিনীর জন্য বা ভারতের আর্থিক শোষণের জন্য তা নির্দিষ্ট হবে না; বরং তার ব্যবহার আভ্যন্তরীণ ব্যবসা বাণিজ্য ও তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সুখ সুবিধার জন্য হবে।···স্বরাজে কোনরকম ব্যাধি থাকবে না এমন কেউ আশা করে না। সুতরাং স্বরাজে অবশ্যই

হাসপাতাল থাকবে। কিন্তু এমন আশা করা হবে যে, ভোগবিলাস জনিত ব্যাধিজাত রোগীদের অপেক্ষা আকস্মিক দুর্ঘটনায় পতিত ব্যক্তিদের সেবা করাই তখন হাসপাতালের প্রধান কাজ হবে। চরখার রূপে যন্ত্র অবশ্যই থাকবে। কেন না, চরখাও তো একটি সূক্ষ্ম যন্ত্র। কিন্তু আমার কোন সন্দেহ নেই যে, স্বরাজের পর ভারতবর্ষে কিছু কলকারখানাও গড়ে উঠবে। তবে বর্তমানের ন্যায় জনসাধারণকে শোষণের দ্বারা রিক্ত করার পরিবর্তে তাদের কল্যাণ সাধন করাই হবে এগুলির উদ্দেশ্য। আমি নৌবাহিনীর কথা জানি না। কিন্তু এইটুকু জানি যে, ভবিষ্যৎ ভারতের স্থল সেনাবাহিনী ভারতকে পরাধীন রাখা এবং অন্য দেশের স্বাধীনতা হরণ করার জন্য ভাড়াটিয়াদের দ্বারা গঠিত হবে না। তখন সেনাবাহিনী বহুলাংশে কমিয়ে ফেলা হবে; তাতে অধিকাংশ থাকবে স্বেচ্ছাসেবক, যা পুলিশ বাহিনীর মত দেশের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে।

"স্বরাজে আইন ও আদালত থাকবে। কিন্তু সেগুলি হবে জনগণের স্বাধীনতার সংরক্ষক। আর এখনকার মত আমলাতন্ত্রের হাতিয়ার হয়ে সমগ্র জাতিকে নির্বীর্য করে দেবে না। যদিও স্বরাজে ল্যাঙ্গট পরা ও উন্মুক্ত স্থানে নিদ্রা যাওয়া যে কোন লোকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করবে, তবু আমি আশা করব যে, এখন যেমন অর্থের অভাবে যথেষ্ট পরিধেয় বস্ত্র কিনতে অক্ষম হওয়ায় ময়লা ন্যাকড়া ল্যাঙ্গটের কাজ করে বলে লক্ষ লক্ষ লোককে তা পরতে হয় এবং ঘরের অভাবে ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত শরীরকে উন্মুক্ত স্থানেই বিশ্রাম দিতে হয়, তখন তার প্রয়োজন হবে না। সুতরাং 'হিন্দ্ স্বরাজে' ব্যক্ত কতকগুলি আদর্শকে তাদের যথাযথ সম্পর্ক হতে বিচ্ছিন্ন করে ব্যঙ্গাত্মক রূপে জনসাধারণের সামনে এমনভাবে উপস্থিত করা হচ্ছে যেন আমি সেগুলিকেই গ্রহণ করার কথা প্রচার করছি। এমন করা অনুচিত।" [১]

১. Young India, 9. 3. '22

আধুনিক শিল্পবাদের বোঝা

আধুনিক শক্তিচালিত যন্ত্রশিল্পের প্রভূত উন্নতির ফলে শিল্পায়নের যে অবাধ প্রবাহ চলেছে তারই অন্তিম পরিণতিস্বরূপ শিল্পবাদের (Industrialism) চাপে পৃথিবীর এক অংশের মানবসমাজ আজ শোষণ, দারিদ্র্য ও নিগ্রহের মধ্যে দিনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। শিল্পবাদের প্রতাপে পৃথিবীর অনুন্নত সম্প্রদায় আজ ভীষণভাবে পিষ্ট। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মুক্তধারা' নাটকে শিল্পবাদকে যন্ত্রাসুররূপে চিত্রিত করে বলেছেন, 'কোন্ চাষীর কোন্ ভুট্টার ক্ষেত মারা যাবে' সে কথায় টলে না যন্ত্রাসুরের প্রাণ। যন্ত্রের দ্বারা নিপীড়িত মানবাত্মার ক্রন্দন ধ্বনিত হয়েছে 'মুক্তধারা' নাটকে। যন্ত্রে উন্নত আধুনিক সমাজে মানুষের অসহায়ত্বকে অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক শ্রীবিনয় ঘোষ তাঁর এক লেখায়ঃ

"বিজ্ঞান ও যন্ত্রের যত উন্নতি হল, মানুষের তত উন্নতি হল না। সমস্যাটা বিজ্ঞান বা যন্ত্র নিয়ে নয়, যন্ত্রের ক্রীতদাস মানুষকে নিয়ে।··· যন্ত্রের মত মানুষও হয়ে উঠেছে যান্ত্রিক।" যন্ত্রযুগ হতে বর্তমানে আমরা যে অটোমেটিক যুগে প্রবেশ করছি, এর মারাত্মক সামাজিক পরিণতি সম্বন্ধে লেখক পুনরায় বলছেনঃ "মানুষের স্বতন্ত্রতা বর্জন ও যন্ত্রের স্বাতন্ত্র্য অর্জন—সমাজ ও সভ্যতার ইতিহাসে বোধহয় সবচেয়ে বড় বৈপ্লবিক ঘটনা···যে যন্ত্র মানুষ চালাত, সেই যন্ত্র কেবল সুইচ টিপলে যখন নিজেই চলতে থাকবে, তখন মানুষ অচল হয়ে যাবে।···(অটোমেশনের ফলে) ভূস্বর্গের বদলে ভূ-নরকের কুৎসিত পরিবেশে ক্রমে বেকার জীবনের বিভীষিকা বাড়ছে এবং দুঃস্বপ্নের এক দৈত্যপুরী রচনা করছে অটোমেশন।"[১] আধুনিক কালের অতিমাত্রায় শিল্পোন্নত সমাজের এ এক ভয়াবহ চিত্র।

চিন্তা ও বুদ্ধিশূন্যভাবে কর্মী যখন কেবলমাত্র কর্তৃপক্ষের হুকুম তামিল করার নিষ্প্রাণ যন্ত্রে পরিণত হয়, কেন্দ্রিত কর্তৃপক্ষের ইচ্ছাই যখন শিল্পচালনার মূল মানদণ্ডরূপে গণ্য হয় তার ফলে, মানুষ শিল্পবোধ

১. শনিবারের চিঠি, মাঘ ১৩৬৫

ও হস্তনৈপুণ্য হতে বঞ্চিত হয়ে যান্ত্রিক জীবে পরিণত হয়। আজ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে গবেষণার ফলে এই সত্যই উদ্‌ঘটিত হয়েছে যে, সেখানে শতকরা ষাট ভাগের অধিক ক্ষেত্রে শিল্পকর্মীরা একটা প্রচণ্ডরকমের একঘেঁয়েমি ও নিরানন্দের মধ্যে কাল কাটায়।[১] কর্মীদের উপর শিল্পবাদের ফলাফল নিরূপণে ইউনেস্কোর একটি পত্রে প্রকাশ পেয়েছে যে, কারখানা কর্মীদের অনেকেই হয়তো একেবারে নৈরাশ্যে ভেঙে পড়ে; আত্মহত্যা, স্থায়ী মানসিক বিকৃতি, স্নায়বিক দৌর্বল্য প্রভৃতি বিবিধ রোগে তাদের অধিকাংশই জরাজীর্ণ।[২]

শিল্পবাদের এই মারাত্মক পরিণামের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ স্বরূপ গান্ধীজী ইউরোপের এক সভায় ঘোষণা করেছিলেন :

"আমাব ভয় হয়, আধুনিক শিল্পবাদ মানবসমাজের নিকট অভিশাপস্বরূপ হতে চলেছে। শিল্পবাদ সম্পূর্ণরূপে অপরকে শোষণ করার ক্ষমতার উপরে বেঁচে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, ভারত শিল্পায়িত হলে, অবশ্যম্ভাবী পরিণামস্বরূপ যখন সে অপরকে শোষণ করতে শুরু করবে তখন সারা বিশ্বের পক্ষে তা এক ভয়াবহ ব্যাপার হবে। আর অপরকে শোষণ করার জন্য ভারতকে শিল্পায়িত করার কথা কেনই বা আমি চিন্তা করব?"[৩]

শোষণের উপরে ভিত্তি করে যে শিল্পবাদের জন্ম, তার বিরুদ্ধে গান্ধীজীর এই উক্তির এক সর্বকালীন মূল্য রয়েছে। শিল্পে সমুন্নত ভারত ক্ষুদ্র দুর্বল দেশগুলির শোষক ও শাসক হয়ে বসবে, বিশ্বপ্রেমিক গান্ধী এটা সহ্য করতে গররাজী ছিলেন। এই শোষণের সর্বব্যাপক পরিণাম যে অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী হয়, আধুনিক ধনতান্ত্রিক শিল্পবাদ তার প্রমাণ। কেবলমাত্র এক দেশ কর্তৃক অন্য দেশ বা জাতিকে শোষণ করার মধ্যে তা নিবদ্ধ থাকে না। আধুনিক শিল্পবাদের সহজাত সঙ্গী হচ্ছে বিরাটকায় শিল্পের দ্বারা গঠিত নগরজীবন। এই সব বৃহদাকার শিল্পের ফলে কী ভীষণভাবে জলের

১. Ref. A Philosophy of Indian Economic Development, p. 155

২. The Community Factor in Modern Technology—Unesco

৩. Young India, 12. 11. '31

প্রয়োজন হয় তা আজ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় সম্পৎশালা দেশেও বিপদ সংকেতের সূচনা করছে। কিছু সংখ্যাতত্ত্ব দেখলেই এর ভয়াবহতা উপলব্ধি করা যাবে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে মাথাপিছু দৈনিক জলের প্রয়োজন হয় (বৃহৎ শিল্পনগরীতে) ১২৫ হতে ৩০০ গ্যালন। সেখানে লস্ এঞ্জেলস্ শহরে ভূমিনিম্ন হতে এই পরিমাণ জল পাম্প করে তোলা হয়েছে যে, কোন কোন স্থানে ভূমিতল প্রায় ৮ ফুট গভীর হয়ে বসে গেছে। টেক্সাস্ শহরে শিল্পের জন্য জলের চাহিদা পূরণে এত টিউবওয়েল বসানো হয়েছে যে, কোন কোনটি প্রায় ১১০০ ফুট নিম্নে জলের সন্ধান পেয়েছে। সেখানে ১৯৩৯ সালে পাম্পিংয়ের সাহায্যে দৈনিক যেখানে ১০,০০০,০০০ গ্যালন জল উঠত, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ১৯৪৫ সালে অধিকতর জলের চাহিদার দরুন এই কূপ সমূহ হতে দৈনিক ২২,৫০০,০০০ গ্যালন জল সরবরাহ করা হয়েছে। ফলে সেখানে কোন কোন টিউবওয়েলে জলস্তর সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ১০২ ফুটেরও অধিক নীচে চলে গেছে।[১] আবার অপরদিকে, এই সকল শিল্পনগরীতে বিভিন্ন প্রকার শিল্পে ব্যবহৃত বিষাক্ত ও দূষিত জল নিকটবর্তী নদী ও জলাশয়ের জলকে ভয়ানক ভাবে দূষিত করে, যা কৃষিকাজ বা মানুষের সাধারণ ব্যবহারের পক্ষে অনুপযুক্ত হয়। এখন দেখা যাক আধুনিক বৃহদাকার যন্ত্রশিল্পে উৎপাদনের জন্য জলের চাহিদা কিরূপ হয়ঃ

(ক) প্রতি গ্যালন গ্যাসোলিন (পেট্রল) তৈরির জন্য ৭-১০ গ্যালন জল ;

(খ) এক টন কৃত্রিম রবার উৎপাদনের জন্য ৬০০,০০০ গ্যালন জল ;

(গ) এক টন কাগজ উৎপাদনের জন্য ৫০,০০০ গ্যালন জল ;

(ঘ) এক টন ইস্পাত উৎপাদনের জন্য ৬৫,০০০ গ্যালন জল ;

১. Ref : Which Way Lies Hope, by Richard Gregg,. p. 24-25

(ঙ) এক টন কার্পাস বস্ত্রের ব্লিচিংয়ের জন্য ৬০,০০০ গ্যালন জল ও রং করার জন্য ৮০,০০০ গ্যালন জল প্রয়োজন হয়।

(চ) এক পাউণ্ড সাদা মিহি চিনির জন্য ৭ গ্যালন জল;

(ছ) এক পাউণ্ড এ্যালুমিনিয়ামের জন্য ১৬০ গ্যালন জল;

(জ) একটি বিমান ইঞ্জিন পরীক্ষার পর ঠাণ্ডা করার জন্য ৫০,০০০-১২৫,০০০ গ্যালন জলের প্রয়োজন হয়। এই তালিকা আরও বর্ধিত করা যায়।

বনজ সম্পদের অবক্ষয় সম্বন্ধে আর একটি বাস্তব সত্য উল্লেখ করা যায় এই প্রসঙ্গে।

নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স্ পত্রিকার একটি রবিবাসরীয় সংখ্যা প্রকাশের জন্য দশ একর বৃহৎ বৃক্ষের বনজ সম্পদের প্রয়োজন হয় মণ্ড তৈরীর জন্য। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এই আকারের আরও অনেকগুলি পত্রিকা প্রকাশিত হয়।[১] উপরিউক্ত তথ্য সমূহ সমাজ পোষণের দৃষ্টিতে বিপজ্জনক বলা চলে।

এই শিল্পবাদ ভূমিকে প্রচণ্ডভাবে শোষণ করে ভূমিক্ষয়ের সূত্রপাত করে, পরে খাদ্যের পরিমাণ ও গুণগত মূল্য হ্রাস পায়, জনসমাজ ক্ষীণ হতে থাকে ও সর্বশেষে সমাজ ও সভ্যতাকে অনুর্বর বালুকাময় মরুভূমিতে রূপান্তরিত করে। গ্রীস, রোম, পারশ্য, বেবিলন প্রভৃতি একুশটি প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস এর নিদর্শন। সেজন্য গান্ধীজী মনে করেন, "পশ্চিমের পক্ষে শিল্পবাদের ভবিষ্যৎ যদি অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, তবে ভারতের পক্ষে কি তা আরও অধিক হবে না?"[৩]

আধুনিক কেন্দ্রিত শিল্পায়নের বিকল্প ব্যবস্থা স্বরূপ বিশ্ববিখ্যাত শিল্পপতি হেনরী ফোর্ড প্রস্তাব করেছিলেন যে, তারের সাহায্যে সঞ্চালিত বিদ্যুৎ শক্তির দ্বারা দেশের দূরতম প্রান্তেও তিনি মোটর তৈরির বিকেন্দ্রিত কারখানা গড়ে তুলবেন। ফলে উৎপাদন

১. Ref : Which Way Lies Hope, p. 23 ২. তদেব, p. 6

৩. Young India, 12. 11. '31

ছড়ানোভাবে থাকবে, অন্যদিকে কারখানার ধোঁয়াটে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি হবে না। এক আমেরিকান বন্ধুর এইবিষয়ক প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন যে, যদিও এতে উৎপাদন বিকেন্দ্রিত হবে তথাপি বিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্র একটি স্থানে থাকবে; আর তার মালিকানা ব্যক্তির হাতে থাকায় ফল হবে মারাত্মক।[১]

আধুনিক যুগে উৎপাদন বৃদ্ধি করাই সমস্যা নয়। দারিদ্র্য দূর করার জন্য সমবণ্টনের প্রয়োজনীয়তা সমধিক। "অতএব বণ্টনকে সুষম করা হলে শিল্পবাদ কি দোষযুক্ত হবে না?" এই প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বললেন, "না, ব্যাধি এর মজ্জাগত। সমবণ্টন তখনই সম্ভব উৎপাদন যখন স্থানীয় ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়। অন্যকথায়, উৎপাদনের সঙ্গে বণ্টন সমান তালে এগিয়ে চলে।"[২] গান্ধীজীর অর্থনৈতিক মতাদর্শের এ হচ্ছে মূল কথা। উৎপাদন ও বণ্টন সমাজের এই দুই আর্থিক পদ্ধতির বিকেন্দ্রীকরণের দ্বারাই গান্ধীজী সর্বোদয় সমাজ গঠনের কথা বলেছেন। এই প্রসঙ্গে হেনরী ফোর্ড তাঁর 'মাই লাইফ এণ্ড ওয়ার্ক' শীর্ষক গ্রন্থে লিখেছেন:

"যেখানে সম্ভব বিকেন্দ্রীকরণের নীতি গ্রহণ করা উচিত। দানবাকৃতি ময়দা কলগুলির পরিবর্তে আমরা চাই, যে সব অঞ্চলে শস্য উৎপাদিত হয় সেরূপ সমস্ত স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলের সমষ্টি ছড়ানো থাকুক। যেখানে কাঁচামাল উৎপন্ন হয় সেখানেই তা পাকামালে পরিণত হওয়া উচিত।"

আর এক স্থানে বলেছেন, "সাধারণ নিয়ম হিসাবে বলতে গেলে, কোন বৃহৎ যন্ত্র অর্থনীতির দৃষ্টিতে সুবিধাজনক (economical) নয়।"

শিল্পায়নের নূতন ধারা

আধুনিক শিল্পবাদের তাত্ত্বিক বিচারে এ কথা সুস্পষ্ট যে, এর ফলে আর্থিক অসাম্য গভীরতর হয়, হিংসার সৃষ্টি হয়। এ কথা

১. Ref: Cent percent Swadeshi

২. Harijan, 2. 11. '34

অবশ্য সত্য যে, যে কোন সভ্যতা ও সংস্কৃতি কেবলমাত্র কৃষির উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠেনি। মানবজীবনের জন্য শিল্পেরও প্রয়োজন আছে।

কিন্তু আমাদের প্রশ্ন, শিল্পায়নের অন্য কোন ব্যাখ্যা কি সম্ভব নয়? আঠারো শতকে পাশ্চাত্যে শিল্পবিপ্লবের শুরু হতে শিল্পায়নের একটি মাত্র অর্থই করা হয়েছে—কেন্দ্রিত বৃহৎ যন্ত্রের দ্বারা শিল্পায়ন। আজ পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই কমবেশী এই প্রবাহ চলেছে। বর্তমানে সাধারণতঃ দুই প্রকারের শিল্প দেখা যায়ঃ (ক) বেসরকারী পরিচালনায় ধনতান্ত্রিক শিল্পপ্রচেষ্টা, যেখানে উৎপাদন ব্যবস্থা মুষ্টিমেয় ধনীব্যক্তির হাতে সীমায়িত। (খ) অন্যটি সাম্যবাদী বা রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ, রাষ্ট্রই যেখানে উৎপাদন যন্ত্রের মালিক। কেন্দ্রীকরণ ও যান্ত্রিকীকরণ (Mechanisation) এই উভয় পদ্ধতিতেই বিদ্যমান। এই উভয় প্রকার শিল্পায়নের ফল স্বরূপ দেখা গিয়েছে অনুন্নত জনগণের ব্যাপক শোষণ ও সীমাহীন দারিদ্র্য। ধনতান্ত্রিক শিল্পায়নের অন্তিম পরিণতি সাম্রাজ্যবাদ আর বিশ্বযুদ্ধের অবতারণা। অপরদিকে রাশিয়ায় রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের পরিণতি সম্বন্ধে যেটুকু জানা গেছে তাতে দেখা যায় জনগণকে চরম নিগ্রহ ও ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানে আর্থিক অসাম্য আজিও বর্তমান। বার্নহামের মতে "সোভিয়েট দেশে জনসংখ্যার ১১%-১২% উচ্চশ্রেণীর লোক জাতীয় আয়ের প্রায় ৫০ ভাগ অর্থ উপায় করে।"[১]

অপরপক্ষে, কেন্দ্রিত শিল্পায়নের এই পদ্ধতির প্রয়োগের জন্য যে প্রচুর সম্পদ্ ও আমানতের প্রয়োজন তা কোথা হতে আসবে অনুন্নত দেশগুলিতে? বর্তমান যুগে উপনিবেশ বা অধিকৃত দেশ হতে অর্থ ও সম্পদ্ আমদানীর সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। এই আমানতের পরিমাণ সময় সময় শ্রমিকপিছু ৫০-৬০ হাজার টাকা, কখনও ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হয়। সুতরাং এই বিপুল পরিমাণ পুঁজির সরবরাহের

১. Gandhism Reconsidered

দায়িত্ব কে নেবে? এই পুঁজি সাধারণতঃ দুইভাবে আসতে পারে—(১) দেশের অভ্যন্তরে ট্যাক্স্, বাধ্যতামূলক সঞ্চয় প্রভৃতি নানাবিধ পদ্ধতির সাহায্যে পুঁজি সংগ্রহ; (২) বিদেশ হতে ঋণ সংগ্রহ। কিন্তু দরিদ্র দেশে অর্ধভুক্ত জনসাধারণের নিকট হতে পুঁজি সংগ্রহের জন্য চড়া হারে অর্থ সংগ্রহের আশা উজ্জ্বল নয়। আর, বর্তমান বিশ্বে কোন জোটভুক্ত না হয়ে বিপুল পরিমাণ বিদেশী মূলধন সংগ্রহ করা যেমন কঠিন, তেমনই বিপজ্জনক। হিসাবে দেখা যায়, একটি কাপড়ের কলে মাথাপিছু আমানতী পুঁজির পরিমাণ ২৫০০ টাকা, একটি সিমেন্টের কারখানায় ১০,০০০ টাকা, একটি ইস্পাত কারখানায় প্রায় ৩০,০০০ টাকা; অথচ গ্রাম তথা কুটির শিল্পে তদনুপাতে লাগে মাথাপিছু মাত্র ৫০ টাকা। সেজন্য বাস্তব অর্থনীতির বিচারে ভারতকে নূতন পথের সন্ধান করতে হবে।

সুতরাং আমাদের নিকট সবচেয়ে বড় প্রশ্ন যা তা হচ্ছে ভারতের ন্যায় জনবহুল দেশে কর্মহীনতাকে নির্মূল করে সকল লোকের জন্য উপযুক্ত কর্মের সংস্থান করা। আর তজ্জন্য যে প্রকার শিল্পায়ন আমাদের বাস্তব আর্থিক অবস্থার বিচারে সঙ্গত মনে হবে, সেই পথের অনুসরণ। গান্ধীজী যে নূতন পথের সন্ধান দিয়েছেন তা গরীব জনতার ন্যুব্জ মেরুদণ্ডকে সবল করবে এবং ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধানকে খর্ব করবে। চরখা তথা বিকেন্দ্রিত শিল্পব্যবস্থা এই নূতন পথ। লর্ড এ্যাক্টনের ন্যায় গান্ধীজীও গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন, 'ক্ষমতা দুর্নীতির দিকেই ঝুঁকে এবং চূড়ান্ত ক্ষমতা চূড়ান্ত দুর্নীতির সহায়ক।"[১]

কেন্দ্রীয় বৃহৎ শিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে শ্রমিকদের চাহিদা ক্রমেই কমে আসে। এর প্রধান ধাপ যান্ত্রিকীকরণ, পরে আধুনিকীকরণ, আর সর্বশেষ ধাপ অটোমেশন্। স্বল্প পুঁজিসম্পন্ন দেশের পক্ষে গ্রামশিল্পপ্রধান অর্থনীতি যে কত সহায়ক হয় পরপৃষ্ঠার তুলনামূলক তালিকাটি তা প্রমাণ করবে।

---

১. "Power has a tendency to corrupt and absolute power corrupts absolutely"

উৎপাদনের পদ্ধতি	শ্রমিকপিছু পুঁজির পরিমাণ	মাথাপিছু উৎপাদন	হার	পুঁজির একক-পিছু শ্রমিক
১	২	৩	৪	৫
১) আধুনিক মিল ···	১২০০ টাকা ···	৬৫০ টাকা···	১.৯ ···	১
২) শক্তিচালিত তাঁত	৩০০ ,, ···	২০০ ,, ···	১.৫ ···	৩
৩) স্বয়ংক্রিয় তাঁত ···	৯০ ,, ···	৮০ ,, ···	১.১ ···	১৫
৪) হস্তচালিত তাঁত···	৩৫ ,, ···	৪৫ ,, ···	৯'৮ ···	২৫ [১]

শিল্পে অটোমেশনের ভয়াবহ অবস্থার এক দিক: "১৯৫৫ সালে আমেরিকার ক্লীভ্‌ল্যাণ্ডের একটি আধা অটোমাইজ্‌ড্‌ কারখানায় ২০০ শ্রমিক প্রতিদিন ১০০০ রেডিও সেট তৈরি করত; ১৯৫৮ সালের মধ্যে কারখানাটি পুরা অটোমাইজ্‌ড্‌ হবার ফলে মাত্র চারজন ইঞ্জিনিয়ার গোটা কারখানায় কাজ চালাচ্ছে।" (শনিবারের চিঠি, মাঘ ১৩৬৫)

আধুনিক শিল্পায়নের এই অন্তিম রূপের প্রকাশ আজ পাশ্চাত্যের নানা দেশে দেখা যায়। কিন্তু সেখানে জনসংখ্যার কর্মসংস্থান করা সমস্যা নয়। তাই উত্তরোত্তর যান্ত্রিক উন্নতির সঙ্গে স্বল্প পরিমাণ শ্রমিকের প্রয়োজন হওয়ায় কোনরূপ সংকটের সৃষ্টি হয় না। কিন্তু কল্পনা করুন, ভারতে বর্তমানে এই অবস্থা কি কাম্য? যে শিল্পব্যবস্থায় সকল কর্মক্ষম ব্যক্তির জন্য কাজের ব্যবস্থা করা সম্ভব, আমরা আধুনিকতার নামে কেন তাকে বর্জন করব? সেজন্য বর্তমানের আমেরিকার পথ গরীব ভারতের পথ নয়।

এই প্রসঙ্গে আধুনিককালের পাশ্চাত্য অর্থনীতিবিদ্‌দের মত আলোচনা করলেও এই একই সিদ্ধান্তের প্রতিধ্বনি লক্ষ্য করা যায়। কিছুকাল পূর্বে পুনায় অধিষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক অর্থনীতিবিদ্‌দের আলোচনা চক্রে আর্থিক প্রগতির পন্থা বিষয়ে যে মনোজ্ঞ আলোচনা হয়েছিল তা ভারতের আর্থিক প্রগতির পন্থা নির্ণয় সম্বন্ধে খুব সময়োপযোগী বলা যায়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে লোক-সংখ্যার স্বল্পতা হেতু শ্রমিকের উৎপাদিকা শক্তি (Productivity) বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু জনবহুল দেশ

১. Capitalism, Socialism, or Villagism

সমূহের পক্ষে উৎপাদন বৃদ্ধির ধারণা যে ক্ষতিজনক সে সম্বন্ধে দুইজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্ সুস্পষ্ট মন্তব্য করেছেন। ফরাসীদেশের বারট্রাণ্ড জুভেনাল বলেছেন: "আমি বলব যে, আপনাদের কার্যক্রম হওয়া উচিত কর্মসংস্থানের সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যবস্থা করা; এর অর্থ নিশ্চয়ই এই হবে যে, শ্রমিকপিছু উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস পাবে। শ্রমিকপিছু উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির ধারণা অযৌক্তিক।" ১ অক্সফোর্ডের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ কলিন কার্ক আরও স্পষ্টভাবে বলেছেন: "ভারতের পক্ষে শ্রমিকের একক পিছু উৎপাদিকার এই কল্পনা ভ্রমাত্মক, কিন্তু তা সম্পৎশালী দেশের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। ভারতবর্ষ, জাপান, ইতালী প্রভৃতি যে সকল দেশে স্থায়িভাবে ব্যাপক কর্মহীনতা বিদ্যমান, সেখানে মোট উৎপাদনের দৃষ্টিতে চিন্তা করা উচিত হবে, যদিও তাতে ঘণ্টা হিসাবে শ্রমিকের মাথাপিছু উৎপাদনের মাত্রা কিছু কম হবে।" ১

সুতরাং ভারতের আর্থিক উন্নয়নের যে পরিকল্পনা গান্ধীজী করেছিলেন তা কি উপরের আলোচনার দৃষ্টিতে খুব অসঙ্গত মনে হবে?

টেকনলজি ও রাষ্ট্রীয়করণের ভ্রান্তি

বর্তমান যুগে 'টেকনলজি' শব্দটি নিয়ে শিল্পজগতে খুব মাতামাতি চলছে। পুরাতন যুগের প্রয়োগ কৌশলের বদলে নয়া বৈজ্ঞানিক প্রয়োগের দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কসরতের আর শেষ নেই। সেজন্য শিল্পে টেকনলজির নিত্য নূতন প্রয়োগ সম্বন্ধে বিচার করা প্রয়োজন। আমরা পূর্বেই বলেছি যে, গান্ধীজী মোটেই বিজ্ঞান-বিরোধী বা যন্ত্রবিরোধী ছিলেন না, তবে যন্ত্র ও উন্নতধরনের বৈজ্ঞানিক কলাকৌশলসমূহের ব্যবহারের ক্ষেত্রে কয়েকটি সর্ত আরোপ করেছিলেন। আবার পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ্‌দের মতামতও আলোচিত হয়েছে।

১. Paths to Economic Growth. p. 335-36

সুতরাং এ কথা খুবই স্পষ্ট যে, অধিকতর যান্ত্রিকীকরণের ফলে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা ক্রমেই হ্রাস পায়। ভারতের ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, ১৯১১ সাল হতে ১৯৩৬ সালের মধ্যে কারখানার সংখ্যা ২৭০০ হতে ৯৩০০তে বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ, তদনুপাতে কর্মসংস্থান ১১% হতে কমে ৯.৬% হয়েছে। অর্থাৎ, উৎপাদন সূচীর (Production index) সঙ্গে কর্মসংস্থান সূচী (Employment index) সমতালে চলতে পারেনি। জনবহুল অনুন্নত দেশের পক্ষে এ একটি স্থায়ী সমস্যা।

ধনতান্ত্রিক শিল্পায়নের কুফল দূর করার উদ্দেশ্যে অনেকে জাতীয়করণের কথা বলেন। উদ্দেশ্য, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে মুনাফা ব্যক্তির বদলে রাষ্ট্রভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়ে জাতীয় কল্যাণে ব্যয়িত হবে। কিন্তু রাষ্ট্রীয়করণের ফলে উৎপাদন পদ্ধতির কোন পরিবর্তন না হওয়ায় ব্যক্তিগত পুঁজি তখন রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদে রূপান্তরিত হয়ে রাষ্ট্র আরও শক্তিশালী হবে এবং জনসাধারণের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপনে প্রয়াসী হবে। গান্ধীজী, আমরা জানি, এইরূপ সর্বগ্রাসী রাষ্ট্র-প্রভাবের বিরোধী ছিলেন। সেজন্য তিনি একদা একটি অতিমূল্যবান উক্তি করেছিলেন: "পণ্ডিত নেহরু শিল্পায়ন চান; কারণ তাঁর ধারণা যে, শিল্পের জাতীয়করণ করা হলে তা পুঁজিবাদের সকল দোষ হতে মুক্ত হবে। আমার নিজস্ব অভিমত এই যে, এই সকল দোষ শিল্প-বাদের মজ্জাগত রোগ। আর যতই তার সমাজীকরণ করা হোক না কেন, তা দূর হবে না।" [১]

দেশের জন্য প্রয়োজনীয় মূল শিল্পগুলির জাতীয়করণ করা সম্বন্ধে সকলেই একমত। অনেকের ধারণা, রাষ্ট্রীয়করণ করা হলেই সমাজবাদ আসবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, সমাজতন্ত্রের বদলে রাষ্ট্রীয়

---

১. "Pandit Nehru wants industrialisation because he thinks that, if it is socialised, it would be free from the evils of Capitalism. My own view is that the evils are inherent in industrialism and no amount of Socialisationc an eradicate them."

—Harijan, 29.9. '40

আমলাতন্ত্রের উদয় হচ্ছে। তাই যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি দেশে যৌথ খামার প্রভৃতি ভেঙ্গে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত পুঁজিবাদের ব্যক্তিগত অনুপ্রেরণা আর সমাজবাদের সামাজিক ভাবনা এই গুণগুলি গ্রহণ করা। রাষ্ট্রীয়করণের নামে মানুষের সহজাত কর্মপ্রেরণা বন্ধ করা বিকাশের দৃষ্টিতে আদর্শ পন্থা নয়।

কিন্তু পূর্ণ কর্মসংস্থানের দৃষ্টিতে সমাজীকরণের সফলতা কতটুকু তা বিচার করে দেখা উচিত। নিত্য নূতন পরিবর্তনশীল টেকনলজির ফলে উদ্ভূত কর্মহীনতার সমস্যা (Technological unemployment) আধুনিক শিল্পজগতে নিঃসন্দেহে একটি বৃহৎ সমস্যা। সমাজীকরণের দ্বারা অদ্যাবধি এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব হয়নি, যদিও সমাজী-করণের আদর্শস্বরূপ দুটি লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে—কাজের সময় হ্রাস ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। তাই কর্মহীনতার ব্যাপক অন্ধকারের মধ্যে আলো ঝলমল করা ক্ষুদ্র দ্বীপের সার্থকতা কতটুকু? অর্থ-নীতিবিদ্ অধ্যাপক দাঁতওয়ালা সেজন্য এই মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছেন যে, "সমাজীকরণ টেকনলজির আক্রমণের বিরুদ্ধে কোন সুনির্দিষ্ট দাওয়াই নয়।···বিংশ শতাব্দীর প্রধান সংঘর্ষের কারণ মানুষ ও যন্ত্র—এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের পন্থা মানুষকে আজ উদ্ভাবন করতে হবে।" [১]

রাষ্ট্রীয়করণ সম্বন্ধে ইউরোপের এককালের চরম সমর্থকবৃন্দের মনেও আজ সন্দেহের প্রকাশ দেখা যাচ্ছে। সে কথাও নিছক উড়িয়ে দেবার মত নয়। তৎকালের আশাবাদীরা আজ যেন রাষ্ট্রীয়-করণের আশা হতে বঞ্চিত হতে চলেছেন। বৃটিশ লেবার পার্টির তরফ হতে সমাজবাদের ধারা ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 'টোয়েনটিয়েথ্ সেঞ্চুরি সোশ্যালিজম্' নামক পুস্তকে যে অতি মূল্যবান আলোচনা করা হয়েছে তা আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গের পক্ষে খুবই উপযোগী হবে। সমাজবাদীদের আশা-ভরসার উৎসস্বরূপ রাষ্ট্রীয়করণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে ঃ

---

১. Gandhism Reconsidered.

"বহুদিন যাবৎ যৌথ মালিকানাকেই সমাজবাদী অর্থব্যবস্থার এক অপরিহার্য ও পর্যাপ্ত সর্ত বিবেচনা করা হত। কয়েকটিমাত্র শিল্প-ব্যবসায়ের যৌথ মালিকানা নয়, প্রত্যেকটি উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময় ব্যবস্থার পূর্ণ রাষ্ট্রীয়করণই সমাজবাদীদের কাম্য ছিল। অর্থাৎ, সমাজবাদী ঐতিহ্যে আর্থিক ক্ষমতা হস্তান্তরের উপরেই সবচেয়ে বেশী জোর দেওয়া হয়েছে।··

"পূর্বোক্ত আশাবাদী তত্ত্বদর্শন আজ ধূলিসাৎ হয়ে গেছে এবং প্রত্যেক স্থলে সমাজবাদীদের এর পরিণামের সম্মুখীন হতে হচ্ছে।··· যাবতীয় আর্থিক ক্ষমতা রাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তরিত করা হয়েছে এবং তার পরিণামে মোটেই মার্কসের বিশ্বাস সাকার হয়ে 'স্বাধীন ও সমানাধিকার ভোগকারীদের সমাজ' স্থাপিত হয়নি, বরং এর ফল হয়েছে একনায়কত্ববাদী স্বৈবতন্ত্র। এ ছাড়া, রাষ্ট্রের হাতে যাবতীয় আর্থিক ক্ষমতা থাকার দরুন কার্যতঃ এর উপব কোনরকম নিয়ন্ত্রণ নেই। শ্রমিকদের পক্ষে পুঁজিপতিদের পরিবর্তে বাষ্ট্রেব করুণাশ্রয়ী হয়ে বেঁচে থাকা আরও দুর্ভোগেব ব্যাপার। কারণ, পুঁজিপতিরা কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের মত অন্ততঃ সর্বব্যাপী নয়। তাই পুঁজিবাদ যদি ব্যক্তিবাদ পরিচালিত উচ্ছৃঙ্খলতা হয়, তা হলে সাম্যবাদ হচ্ছে যৌথবাদ পরিচালিত উচ্ছৃঙ্খলতা এবং বোগের প্রতিবিধান ব্যাধির চেয়ে কোন অংশে শ্রেয়ঃ নয়। ···মালিকানাব পরিবর্তন হওযাই কোন শিল্প-ব্যবসায়কে সমাজবাদী পদ্ধতিতে পরিচালিত করার জন্য যথেষ্ট—এ বিশ্বাস আব বজায় নেই।··· অভিজ্ঞতার ফলে এখন দেখা গেছে যে, মালিকানার ক্ষমতা সরকারের হাতে গেলেও তা বিপদের কারণ হতে পারে। সে অবস্থাতেও এর অসদ্ব্যবহারের সম্ভাবনা থেকে যায় এবং তার ফলে ব্যক্তিমানবকে তার স্বাধিকার রক্ষার জন্য তখনও সংগ্রাম করতে হয়। সুতরাং বেসরকারী বা সরকারী যে কোন রকমের মালিকানাই হোক, এর নিয়ন্ত্রণ করার উপযুক্ত পন্থা আবিষ্কার করতে হবে।" [১]

১. Twentieth Century Socialism

সুতরাং রাষ্ট্রীয় মালিকানা তথা সমাজতন্ত্রের স্রষ্টা ও হোতাদের মনে আজ যে সংশয় দেখা দিয়েছে তা কি গান্ধীজীর সংশয়ের যৌক্তিকতা প্রমাণ করে না? গান্ধীজী যে নূতন ধাঁচের শিল্পবিপ্লবের কথা বলেছিলেন তা উনিশ শতকের পাশ্চাত্য শিল্পবিপ্লবের হুবহু নকল না হয়ে আপন স্বকীয়তার উপর পূর্ণ মানুষ সৃষ্টিকামী হবে। মানুষকে খণ্ডীকরণ পূর্বক সমাজকে বিচ্ছিন্ন করে যে শিল্পব্যবস্থা, তা আমাদের কাম্য নয়। কেন না, নিত্য নূতন টেকনলজির লেজুড়যুক্ত হলেই বলা যায় না যে সভ্যতার বিচারে আমরা প্রগতিশীল হয়েছি। খ্যাতনামা ঐতিহাসিক টয়েনবী তাঁর 'A Study of History' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে ঠিক এই কথাই বলেছেন: "There is no correlation between progress in technique and progress in civilisation." টেকনলজির এই সামাজিক পরিণাম সম্বন্ধে সময়োচিত সতর্কতা মঙ্গলজনক। সেজন্য বর্তমানে আর্থিক উন্নয়নের নামে ব্যাপক শিল্পায়নের যে প্রচেষ্টা চলেছে তাতে মানুষকে বাদ দিয়ে নয়, বরং মানুষের সর্বাত্মক কল্যাণের দিকে অধিক নজর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আর্থিক উন্নয়নের এই পরিকল্পনায় মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে টেকনলজি যাতে বাধাস্বরূপ না হয় সেদিকে আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌দের সজাগ দৃষ্টি আজ পড়েছে।[১]

---

১. Ref: Essays on Economic Development, p. 147

নবম অধ্যায়

গ্রাম পরিকল্পনার নূতন দৃষ্টি

গ্রাম পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা

কোন অনুন্নত দেশের উন্নতি বিধানের জন্য পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা আজ সর্বস্বীকৃত। কেন না, আধুনিক কালে বৈজ্ঞানিক উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের সম্পদ সমূহের যথাযথ ব্যবহারের দ্বারা উন্নয়ন প্রচেষ্টার যে প্রবাহ আজ বিশ্বব্যাপী দেখা যাচ্ছে তার পশ্চাতে পরিকল্পনা ও পরিকল্পিত চিন্তাভাবনা বিদ্যমান। উন্নতি বিধানের এই প্রচেষ্টার মধ্যে বিভিন্ন সম্পদের যুক্তিসঙ্গত ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন। সকল দেশেই আজ জনসংখ্যা ক্রমবর্ধনশীল। অথচ সম্পদ সীমায়িত। সেজন্য স্বভাবতঃই সেই সম্পদের ব্যবহার পূর্বপরিকল্পিত না হলে অপচয়েব সম্ভাবনা বেশী থাকে।

তাছাড়া, দেশের সমগ্র সম্পদ যাতে সমতার ভিত্তিতে সমাজের সকল শ্রেণীর অধিবাসীর মধ্যে বন্টিত হয়, পরিকল্পনার এটাও অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, সম্পদের যথাযথ প্রয়োগের দ্বারা সামগ্রিক কল্যাণের দৃষ্টিতে নূতন সম্পদ উৎপাদন এবং তার ন্যায্য বণ্টনের ব্যবস্থা করা, যাতে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকে ও তার ফল সকলে সমানভাবে উপভোগ করতে সমর্থ হয়। জাতায় পরিকল্পনার এই হওয়া উচিত প্রকৃত উদ্দেশ্য।

পরিকল্পনার প্রকৃতি ও আকৃতি প্রত্যেক দেশের ভৌগোলিক, আর্থিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে অনুসরণ করেই রচিত হয়। বর্তমান কালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কেন্দ্রিত পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নয়নসূচী গৃহীত হয়েছে। কিন্তু পূর্ববর্তী বিভিন্ন অধ্যায়ের আলোচনা হতেই এ কথা বুঝা যায় যে, ভারতের জন্য ঠিক পাশ্চাত্য ধাঁচের পরিকল্পনা ফলপ্রসূ হবে না। ভারতে লাখ লাখ গ্রামাঞ্চলের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য কেন্দ্রীয় ছাঁচে ঢালা ও স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতি

উপেক্ষাসূচক দৃষ্টি রেখে কোন পরিকল্পনাই সাফল্যলাভ করতে পারে না। দেরীতে হলেও আজ সরকারী মহলও এই সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছেন বলে 'গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ' বা 'পঞ্চায়েতী রাজ' ব্যবস্থা প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়েছেন।

সেইজন্য 'গ্রাম পরিকল্পনা' (Village Planning) আজ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে একটি নূতন সংযোজন। শহরকেন্দ্রিক মাথাভারী পরিকল্পনা গ্রামকেন্দ্রিক দেশের প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ খায় না। আর এই পরিকল্পনা হবে সর্বাত্মক। গ্রামজীবনের সর্ব দিক স্পর্শ করে এরূপ ব্যাপক পরিকল্পনাই প্রয়োজন। কেন না, আর্থিক উন্নতিই যদি কেবলমাত্র বর্তমানের লক্ষ্য রূপে স্থির করা হয় তবে সেজন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অন্যান্য সামাজিক পরিবর্তনও প্রয়োজন। উন্নত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহারের জন্য শিক্ষিত কারিগরের প্রয়োজন। এইভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, মানুষের জীবন যেমন বিচ্ছিন্ন নয় তেমনি সমগ্রতার দৃষ্টি নিয়ে রচিত পরিকল্পনাই প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনে সক্ষম। গান্ধীজী এইজন্য গ্রামউন্নয়নের উদ্দেশ্যে যে গঠনমূলক কর্মের প্রবর্তন করেছিলেন তাতে শেষের দিকে 'সমগ্র সেবার' কথা বলেছিলেন। কারণ, কোন একাঙ্গী পরিকল্পনাই এই যুগে টিঁকতে পারে না।

গ্রামজীবন আজ যেভাবে শোষিত, বিপর্যস্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, তা থেকে উদ্ধারের জন্য সামগ্রিক প্রচেষ্টা প্রয়োজন। গ্রাম পরিকল্পনার জন্য সুসংগঠিত গ্রামসমাজ চাই। কারণ, এরূপ সুসংবদ্ধ গ্রামসমাজের অস্তিত্ব না থাকলে সামগ্রিক প্রচেষ্টাও সম্ভব নয়। গ্রামবাসীদের মধ্যেই আজ এই চেতনা তথা ঐকান্তিকতা আসা চাই যাতে করে তারা স্বয়ংপ্রবৃত্ত হয়ে সম্মিলিত প্রচেষ্টার দ্বারা আপনাদের উন্নতি সাধনে ব্রতী হয়। কিন্তু আজ অবস্থা কি এই নয় যে, দেশ আছে, শহর আছে, কিন্তু গ্রাম নাই? গ্রামে কিছু জনসমষ্টি আছে মাত্র। তারা পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত নয়, পরস্পরের ভাবনায় ভাবিত নয়। অর্থাৎ, গ্রামের ভৌগোলিক অস্তিত্ব থাকলেও গ্রামসমাজ নাই। গ্রামসমাজ নাই বলে গ্রামভাবনা, গ্রামচেতনা নাই। গ্রাম

পরিকল্পনার কথা চিন্তা করার সঙ্গে সঙ্গে এই মৌলিক সমস্যার দিকেও দৃষ্টি দিতে হবে। সরকার গ্রাম উন্নযনের জন্য সমাজ উন্নয়ন কার্যসূচী গ্রহণ করেছেন ঠিকই; কিন্তু উক্ত দপ্তরের মন্ত্রীমহোদয় স্বীকার করেছেন যে, সমাজ না থাকলে সমাজ উন্নয়ন করা কঠিন। বর্তমান ভারতে গান্ধীজীর মন্ত্রশিষ্য আচার্য বিনোবা ভাবের নেতৃত্বে যে গ্রামদান আন্দোলন চলেছে তার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে গ্রামপরিবার সৃষ্টির দ্বারা গ্রামসমাজের পুনর্গঠন করা। এরূপ জাগ্রত, সহযোগী, একতাবদ্ধ গ্রামসমাজই হবে গ্রাম পরিকল্পনার ভিত্তি।

গ্রামসমাজের প্রধান কর্তব্য হবে কি? গ্রামের সকল প্রকার সম্পদের একত্রীকরণের দ্বারা গ্রামশিল্প তথা অন্যান্য সম্ভাব্য ক্ষুদ্রশিল্প সমূহের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমুহের উৎপাদন ও বণ্টনের ব্যবস্থা করা। উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা বিচ্ছিন্নভাবে না চালিয়ে যদি গ্রামসমাজের সর্বময় কর্তৃত্বের অধীনে ও নির্দেশে পবিচালিত হয় তবে বর্তমানের বড় ও ছোট ব্যবসায়ী, দালাল ইত্যাদি মধ্যমবর্গীয় ব্যক্তিদের শোষণ ও নিপীড়ন বন্ধ হবে। গ্রামেব এই শোষণের পথ বন্ধ করাই হবে গ্রাম পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। সকল কর্মক্ষম ব্যক্তির জন্য পূর্ণ কর্মসংস্থানের (full employment) দৃষ্টিতে যোগ্যতা ও ক্ষমতা অনুসারে সকলের জন্য কর্মেব পরিকল্পনা করা গ্রামসমাজের দায়িত্ব।

গ্রামে বেকারির প্রকৃতি বিভিন্ন প্রকারের হয়। যেমন, যখন চাষ আবাদের কাজ থাকে না তখন চাষীরা সাময়িক কর্মহীনতায় (seasonal unemployment) জর্জরিত হয়। এছাডা, ভূমিহীন মজুর সম্প্রদায়ও সারা বছর উপযুক্ত কাজ পায় না। তাকে বলা যায় আধা-বেকাবি (under-employment)। তৃতীয়তঃ, গ্রামশিল্পী ও কারিগর সম্প্রদায় বর্তমানের শিল্প প্রতিযোগিতায় হার স্বীকার করে বেকার হয়ে পড়ছে। অথচ বৃহৎ কারখানায় এদের সকলের বিকল্প কর্মের ব্যবস্থা অদ্যাবধি করা সম্ভব হয় নাই। একে বলা যায় প্রয়োগ-বিদ্যাজাত বেকারি (technological unemployment)। এইরূপ বহুবিধ বেকারির গ্রাসে আজ গ্রামজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

আজ গ্রামশিল্প কিংবা শিল্পী বিচ্ছিন্নভাবে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দ্বারা বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের এই সংগঠিত আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়লাভ করতে পারবে না। সেইজন্য আজকার সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন গ্রাম পরিকল্পনার মাধ্যমে গ্রামসমাজের দ্বারা সমগ্র গ্রামের আর্থিক জীবনকে এই বিপন্ন অবস্থা হতে উদ্ধার করা। এইরূপ কর্তৃত্বসম্পন্ন গ্রামসমাজের প্রতিনিধিত্বমূলক সভাকে বিনোবাজী তাঁর গ্রামদান আন্দোলনের কাঠামোয় গ্রামসভারূপে অভিহিত করেছেন। বর্তমান গ্রামজীবনের সর্বাত্মক অধোগতিকে রুদ্ধ করতে হলে সেজন্য গ্রাম-পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা আজ পূর্বের তুলনায় অধিক। কেন্দ্রিত পরিকল্পনার ব্যর্থতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে বিকেন্দ্রিত গ্রাম পরিকল্পনা হবে ভারতের জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক নূতন পদক্ষেপ।

গ্রাম পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও নীতি

কেন্দ্রিত পরিকল্পিত কেন্দ্রিক সংগঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু গ্রাম পরিকল্পনা মুলতঃ বিকেন্দ্রিত পরিকল্পনা। সেজন্য বিকেন্দ্রিত সংগঠনের দ্বারা এ পরিচালিত হয়। প্রত্যেক পরিকল্পনাই কতকগুলি মৌল নীতিকে কেন্দ্র করে রচিত হয়। আর সেই নীতি-গুলি আবার নির্ধারিত হয় সেই সেই দেশের আর্থিক তথা রাজনৈতিক পদ্ধতির প্রকৃতি অনুসারে। ধনতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক বা সাম্যবাদী দেশের পরিকল্পনার মৌল নীতিগুলিতে স্বভাবতঃ বিভিন্ন প্রকারের গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু এর সব কটির মধ্যে যে এক সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় তা হচ্ছে কেন্দ্রানুগ প্রকৃতি। এই পরিকল্পনার প্রধান ত্রুটি হচ্ছে, এর ফলে দেশের সামগ্রিক অবস্থার বিশ্লেষণে আর্থিক বৈষম্য এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে আঞ্চলিক বৈষম্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। আর দেশের আর্থিক তথা শাসনতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের ভার একটি শক্তিশালী ক্ষমতাভিলাষী ক্ষুদ্র পরিচালক গোষ্ঠীর হাতে সীমাবদ্ধ হয়। আজ সাম্যবাদী দেশের জনক খোদ রাশিয়াতেও এই অবস্থার প্রতিফলন দেখা যায়।

গান্ধীজী তাঁর বিকেন্দ্রিত পরিকল্পনার দ্বারা বিবিধ প্রকারের

ক্ষমতাকাঙ্ক্ষা, গোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতা সঞ্চয় প্রভৃতি ত্রুটি নির্মূল করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। এখন দেখা যাক গ্রাম পরিকল্পনা বলতে ঠিক কি বুঝায়? ভারতের সাড়ে পাঁচ লাখের বেশী গ্রামের জন্য কি আলাদা পরিকল্পনা চাই? প্রত্যেকটি গ্রামের জন্য কি ভিন্ন ভিন্ন পরিকল্পনা প্রয়োজন? না, তা নয়। গ্রাম পরিকল্পনার মূল অর্থ হচ্ছে গ্রামভিত্তিক পরিকল্পনা। গ্রামকে কেন্দ্র করে পরিকল্পনা রচনা করাই হবে গ্রাম পরিকল্পনার সহজ অর্থ। সুতরাং এইরূপ গ্রামের পরিধি কত বড় হবে, অর্থাৎ পরিকল্পনার প্রাথমিক একক কত বড় হবে তা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আমরা আলোচ্য প্রসঙ্গে এই প্রশ্নের উপর সাধারণভাবে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।

এ কথা স্বাভাবিক যে, গ্রাম পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে আমরা সমধিক দৃষ্টি দেব। পরিকল্পনার পরিধি সূচক একক বিবেচনার বিষয়। অতি সাধারণভাবে বললেও বলা যায় যে, কতকগুলি গ্রামসমষ্টি নিয়ে এক একটি মূল একক বা ইউনিট গঠিত হতে পারে। অনেকে মনে করেন, গ্রামপঞ্চায়েৎ হবে পরিকল্পনার প্রাথমিক একক; কেউ কেউ বলেন যে, ব্লকস্তর হবে এরূপ এককের উপযুক্ত পরিধি। আবার কোন কোন অর্থনীতিবিদ্ মনে করেন যে, জেলা হওয়া উচিত প্রাথমিক একক। কিন্তু গ্রাম পরিকল্পনার প্রকৃতি অনুসরণ করলে এ কথা যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয় যে, গ্রামপঞ্চায়েৎ বা এক একটি সমাজ-উন্নয়ন ব্লকই হওয়া উচিত প্রাথমিক একক। প্রতিটি এককের পক্ষে মানুষের জীবনধারণের জন্য মৌলিক ষড়বিধ প্রয়োজনের ব্যাপারে যথাসম্ভব স্বাবলম্বী হওয়াই হবে গ্রাম পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য। খাদ্য, বস্ত্র, বাসগৃহ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও রক্ষা—এই ছয় প্রকারের ন্যূনতম ব্যবস্থা প্রতি গ্রাম এককেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। গ্রাম পরিকল্পনার প্রতি এককই আপন এলাকার সামগ্রিক উন্নয়ন কার্যসূচী প্রণয়ন করবেন ও সেগুলিকে বাস্তবে রূপ দান করাও হবে মূলতঃ তাঁদেরই দায়িত্ব। প্রতি একক স্থানীয় কাঁচামাল, অন্যান্য সম্পদ ও জনসংস্থার যথার্থ নিরীক্ষণের পর স্থানীয় পদ্ধতি অনুসারে

স্থানীয় চাহিদা পূরণ করবার চেষ্টা করবেন। এ বিষয়ে প্রয়োজনমত উন্নত যান্ত্রিক কলাকৌশলের সাহায্য যে লওয়া হবে না এমন কোন কথা নাই।, এ সম্পর্কে যে সাধারণ সতর্কতার প্রয়োজন, তা যন্ত্র ও গ্রামশিল্প সম্বন্ধীয় অধ্যায়গুলিতে আলোচিত হয়েছে।

মরিস ফ্রাইডম্যানের একটি প্রশ্ন ছিল গান্ধীজীর কাছেঃ "গ্রামের কাজে মনোনিবেশ করার পিছনে আপনার গূঢ় তত্ত্ব কি?"

উত্তরে গান্ধীজী বলেন, "আমি বলে আসছি যে, অস্পৃশ্যতা থাকলে হিন্দুধর্ম যাবে। তেমনই আমি বলব যে, গ্রাম ধ্বংস হলে ভারতবর্ষও ধ্বংস হবে।...গ্রামের পুনর্গঠন কেবলমাত্র তখনই সম্ভব যখন তা আর শোষিত হবে না। ব্যাপকভাবে শিল্পায়নের ফলে গ্রামবাসীরা স্বভাবতঃ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শোষিত হবে, কেন না প্রতিযোগিতা ও বিপণনের সমস্যা তখন এসে যাবে। সেইজন্য গ্রাম যাতে প্রধানতঃ আপন প্রয়োজন অনুযায়ী উৎপন্ন করে, আত্মসন্তুষ্ট থাকে সেদিকে জোর দিতে হবে। গ্রামশিল্পের এই বৈশিষ্ট্য বজায় থাকলে গ্রামগুলি যদি আধুনিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদিও ব্যবহার করে তথাপি তাতে কোন অসুবিধা হবে না; অবশ্য এই সব যন্ত্রপাতি যদি তারা তৈরী করতে ও ব্যবহার করতে সমর্থ হয়। অপরের দ্বারা তারা যাতে শোষিত না হয় কেবলমাত্র সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।"

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, গ্রামগুলি যদি স্বয়ং স্বাবলম্বনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে তবে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কোন প্রয়োজন থাকবে কি না? সরকারের ভূমিকা এ বিষয়ে কতটুকু থাকবে? গ্রাম পরিকল্পনায় সরকারের অস্তিত্ব থাকবে বইকি; তবে বর্তমানের ন্যায় গ্রামগুলিকে কোন কিছুর জন্যই দূরবর্তী সরকারের উপর চাতক পাখার ন্যায় তৃষ্ণার্ত জলের অপেক্ষায় বসে থাকতে হবে না। এক্ষেত্রে গ্রাম এককই হবে দায়িত্বশীল কর্তা; সরকার অনেকটা নীরব পথপ্রদর্শক, বিপদের বন্ধু তথা সাহায্যকারার ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। গ্রামের কাজ হবে মুখ্য; সরকার গৌণ। সরকারের কর্তব্য হবে যথাসম্ভব কম সর্ত আরোপ করে গ্রাম পরিকল্পনাকে সার্থক করে তোলার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনের সময় সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসা।

অনেকটা যেমন, পুত্র সাবালক কর্মক্ষম হয়ে গেলে পিতা ধীরে ধীরে নিজের ক্ষেত্র সংকুচিত করেন অথচ সদাজাগ্রত দৃষ্টি রাখেন পুত্রের কল্যাণের দিকে, তেমনি রাষ্ট্র বিনা প্রয়োজনে হস্তক্ষেপ করতে আগ্রহান্বিত না হয়ে জাগ্রত প্রহরীর ন্যায় কল্যাণ দৃষ্টি রাখবে। গ্রাম পরিকল্পনা জাতীয় পরিকল্পনারই অঙ্গ স্বরূপ। সেজন্য সরকার-বহির্ভূত বা সরকারবিহীন ব্যবস্থা ঠিক নয়। তবে সরকারের নিয়ন্ত্রণ নিঃসন্দেহে বহুলাংশে হ্রাস পাবে।

স্থানীয় চাহিদার অধিকাংশ স্থানীয় ভিত্তিতে ও স্থানীয় পদ্ধতিতে উৎপন্ন দ্রব্যের দ্বারা মেটানোই যদি এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হয় তবে বিদেশ হতে আমদানী করা যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য জিনিসের প্রয়োজন খুব কম হবে। অর্থাৎ এর ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতির সম্ভাবনা থাকবে না বললেই চলে। কেন না, এইরূপ অবস্থায় তখন অবশ্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্য ব্যতীত বিদেশের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা দূর হবে। আর এর অপ্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ সারা দেশে আত্ম-নির্ভরশীলতা ও আত্মপ্রত্যয়ের এক বলিষ্ঠ মনোভাব সৃষ্টি হবে, যা যে-কোন দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার সফল রূপায়ণের পক্ষে একান্ত আবশ্যক বলা যায়। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ইংলণ্ডীয় অর্থনীতিবিদ্ ই. এফ. শুমাখের উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করেছেন :

"আমার নিজস্ব ব্যক্তিগত অভিমত হল যে, যে দেশ এমন পরিকল্পনা গ্রহণ করে যার সাফল্য বিদেশের বিরাট সাহায্যের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল, সে দেশ তার অধিবাসীদের আত্মমর্যাদাবোধ ও আত্মবিশ্বাসের উপর আঘাত হানে। সে আঘাত এত বেশী যে সংকীর্ণতম অর্থনীতির ভাষায় বললেও বলতে হয় যে দেশের ক্ষতির পরিমাণ হয় লাভের চাইতে বেশী।"[১]

অতএব বৃহত্তর জাতির স্বার্থের দৃষ্টিতে বর্তমানে পরিকল্পিত উন্নয়ন সম্বন্ধীয় ধারণার সময়োপযোগী পরিবর্তন করার সময় হয়েছে। গ্রাম পরিকল্পনা এই নব দিগন্তের বার্তা বহন করে।

১ Roots of Economic Growth, p. 47.

এ তো গেল গ্রাম পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও পরিধি সম্বন্ধে আলোচনা। এখন দেখা যাক এরূপ পরিকল্পনার প্রাথমিক মৌল নীতিগুলি কি প্রকারের হবে? প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে, গান্ধীজী গ্রাম ও গ্রামীণ জীবনের পুনরুদ্ধারের যে পরিকল্পনা করেছিলেন তার উদ্দেশ্য ছিল বর্তমানের এই ক্ষয়িষ্ণু, মৃতপ্রায় গ্রামের বদলে এক সুস্থ, সমৃদ্ধ, স্বাধীন উন্নত গ্রামসমবায় গঠন করা। এরূপ গ্রাম মানুষের মত বাঁচার জন্য শহরের উপর নির্ভরশীল হবে না প্রতিটি কাজের বেলায়। কিংবা, গ্রামের শোষণের উপর শহরের বিলাস ঐশ্বর্যের সৌধ উত্তুঙ্গ হবে না। এমন উন্নত গ্রাম সংগঠন করাই হবে গ্রাম পরিকল্পনার প্রধান নীতি।

দ্বিতীয়তঃ, আধুনিক কালে উন্নয়নের নামে ও প্রগতির স্রোতে ভারতবর্ষে শহর ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে যে দুস্তর ও ক্ষতিকর ব্যবধান সৃষ্টি হচ্ছে, তা রোধ করা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের জাতীয় জীবনের বৃহদংশ স্বরূপ গ্রামীণ অর্থনীতি আজ যেভাবে বৃহৎ শিল্পপ্রধান শহরের অর্থনীতি দ্বারা শোষিত হচ্ছে তা আর অধিককাল চলতে দিলে জাতীয় জীবনে বিপর্যয় আসতে পারে। উভয়ের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক নষ্ট হয়ে পরস্পরকে বিষদুষ্ট করে তুলছে। এর ফলে, প্রগতির মানদণ্ডে সমতা বা ভারসাম্য দেখা যায়নি। পরিকল্পনা কমিশনের সাম্প্রতিক এক আর্থিক সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে যে, মোট জাতীয় আয়ের এক-তৃতীয়াংশের অধিক অর্থ জনসংখ্যার উপরের দিকের শতকরা দশজন লোকের মধ্যে সীমায়িত রয়েছে; আর উপর-তলার এই শতকরা দশজন অধিবাসী দেশের মোট ব্যয়ের এক-চতুর্থাংশ ব্যয় করে। অপর দিকের কি চিত্র? সেখানে দেখা যায় যে, মোট জনসাধারণের দরিদ্রতম দশ শতাংশ অধিবাসী জাতীয় আয়ের ২½%-এরও কম পরিমাণ অর্থ উপায় করছে, আর মোট ভোগ্যপণ্যের ৩%-এরও কম দ্রব্য ব্যয় করতে সমর্থ হচ্ছে। এদের মাথাপিছু গড় মাসিক আয় ছিল সাত টাকার কম। এর উপরের স্তরের শতকরা দশজন মাসে দশ টাকার কম আয় করছে। আর এইভাবে পরবর্তী উপরের দিকে শতকরা দশজন অধিবাসীর আয় ছিল যথাক্রমে ১২,

১৫, ১৮, ২১ ও ৫০ টাকা।[১] সুতরাং ভারতীয় আর্থিক জীবনের দুই অঙ্গ—গ্রামীণ ও শহর অর্থনীতি—পরস্পর পরস্পরের শোষক ও খাদক যাতে না হয় সে বিষয়ে সচেষ্ট হতে হবে। উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্বন্ধ পুনঃস্থাপিত করাই গ্রাম পরিকল্পনার মৌল নীতি হওয়া উচিত।

তৃতীয়তঃ, এজন্য কৃষিজাত উৎপাদন ছাড়াও অকৃষিজাত শিল্প-দ্রব্যের উৎপাদনের দিকে অধিক দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। গ্রামীণ অর্থনীতির পুনর্গঠনের জন্য কেবলমাত্র কৃষির উন্নতিই যথেষ্ট নয়। সেজন্য, গ্রামশিল্পজাত উৎপাদনেব ক্রমিক এবং সুসংহত উন্নতিবিধানের ব্যবস্থা করতে হবে। কেবল তা-ই নয়। শহরের বৃহৎ সংগঠিত শিল্প সমূহের অবিরাম প্রতিযোগিতামূলক আক্রমণ হতে গ্রামীণ অর্থনীতির শিল্পক্ষেত্রকে বাঁচাবার জন্য উপযুক্ত সংরক্ষণ আবশ্যক। কেন না, পূর্বের ন্যায় আমবা যদি বিচ্ছিন্নভাবে এখানে সেখানে দু একটি ঢেঁকি, ঘানি প্রভৃতি শিল্প পরিচালনা করি তবে গ্রামীণ অর্থনীতি সমগ্রভাবে এর দ্বারা উপযুক্ত রক্ষাকবচ পাবে না। সেজন্য, সুনিয়ন্ত্রিত পরিকল্পিত উপায়ে গ্রামীণ অর্থনীতিকে রক্ষণের ব্যবস্থা করাই হবে গ্রাম পরিকল্পনার মুখ্য কার্যক্রম। অর্থাৎ গ্রামের বিভিন্ন প্রকারের সম্পদ, জনবল ও অন্যান্য অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সর্বাত্মক সমীক্ষা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং তার বাস্তবে রূপদান করাই হবে গ্রাম পরিকল্পনার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য।

চতুর্থতঃ, পল্লী অর্থনীতি তথা পল্লীজীবনের সর্বাঙ্গীণ ক্ষয়িষ্ণুতা রোধ করতে হলে কৃষি ও শিল্পের সুষ্ঠু ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ চাই। অকৃষি-জাত উৎপাদনের ক্রমিক বিলুপ্তির ফলে গ্রামসমাজে যে দৈন্যদশা এসেছে, তার পরিণামস্বরূপ কৃষির ক্ষয়িষ্ণুতাও অপরিহার্য। তাই মানুষ ও সমাজের সামগ্রিক বিকাশের জন্য কৃষি ও শিল্পের সম্মিলন চাই। আর সেইজন্য আদর্শ গ্রামসমাজ রচনা করার জন্য কৃষিশিল্প-ভিত্তিক কাঠামো চাই। গ্রাম পরিকল্পনা রচনার অন্যতম মুখ্য নীতি হবে কৃষি ও শিল্পের সমন্বয়মূলক জীবনচর্যার সংগঠন।

১. Jagriti, 14-2-'63.

তা হলে গ্রাম ও শহরের সম্পর্ক সহযোগী হবে। উভয়ের মধ্যে শোষক-শোষিতের কলুষিত সম্বন্ধের স্থলে উভয়ে উভয়কে সমৃদ্ধ করবে এমন সুস্থ সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হবে। গ্রাম পরিকল্পনার লক্ষ্য ও নীতি এই উদ্দেশ্যেই গঠিত হওয়া উচিত।

গ্রাম পরিকল্পনায় স্বাবলম্বনের স্থান

বর্তমান যুগে স্বাবলম্বী বা আত্মনির্ভরশীল সমাজ গঠনের কথা বললে অনেকে উদ্ভট পরিকল্পনা বলে একে উড়িয়ে দেন। মানুষ তার নিজ প্রয়োজন মিটাবার জন্য যথাসম্ভব উৎপাদনের জন্য সচেষ্ট হবে, এই নীতির গুরুত্ব আমরা আজ আর তেমন করে অনুভব করি না। দৃষ্টিভঙ্গীর এই পরিবর্তনের কারণ হচ্ছে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ-সমূহের ব্যাপক বিস্তার লাভের ফলে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা পূর্বের তুলনায় অনেক জটিল হয়েছে। দৈনন্দিন জীবনে আমরা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য এমন নানা প্রকার জিনিসের ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়েছি যেগুলির উৎপাদন বা সংগ্রহ স্থানীয় ভাবে হওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ, আমরা আধুনিক সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অধিক মাত্রায় পরমুখাপেক্ষী হয়ে পড়ছি। আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞানের দৌলতে দেশ-বিদেশের দ্রব্যাদি আজ যে-কোন ক্ষুদ্র পল্লীতেও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন ঘড়ি, রেডিও ইত্যাদি। এমনকি স্থানীয় অঞ্চলে প্রয়োজনীয় যে সকল দ্রব্য পাওয়া যায়, আধুনিকতার অন্ধ মোহে আমরা সেই সব স্বদেশী দ্রব্য বর্জন করে কলে তৈরি জিনিস ব্যবহারের জন্য আগ্রহান্বিত হচ্ছি। যেমন, দাঁত মাজার জন্য দাঁতনের বদলে বর্তমানে অধিকাংশ শিক্ষিত পরিবারেই আধুনিক 'টুথ ব্রাশের' প্রচলন দেখা যায়। এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়।

কিন্তু প্রশ্ন হল যে, এই বৈজ্ঞানিক যুগেও স্বাবলম্বনের কোন গুরুত্ব আছে কিনা? মানুষের জীবনযাত্রাকে সহজ ও স্বচ্ছন্দ করার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞান আজ দেশ কালের ব্যবধান স্বীকার না করে এক দেশের চাহিদা ও বিলাসদ্রব্যকে অন্য দেশে নিয়ে হাজির করছে। এ কথা অবশ্য স্বাকার্য যে, আজ মানবসমাজের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির দৃষ্টিতে

ঠিক স্থানীয় উৎপাদনের উপর পুরাপুরি নির্ভরশীলতার কথা বলা যায় না। প্রয়োজন হলে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নত কোন আবিষ্কার আমরা সুদূর পল্লী অঞ্চলেও গ্রহণ করতে পারি, তা সে আবিষ্কার বিদেশী বা স্বদেশী যাই হোক না কেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও স্বাবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা আছে ও থাকবে। অর্থনীতির ক্ষেত্রেও আজ সর্বদেশেই আর্থিক স্বয়ংপূর্ণতার (economic self sufficiency) উপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। কোন দেশের আর্থিক স্থায়িত্ববিধান চিরকালের জন্য অপর দেশের আমদানীর উপর নির্ভবশীল হতে পারে না। ভারতের ক্ষেত্রেও আজ এই নীতির গুরুত্ব সর্বাধিক। খাদ্য উৎপাদনের ব্যাপারে স্বাবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা বর্তমানে সকল দেশেই স্বীকৃতিলাভ করছে। কেন না, কোন দেশ তার অবশ্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর জন্য অনন্ত কাল ধরে বৈদেশিক আমদানীর উপর নির্ভরশীল হতে পারে না। এর ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যে যে প্রতিকূল অবস্থা সূচিত হবে তা সেই দেশের অর্থভাণ্ডারের উপর প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। কোন দেশের পক্ষেই বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি অবস্থা দীর্ঘকালের জন্য কাম্য নয়। সেইজন্য সকল দেশ আমদানী অপেক্ষা রপ্তানীর দিকে বেশী নজর দেয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ইহা এক স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম।

এখন দেখা যাক দেশের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে স্বাবলম্বনের গুরুত্ব কোথায়? গান্ধীজী গ্রাম স্বাবলম্বনের উপর বরাবর জোর দিয়ে এসেছেন। এমনকি, শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি তাঁর সৃষ্ট বুনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতিতে স্বাবলম্বনের নীতিকে শিক্ষানীতির অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বুনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতির অগ্নিপরীক্ষাও স্বাবলম্বনের মাত্রার সঙ্গে যুক্ত এমন কথাও তিনি অনেকবার বলেছেন। গান্ধীজী যে শোষণহীন অহিংস সমাজব্যবস্থার কথা বলেছেন তা গঠন করতে হলে ব্যক্তি-স্বাবলম্বন হতে গ্রাম-স্বাবলম্বন ও তা ক্রমে অঞ্চল ও দেশের সীমা পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হবে। কারণ, সমাজ হতে শোষণের মূল নির্মূল করতে হলে স্বাবলম্বন একান্ত আবশ্যক। যে মানুষ ব্যক্তিজীবনে যত অধিক পরিমাণে আপনার শক্তি ও চেষ্টার উপর নির্ভরশীল, তিনি তত কম

পরিমাণে অপরের মুখাপেক্ষী হন। আর পরমুখাপেক্ষিতা বা পরনির্ভরতা যত বাড়বে, স্বভাবতঃই সেখানে শোষণের শিকড় তত দূরপ্রসারী হবে। অপরের উপর নির্ভরশীল হওয়ার অর্থ অপরকে শোষণের সুযোগ দেওয়া। আমাদের এই দেশে ভূমিহীন গরীব চাষী ও মজুর সম্প্রদায় যদি আর্থিক অনটনের দায়ে বৎসরের মধ্যে ছয়মাস কাল মহাজনের ঋণের উপর জীবন ধারণ করে তবে সেই মহাজন স্বভাবতঃই তার এই আর্থিক অসহায়তার সুযোগ নিয়ে তত বেশী শোষণ করার জন্য উদগ্রীব হবে। সেইজন্য এই সব চাষী ও মজুর শ্রেণীর লোকের জীবনকে মহাজনের ঋণের বাধ্যতামূলক বোঝা হতে মুক্ত করতে না পারলে আমরা সমাজ হতে আর্থিক শোষণের এই সর্ববৃহৎ উৎসমুখও রুদ্ধ করতে সমর্থ হব না। চাষীকে শোষণ ও মহাজনমুক্ত করতে হলে তার আর্থিক স্বাবলম্বন অবশ্য প্রয়োজন। তদ্রূপ, গ্রামগুলিকে শহরের ধনীব্যক্তিদের গ্রাস হতে মুক্ত করতে হবে। আর তা করতে গেলেই গ্রাম স্বাবলম্বনের কথা আসবে। গ্রামের বর্তমান দুরবস্থার কারণ হল, গ্রামের সম্পদ শহরে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। গ্রামের কাঁচা মাল শহরের কারখানায় গিয়ে পুঁজিপতির মূলধনের আওতায় পড়ে গ্রামকে ক্ষীণকায় অস্থিচর্মসার করে শহরকে স্ফীতকায় করছে দিনে দিনে। সেজন্য এই 'একমুখো লেনদেন' (out-way traffic) আজ বন্ধ করতে হবে। তা করতে না পারলে গ্রাম উন্নয়নের কল্পনা অবাস্তব হয়ে থাকবে। গান্ধীজী সেইজন্য যে আদর্শ গ্রামের কল্পনা করেছিলেন তা কৃষি ও শিল্পে সমৃদ্ধ হবে, শিক্ষায় দীক্ষায় উন্নত হবে, আর তা শহরের নীরব শোষণের সামগ্রী হবে না।

অনেকে এর থেকে কল্পনা করে বসবেন যে, এই পরিবর্তিত গ্রাম-সমাজে শহরের অস্তিত্ব কেমন হবে? ভারতের শহরগুলি কি তবে আর থাকবে না? তাদের কি ধ্বংস করা হবে? এরূপ প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন—

"আমার পরিকল্পনায় যে সব জিনিস গ্রামে সমান দক্ষতার সঙ্গে উৎপন্ন করা সম্ভব তা কোনরকমেই শহরে তৈরি হতে দেওয়া হবে না।

গ্রামের উৎপন্ন দ্রব্য সমূহের বিক্রয়ভাণ্ডার রূপে কাজ করাই হবে শহরের উপযুক্ত কার্যক্রম।" ১

গ্রাম পরিকল্পনা ও গ্রাম স্বাবলম্বনের অর্থ এই হবে যে, শহরের শিল্পায়নের ফলে যেন গ্রামগুলি শুষ্ক মরুভূমিতে পরিণত না হয়, যা অদ্যাবধি হয়ে আসছে। আধুনিক শিল্পায়নের এই ধ্বংসাত্মক প্রবাহকে নূতন পথে মোড় ফিরানোই হবে গ্রাম স্বাবলম্বনের লক্ষ্য। গ্রাম-শিল্প সমূহের পাশাপাশি বৃহৎ শিল্পস্বরূপ জাহাজ নির্মাণ, বিদ্যুৎ, লৌহশিল্প ইত্যাদি অবস্থানের কল্পনা গান্ধীজী নস্যাৎ করে দেন নাই। কিন্তু নির্ভরশীলতার গতিকে বদলাতে হবে। গ্রাম স্বাবলম্বন বলতে যে কোন প্রকার বৃহৎ শিল্পই থাকবে না এমন ধারণা গান্ধীজী করেন নাই। তিনি কেবল এইটুকু চেয়েছিলেন যে, গ্রামগুলি যেভাবে শোষিত হচ্ছে সেই উৎপাদন ও বণ্টন পদ্ধতির শোষণের পরিবর্তন করতে হবে। গ্রামের চাষী ও শিল্পী যারা প্রথম উৎপাদক তারা যাতে পুঁজিপতি ও শিল্পপতিদের কবলে কবলিত হয়ে নির্বিচারভাবে শোষিত না হয়, গান্ধীজী সেই উদ্দেশ্যে গ্রাম স্বাবলম্বনের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাই গ্রাম পরিকল্পনায় গ্রাম স্বাবলম্বন একটি অপরিহার্য অঙ্গ। তাঁর এই গ্রাম স্বাবলম্বন নীতি গ্রামকে রক্ষা ও উদ্ধার করার জন্যই রচিত হয়েছে বলা যায়।

প্রশ্ন করা যায় আমরা ব্যক্তিগত চাহিদা মিটাবার ক্ষেত্রে কতটুকু স্বাবলম্বী হতে পারি এই যুগে? এই সভ্যযুগে আমাদের নানাপ্রকার প্রয়োজনের সবটাই কি আমরা ব্যক্তিগতভাবে অথবা সামূহিকভাবে উৎপন্ন করতে পারি? নিশ্চয়ই তা সম্ভব নয় এ কথা সকলেই বলবেন। কিন্তু খাদ্য ও বস্ত্রের ন্যায় জীবনধারণের মৌলিক প্রয়োজনগুলির জন্য যথাসম্ভব প্রতি গ্রামেই স্বাবলম্বনের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। কেন না, সমাজের জীবনধারণের চাবিকাঠি যদি অপর কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হাতে নিহিত থাকে তবে প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগের অধিকার হতে সেই সমাজ বঞ্চিত থাকবে। সেইজন্য স্বাধীন-

১. Harijan, 28, 1.' 39

ভাবে বাঁচার অধিকার, যা সকল সমাজের পক্ষে মৌলিক অধিকাররূপে স্বীকৃত, তা হতে যাতে আমরা বঞ্চিত না হই সেইজন্যই মূলতঃ স্বাবলম্বনের আবশ্যকতা। দেশের প্রতিটি গ্রাম যদি আজ খাদ্য ও বস্ত্রে স্বাবলম্বী হবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে তবে জাতীয় উন্নয়নের পক্ষে তা কি কম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হবে? ভারতের পরিকল্পনা কমিশন আজ কৃষিজ ও খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিবিধ ব্যবস্থা করছেন। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মপদ্ধতিতে কিছু মৌলিক পরিবর্তন প্রয়োজন। এজন্য সর্বাত্মক বিকেন্দ্রিত শাসন ও আর্থিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়া চাই। গ্রামবাসীদের মনে ও প্রতি চাষীর চেতনায় উৎপাদন বৃদ্ধির উৎসাহ সৃষ্টি করা আবশ্যক, তেমনই চাষীর আবাদের সাহায্যকারী সর্ববিধ ব্যবস্থাও করতে হবে। সময়োপযোগী সার, বীজ ও জল, বা প্রয়োজনমত কৃষিঋণের জন্য চাষীকে যেন সরকারী অনুকম্পার উপর নির্ভর করে থাকতে না হয়। গ্রামসভার (Village Council) হাতে পর্যাপ্ত ক্ষমতা এজন্য অর্পণ করা আবশ্যক। খাদ্য ছাড়া আমাদের প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্য যেমন তেল, সাবান, চাষের যন্ত্রপাতি প্রভৃতি নানা প্রকার দ্রব্যের উৎপাদনের জন্য আমরা সুবিধামত কতকগুলি গ্রামের একটি অঞ্চল গঠন করতে পারি স্বাবলম্বনের সীমারেখার উদ্দেশ্যে। ভৌগোলিক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বিবেচনার পর যে অঞ্চলে যে শিল্পপ্রতিষ্ঠান সম্ভব, স্বাবলম্বনের দৃষ্টিতে সেই অঞ্চলে তদনুরূপ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। আবার যে সব দ্রব্যের উৎপাদন এই সব স্থানে একেবারেই সম্ভব নয় তার জন্য বৃহৎ শিল্প প্রয়োজন। কিন্তু এগুলি পরস্পর পরস্পরের ক্ষতিকারক না হয়ে পরিপূরক হবে। গ্রামশিল্পের পুষ্টি যেন বৃহৎ শিল্পের প্রতিষ্ঠা দ্বারা ব্যাহত না হয়। গ্রাম হতে কোন জিনিস শহরে যাবে না বা শহর হতে কোন জিনিস গ্রামে আসবে না—এরূপ পরস্পর-বিরোধিতা নাই। স্বাবলম্বনের প্রকৃত অর্থ পরস্পর অবলম্বন, যাতে শোষণ ও নিপীড়নের কলুষগন্ধ থাকবে না। এক্ষেত্রে স্বাবলম্বনের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করা একান্ত আবশ্যক।

উপরের আলোচনা হতে এখন এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, মানুষের

জীবন ধারণের পক্ষে যে জিনিস যত অত্যাবশ্যক, তার উৎপাদন তত বিকেন্দ্রিত হওয়া চাই। অর্থাৎ স্বাবলম্বনের মাত্রা তত অধিক হওয়া চাই। যেমন, বেঁচে থাকার জন্য হাওয়ার আবশ্যকতা ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেরই আছে। সেজন্য প্রকৃতির বিধানে হাওয়া পাওয়ার ব্যাপারে প্রত্যেকেই স্বাবলম্বী। কেউ কারও উপরে নির্ভরশীল নয় বলেই মানুষ বেঁচে আছে। সমাজে যে দ্রব্যের চাহিদা শুধু মাঝে মাঝে হয়, তার উৎপাদন কম বিকেন্দ্রিত হলে ক্ষতি নেই। স্বাবলম্বনের পরিধি প্রয়োজনের তারতম্যের অনুপাতে কম-বেশী ব্যাপক হবে। এই দৃষ্টিতে স্বাবলম্বন ও বিকেন্দ্রীকরণ একই জিনিসের দুই দিক মাত্র। গান্ধীজী বিকেন্দ্রিত সমাজ চেয়েছিলেন বলে স্বাবলম্বনের কথা বলেছেন।

যে সকল খাদ্যদ্রব্য সঞ্চিত করে রাখা যায় সেসবের বেলায় বা বস্ত্র ইত্যাদির জন্য পাশাপাশি গ্রামসমষ্টিকে স্বাবলম্বনের সীমা রূপে ধরা যায়। গায়েমাখা সাবান, মাথার তেল, ফিনাইল প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য হলেও এগুলি তালুকা ভিত্তিতে উৎপাদন করা সম্ভব। বাসনপত্র প্রভৃতি দ্রব্যাদি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় বলে এগুলির উৎপাদন বৃহত্তর ক্ষেত্র জুড়ে হওয়া সম্ভব। উৎপাদন কিছুটা কেন্দ্রিত ভাবে হতে পারে। যেমন, বাংলা দেশে কোন জেলায় কাঁসার বাসন, কোন জেলায় ছুরি কাঁচি, শাঁখা, আবার কোন জেলায় রেশম, মটকা প্রভৃতি বিখ্যাত। এইভাবে গৃহনির্মাণের মালমশলাও প্রধানতঃ স্থানীয় কাঁচামাল হতেই সংগৃহীত হওয়া আবশ্যক। তবে সিমেন্ট ইত্যাদির জন্য অপরিহার্যভাবে কেন্দ্রিত উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে। যে সব অঞ্চলে পাথর প্রচুর পাওয়া যায় সেখানে ইঁটের পরিবর্তে যেমন পাথরের ব্যবহার অধিক হয়, তদ্রূপ দেশের বিভিন্ন স্থানে সংশ্লিষ্ট বস্তুর সুলভতা-দুর্লভতা অনুযায়ী কোথাও মাটির দেওয়াল, কোথাও বাঁশের দরমার দেওয়াল প্রভৃতি বৈচিত্র্যের সন্ধান মিলে। এই সব ক্ষেত্রে স্বাবলম্বনের পরিধি খুব ব্যাপক হয় না। ঘড়ি, টাইপরাইটার যন্ত্র, রেডিও, টেলিফোন প্রভৃতি আধুনিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য সারা দেশের দুই একটি স্থানে উৎপাদন চললেই যথেষ্ট। অন্যদিকে, দামী ঔষধপত্র

যেগুলি হয়ত জীবনে দু-একবার প্রয়োজন হতে পারে, সেগুলির উৎপাদন বিশ্বের কতিপয় স্থানে হলেই প্রয়োজন মিটতে পারে। এক্ষেত্রে সমগ্র বিশ্ব হবে স্বাবলম্বনের পরিধি। সেজন্য বলা যায় যে, স্বাবলম্বনের ক্ষেত্র মানুষের প্রয়োজনের প্রকৃতি ও পরিমাণের সঙ্গে বিপরীত অনুপাতে পরিবর্তিত হয়। [১]

খাদ্যবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মানুষের দৈহিক পোষণের জন্য সুষম খাদ্যের (balanced diet) প্রয়োজন। আমাদের সুস্থ জীবনধারণের জন্য বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। কেবলমাত্র শস্যজাতীয় কিছু খেলে তাতে পরিপূর্ণ পুষ্টি মিলবে না। কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় ক্যালরী ঠিক থাকলেই খাদ্যতালিকা সুষম হল বলা যায় না। শস্য উৎপাদনের জন্য তুলনামূলক ভাবে অধিক জমির প্রয়োজন। তাছাড়া, বস্ত্র উৎপাদনের উদ্দেশ্যে কার্পাস চাষের জন্যও ভূমির প্রয়োজন। গ্রাম স্বাবলম্বনের কল্পনায় প্রতি অঞ্চলে আবাদযোগ্য ভূমির এমন বণ্টন হওয়া উচিত যাতে সুষম খাদ্য ও বস্ত্র উৎপাদনের যথাযথ ব্যবস্থা হয়। মানুষের এই দুটি প্রধান প্রয়োজনীয় দ্রব্য যদি গ্রামের অভ্যন্তরেই উৎপাদনের ব্যবস্থা করা যায় তবে ভারতের আর্থিক অবস্থা রূপান্তরের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম অগ্রগতি হল বলা যায়। খাদ্যের জন্য আমাদের বিদেশের বাজারে যেভাবে ধর্না দিতে হয় তা লজ্জাকর।

কিন্তু এরূপ সুষম কৃষির জন্য চাষীকে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় সরবরাহের দায়িত্ব নিতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, কৃষির ক্ষেত্রে, অধিক উপার্জনের লোভে অর্থকরী ফসল যথা, পাট, তামাক ইত্যাদির চাষ নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। খাদ্য চাষের জমিতে কোন অবস্থায় অর্থকরী ফসল করা যুক্তিসঙ্গত নয়। আর এই সর্তগুলি পালনের জন্য গ্রাম পরিকল্পনার বিশেষ প্রয়োজন। পরের পৃষ্ঠায় একটি তালিকা দেওয়া হল যাতে এক লক্ষ জনসংখ্যার ভিত্তিতে খাদ্য ও বস্ত্রে স্বাবলম্বী হওয়া সম্ভব। সুষম নিরামিষ খাদ্যের দৃষ্টিতে মাথাপিছু দৈনিক ২৮৬০

১. Ref: Khadi Gramodyog, June 1962.

ক্যালরীযুক্ত খাদ্য এবং বার্ষিক মাথাপিছু ২৫ গজ বস্ত্রের জন্য কার্পাস উৎপাদনের (আর আমিষ আহারের জন্য ছয় আউন্স দুধের পরিবর্তে চার আউন্স মাংস, অথবা মাছ ও একটি ডিম) তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মাটি ও আবহাওয়ার বিভিন্নতার কারণে কিছু তারতম্য হওয়া সম্ভব ভূমিবণ্টনে। কিন্তু সাধারণভাবে গ্রাম স্বাবলম্বনের জন্য অনুরূপ কৃষি-ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এক লাখ জনসংখ্যার ভিত্তিতে সুষম কৃষি[১]

এক লাখ জনসংখ্যা

	দৈনিক আউন্স	ক্যালরী	বার্ষিক পাউণ্ড	জমির প্রয়োজন (একরে)	বীজ ও নষ্ট বাবদ ১০% অধিক	মোট জমি	শতকরা হিসাবে বণ্টনের হার
১) খাদ্য							
শস্য	১৬	১৬০০	৩৬৫.০০	৪৩,৪০০	৬,৫১০	৪৯,৯১০	৬৫.২
ডাল	২	২০০	৪৫.৬০	৫,৪০০	৮১০	৬,২১০	৮.০
গুড়	২	২০০	৪৫.৬০	১,২০০	১৮০	১,৩৮০	১.৮
বাদাম	১	১৪৫	২২.৮০	২,৬০০	২৯০	২,৯৯০	৮.৪
তৈল	½	২৫৫	১১.৪০	৩,০০০	৪৫০	৩,৪৫০	
ঘি	½	...	১১.৪০	...	...	...	...
দুধ	১২	২৪০	২৭৩.৭৫	...	...	...	...
সবজী	৮	৪৮	১৮২.৫০	১,৬০০	২৪০	১,৮৪০	২.৪
আলু জাতীয়	৪	১০০	৯১.২৫	১,০০০	১৫০	১,১৫০	১.৫
ফল	৪	৫২	৯১.২৫	৯০০	১৩৫	১,০৩৫	১.৪
২) বস্ত্র							
কার্পাস	...	...	১২.৫০	৭,৫০০	১,১২৫	৮,৬২৫	১১.৩
মোট	...	২৮৬০	...	৬৬,৬০০	৯,৮৯০	৭৬,৫৯০	১০০.০০

১. Ref Economy of Permanence—II

শ্রম ব্যাঙ্ক

গ্রাম পরিকল্পনায় সম্পদ ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে লক্ষ্য স্থির করা হয়। পূর্ণ কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে পৌঁছানো গ্রাম পরিকল্পনার আবশ্যিক কার্যক্রম। সেইজন্য প্রত্যেক অঞ্চলে বিভিন্ন সম্পদের যেমন নিরীক্ষণ হওয়া আবশ্যক, তদ্রূপ উপস্থিত মানবশক্তিরও পরিমাপ হওয়া উচিত। পরিকল্পিত উপায়ে মোট কর্মক্ষম মানবশক্তির যথাযথ ব্যবহার করাও গ্রাম পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য। সেজন্য মানবশক্তির অপচয় না হয় এই উদ্দেশ্যে সম্প্রতিকালে শ্রম ব্যাঙ্কের (Labour Bank) কল্পনার উদ্ভব হয়েছে। ভারতের শ্রম সম্পদের ন্যায্য সদ্ব্যবহার হলে কর্মহীনতার মারাত্মক সমস্যা দূরীভূত হতে পারে। সেজন্য আধুনিক কালে শ্রম ব্যাঙ্ক একটি আশাপ্রদ উদ্ভাবন।

শ্রমের উপযুক্ত ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রয়োজন। শ্রম ব্যাঙ্ক সমগ্র অঞ্চলের জন্য বিভিন্ন কর্মের উপযোগী মোট শ্রমের চাহিদার অনুপাতে শ্রম সরবরাহের ব্যবস্থা করে। কৃষিজ উৎপাদন ব্যতীত সমাজের সুষ্ঠু উন্নয়নের জন্য বিবিধ সেবাকর্মেরও প্রয়োজন হয়। যেমন, রাস্তাঘাট নির্মাণ, পুকুর ও কূয়া খনন, গৃহনির্মাণ ইত্যাদি। সাধারণ ব্যাঙ্কে যেমন লোকের নিকট হতে জমা পাওয়া অর্থ বিভিন্ন কাজে নিয়োগ করা হয়, তদ্রূপ শ্রম ব্যাঙ্কেও মানুষ তাদের শ্রম (ঘণ্টা হিসাবে) জমা রাখতে পারে বা প্রয়োজন বোধে এই ব্যাঙ্ক হতে শ্রম ধার নিতেও পারে। ব্যাঙ্ক লোকদের তাদের আপন আপন উদ্বৃত্ত শ্রম জমা দিতে প্রেরণা দান করবে। অপরদিকে, সমাজের কাজের চাহিদা অনুযায়ী এই জমাপ্রাপ্ত শ্রমের সদ্ব্যবহার করবে শ্রম ব্যাঙ্ক। বস্তুতঃপক্ষে, ব্যাঙ্ক জমার খাতে উদ্বৃত্ত মানবশক্তি ও খরচের খাতে বিভিন্ন কর্ম পরিকল্পনা দেখিয়ে একটি বার্ষিক বাজেট প্রস্তুত করবে।

এইভাবে শ্রম ব্যাঙ্ক দুটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবে ঃ

(১) অর্থশক্তির উপর অধিকতর নির্ভরশীল না হয়ে উদ্বৃত্ত মানবশক্তির যথার্থ ব্যবহারের দ্বারা সমাজে সম্পদ বৃদ্ধির নূতন নূতন পরিকল্পনাসমূহ রূপায়ণে সাহায্য করা।

(২) প্রত্যেক পরিবারে কর্মক্ষম ব্যক্তির হিসাব করে দেখা হবে সেই গ্রামে মোট কত শ্রম-ঘণ্টা পাওয়া যায় আর কী কী উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়িত করতে হবে। এই দুই তথ্যের ভিত্তিতে শ্রম ব্যাঙ্ক কাজের পরিকল্পনা ও শ্রমের বণ্টন করবে। সর্বাপেক্ষা সহজ উপায়ে মানবশক্তিব পূর্ণ ব্যবহারের জন্য এ এক নূতন পন্থা। পূর্বে বলা হয়েছে যে সমাজে সম্পদ ও শ্রমের সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহার করা আবশ্যক। প্রত্যেক মানুষের কাছে দৈনিক গড়ে ৮ ঘণ্টা হিসাবে বছরের ৩০০ কাজের দিনের জন্য বার্ষিক ২৪০০ ঘণ্টার শ্রম জমা আছে।

সাধারণতঃ নিম্নোক্ত তিন প্রকারের কার্যক্রম শ্রম ব্যাঙ্ক গ্রহণ করতে পারে ঃ

(১) উৎপাদনমূলক নয় এমন জনকল্যাণাত্মক কাজ। যেমন, কূয়া খনন, রাস্তাঘাট, উদ্যান, জনহিতকর গৃহ নির্মাণ ইত্যাদি।

(২) উৎপাদনমূলক জনহিতকর কাজ। যেমন, সেচের পুকুর খনন, গোবরগ্যাস প্ল্যাণ্ট স্থাপন, ভূমি উন্নয়ন ইত্যাদি।

(৩) ব্যক্তিগত স্বার্থমূলক কাজ।

এইভাবে গ্রামে গ্রামে উদ্বৃত্ত মানবশক্তির সদ্ব্যবহার করা হলে একদিকে বাধ্যতামূলক বেকারি হতে শ্রমিক সমাজ অব্যাহতি পাবে; অপরদিকে, অবনত গ্রামাঞ্চলের সর্বাত্মক উন্নতিবিধানের এ একটি সুন্দর উপায় হবে। শ্রম ব্যাঙ্কের উপযোগিতা এই দৃষ্টিতে ভারতের পক্ষে খুব মূল্যবান। বেসরকারী ভাবে গঠনমূলক ক্ষেত্রে গান্ধী স্মারক-নিধি শ্রম ব্যাঙ্ক সম্বন্ধীয় পরিকল্পনা নিয়ে কিছু অগ্রসর হয়েছে। এ সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত আলোচনার জন্য 'Planning for Basic National Recovery'[১] শীর্ষক পুস্তকটি উপযোগী হবে।

কিছুদিন পূর্বে শ্রীসিদ্ধবাজ ঢাড্ঢা বিনোবাজীর সহিত দেখা করেন। বিনোবাজী ও তাঁর আলোচনার সারাংশ পরপৃষ্ঠায় দেওয়া হল।

১. Navajivan Trust কর্তৃক প্রকাশিত

ন্যাশন্যাল মিনিমাম

[বিনোবাজী : ন্যাশন্যাল মিনিমাম বলতে যা বুঝায় তা অন্য কর্মীরা তো দূরের কথা প্রেসের কাজে নিযুক্ত কর্মীরাও পায় না। আমি শাস্ত্রীজীর সঙ্গে এ সম্বন্ধে কথা বলেছিলাম। পরিকল্পনা কমিশনের লোকেরাও এসেছিলেন। সকলের নিকট আমি এ কথা বলেছি। দুইজন বয়স্ক সদস্যবিশিষ্ট পাঁচ ব্যক্তির এক পরিবার মানে তা থেকে দৈনিক ১৬ ঘণ্টার বেশী কাজ পাওয়ার আশা করা যেতে পারে না। আর মাসে ২৪ দিনের বেশী না। তা হলে মাসে গড়ে একটি পরিবার থেকে ৪০০ ঘণ্টার কাজ পাওয়া যাবে।

পরিবারের প্রতি ব্যক্তির মাসিক খরচ তিরিশ টাকা হিসাবে পরিবারের ১৫০ টাকা আয় হওয়া উচিত। অর্থাৎ এক ঘণ্টা কাজের মজুরি অন্ততঃ ছয় আনা হওয়া চাই। ইহাই ন্যাশনাল মিনিমাম।

কৃষিকাজে এর চেয়ে কম হওয়া উচিত নয়। হলে লোকে কৃষির কাজ করবে না। আমাদের নিজেদের আশ্রমে কৃষি, প্রেস ও খাদির কাজ চলে। তাতে তো অন্ততঃ এরূপ মজুরী পাওয়া আবশ্যক।]

গ্রাম স্বরাজ

গান্ধীজী যে আদর্শ উন্নত গ্রামের কল্পনা করতেন তাকে তিনি গ্রাম স্বরাজরূপে অভিহিত করেছিলেন। ভারতের প্রতি গ্রামে গ্রাম-স্বরাজ স্থাপন করাই তাঁর লক্ষ্য—এমন কথা তিনি অনেকবার বলেছেন। গ্রামগুলি যখন আত্মসচেতন আর শহরের শোষণ হতে মুক্ত হয়ে আত্মনির্ভরশীল হতে শিখবে তখন গ্রামে গ্রামে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে। সুন্দর ও সমুন্নত জীবনধারণের জন্য যা কিছু প্রয়োজন, গ্রামগুলি তখন এমন সব কিছুতেই সমৃদ্ধ হবে। গ্রামে তখন শিল্পী, কবি, কারিগর, শিক্ষাবিদ্, উন্নত চাষী প্রভৃতি সকলের সন্ধান মিলবে। এরূপ পরিপূর্ণ গ্রামীণ জীবনকে তিনি কখনও বা 'গ্রাম গণতন্ত্র'রূপে ব্যাখ্যা করে বলেছেন :

"গ্রাম স্বরাজ সম্বন্ধে আমার কল্পনা হচ্ছে এই যে, ইহা একটি পরিপূর্ণ সাধারণতন্ত্র। মৌলিক প্রয়োজনের জন্য তা প্রতিবেশীদের উপর নির্ভরশীল নয়। তথাপি অনেক কিছুর জন্য তা পরস্পরাবলম্বী, বিশেষ করে যেখানে পরের উপর নির্ভর করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এইভাবে প্রত্যেক গ্রামের প্রথম কর্তব্য হবে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য ও বস্ত্রের জন্য কার্পাস উৎপাদন করা। এর স্বতন্ত্র গোচারণ-ভূমি এবং শিশু ও বয়স্কদের জন্য খেলার মাঠ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্র থাকবে। এর পরেও যদি উদ্বৃত্ত ভূমি থাকে তবে তা প্রয়োজনীয় অর্থকরী ফসল উৎপাদনের কাজে লাগানো হবে—অবশ্য গাঁজা, তামাক, আফিম এইগুলি বাদে।

"গ্রামে একটি পল্লী নাট্যশালা, বিদ্যালয় ও জনসাধারণের সম্মিলনের জন্য গৃহ থাকবে। পরিচ্ছন্ন জল সরবরাহের জন্য গ্রামের নিজস্ব ব্যবস্থা থাকবে। সংরক্ষিত কূয়া ও পুকুরের সাহায্যে ইহা করা যায়। বুনিয়াদীর শেষ স্তর পর্যন্ত শিক্ষা হবে আবশ্যিক। যতখানি সম্ভব সকল কাজই সমবায়ের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। বর্তমানের ন্যায় কোনরূপ জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা থাকবে না। সত্যাগ্রহ ও অসহযোগের পদ্ধতি সহ অহিংসাই হবে গ্রাম সমাজের হাতে অস্ত্র-স্বরূপ। পর্যায়ক্রমে নির্বাচিত গ্রামরক্ষিবাহিনী সর্বক্ষণের জন্য থাকবে। এদের জন্য গ্রামে একটি রেজিস্টার রাখা হবে। গ্রামের শাসনব্যবস্থা পাঁচজনের নির্বাচিত সদস্য সমন্বিত পঞ্চায়েৎ দ্বারা পরিচালিত হবে। সদস্যবৃন্দ গ্রামের বয়স্ক-পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের দ্বারা বার্ষিক নির্বাচিত হবেন। এঁদের সকল প্রকার ক্ষমতা থাকবে। যেহেতু প্রচলিত অর্থে কোনরূপ শাস্তিদানের ব্যবস্থা থাকবে না, সেজন্য এই পঞ্চায়েৎ হবে তার এক বছরের কার্যকালের জন্য একাধারে আইন-সভা, বিচার-পরিষদ ও কর্ম-পরিষদ।

"গ্রাম হতে খাজনা আদায় করাই যে সরকারের গ্রামের সঙ্গে একমাত্র সম্পর্ক, সেই সরকারের বিশেষ হস্তক্ষেপ ব্যতীতই যে-কোন গ্রাম আজ এরূপ সাধারণতন্ত্র হতে পারে। আমি এখানে পার্শ্ববর্তী গ্রাম সমূহ ও সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করি নাই।

গ্রাম সরকারের একটি রূপরেখা উপস্থিত করাই আমার উদ্দেশ্য। ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর ভিত্তি করে সম্পূর্ণ গণতন্ত্র এখানে বজায় থাকবে। ব্যক্তিই হবে তার সরকারের স্থপতি। প্রত্যেক ব্যক্তি ও সরকারকে অহিংসাই নিয়ন্ত্রিত করবে। ব্যক্তি নিজে ও তার গ্রাম বিশ্বের ক্ষমতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সক্ষম হবে। গ্রামবাসী তার নিজের ও গ্রামের মর্যাদা রক্ষার জন্য স্বয়ং মৃত্যুবরণ করবে—এই বিধানের দ্বারাই প্রতিটি গ্রামবাসী শাসিত হবে।”[১]

১. Harijan, 26. 7. '42

দশম অধ্যায়

পল্লী শিল্পায়ন—নূতন পথ

পল্লী শিল্পায়নের উদ্দেশ্য

পূর্ব অধ্যায়ে গ্রাম পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক, যথা, গ্রাম স্বাবলম্বন, পরিকল্পনা ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু গ্রামের সর্বাঙ্গীণ ও সামগ্রিক উন্নয়নে কৃষির সঙ্গে শিল্প প্রসারেরও যে প্রয়োজনীয়তা আছে সে কথা আজ সর্বজনবিদিত। এ কথা আজ দেশেব বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ্ তথা পরিকল্পনা কমিশন প্রভৃতি সকলেই স্বাকার করেছেন যে, ভারতের পল্লী অঞ্চলের উন্নতি বিধান করা না হলে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের সীমা বর্ধিত করা দুরূহ হবে। আর পল্লী অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য কেবলমাত্র কৃষির উপর নির্ভর করলেই হবে না। তজ্জন্য পল্লীশিল্প তথা ক্ষুদ্র শিল্পের ব্যাপক সম্প্রসারণের অতীব প্রয়োজন আছে। পল্লী শিল্পায়নের এই বহুদিনের অনুভূত অভাবকে আমরা যদি অতি সত্বর সাফল্যের সঙ্গে দূরীভূত করতে সমর্থ না হই তবে ভারতেব আর্থিক প্রগতির প্রবাহ নিশ্চিতরূপে রুদ্ধ হবে—এ সত্য আজ ক্রমেই প্রতীয়মান হচ্ছে।

গ্রামীণ অর্থনীতি আজ ভারসাম্য রক্ষায় অসমর্থ। কেন না, কৃষি ও শিল্পের প্রগতির মধ্যে সমতা নাই। শিল্পের প্রসার এত কম যে জীবিকা নির্বাহের উপায় হিসাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল হওয়া ব্যতীত সাধারণ মানুষের গত্যন্তর নাই। আর ঠিক এই কারণেই কৃষির উপর নির্ভরশীল জনসাধারণের চাপ অত্যধিক হওয়ায় কৃষি ক্রমেই অলাভজনকরূপে আখ্যাত হতে চলেছে। আর্থিক মানদণ্ড একদিকে ঝুঁকে পড়তে থাকায় যে কোন মুহূর্তে জাতীয় জীবন মানদণ্ডচ্যুত হতে পারে। সেইজন্য পল্লী অর্থনীতিকে বহুমুখী ধারায় প্রবাহিত করা প্রয়োজন (diversification of rural economy)। জাতির সুষ্ঠু বিকাশের জন্য আর্থিক জীবনের ভিত্তি প্রসারিত হওয়া বিশেষ আবশ্যক।

পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশে কৃষিক্ষেত্র হতে জনসাধারণকে সরিয়ে এনে অন্যান্য ক্ষেত্রে সংস্থাপনের দ্বারা জাতির সামগ্রিক আয়বৃদ্ধির চেষ্টা হচ্ছে। কেন না, কৃষি-বহির্ভূত উৎপাদনের (Non-agiicultural production) সঙ্গে আর্থিক প্রগতি এবং মাথাপিছু আয়ের একটি নির্দিষ্ট সম্বন্ধ আছে। উন্নত দেশসমূহে খুব কমসংখ্যক জনসাধারণ কৃষির উপর নির্ভরশীল। ১৮৭০ সাল হতে ১৯৩০ সালের মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কৃষির উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যার হার কিরূপ কমে এসেছে নিম্নের সংখ্যাতত্ত্বটি[১] হতে তা বোঝা যাবে।

দেশ	শতকরা হার
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	৫৪ হতে ২৩
ফ্রান্স	৪২ „ ২৫
জাপান	৮৫ „ ৫১
জার্মানী	৩৯ „ ২২
গ্রেট বৃটেন	১৫ „ ৭

অর্থনীতিবিদ্‌দের মতে, দেশের সমগ্র জাতীয় আয় বৃদ্ধির সঙ্গে যে হারে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায়, কৃষিক্ষেত্রে আয় সে হারে বৃদ্ধি পায় না; অথচ কৃষি-বহির্ভূত ক্ষেত্রেও শিল্পজাত আয় জাতীয় আয় অপেক্ষা, উচ্চহারে বৃদ্ধি পায়। ভারতের ক্ষেত্রেও এই নীতির যথার্থতা প্রমাণিত হয়েছে বলে দেখা যায়। গত দশকে সমগ্র জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ছিল ৪২%। আর এই বৃদ্ধির মুলে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছে-কৃষি বহির্ভূত ক্ষেত্র। সেজন্য কৃষির উন্নতি বিধানের সঙ্গে কৃষিজাত ভোগ্যপণ্যসমূহের উৎপাদন এবং অকৃষিজাত উৎপাদনের জন্য ব্যাপকভাবে শিল্পের প্রসার বর্তমানে জরুরী প্রয়োজন। পল্লী অঞ্চলে শিল্পের এই ব্যাপক ভিত্তি সম্প্রসারিত করাই পল্লী শিল্পায়নের প্রাথমিক উদ্দেশ্য।

১ Jagriti, 9. 11. '61

পল্লী শিল্পায়ন কেন ?

ভারতেব বর্তমান আর্থিক প্রগতির বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, ভারী ও বৃহৎ শিল্পকে কেন্দ্র করে অধিক পুঁজির উপর ভিত্তি করে যে শিল্পায়নের সূত্রপাত এখানে হয়েছে তাতে ঈপ্সিত ফললাভ হচ্ছে না। সামাজিক ন্যায়বিচার, আর্থিক সাম্য প্রভৃতি লক্ষ্যে পৌঁছুতে মাঝপথে বাধার সৃষ্টি হচ্ছে। সংবিধানে স্বীকৃত অনেকগুলি মৌলনীতিই আজ পর্যন্ত অবহেলিত। কেন্দ্রিত শিল্পায়নের ফলে সমাজে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান হ্রাস পাওয়ার বদলে বৃদ্ধি পেয়েছে ; ধনবৈষম্যের সৃষ্টি হচ্ছে। সম্পদ গুটিকয়েক ব্যক্তির হাতে সীমাবদ্ধ হচ্ছে। গ্রাম হতে শহরে এসে জনসাধারণ জীবিকার সন্ধানে ভিড় করছে। ফলে, গ্রামগুলি জনমানবশূন্য প্রান্তরে পরিণত হয়ে শহরগুলিকে বাসের অযোগ্য নরককুণ্ডে পরিণত করছে। দেশের উন্নয়ন পর্বে এই প্রকার বিবিধ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়ার ফলে পরিকল্পনাবিদ্‌দের আজ শিল্পায়নের নূতন পথের সন্ধানে ব্যাপৃত হতে হয়েছে।

অপর দিকে, পল্লীর আর্থিক কাঠামোতে উন্নতি বিধানের দৃষ্টিতে সরকার খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশন, হ্যাণ্ডলুম বোর্ড, হ্যাণ্ডিক্র্যাফ্‌টস্‌ বোর্ড প্রভৃতি সংস্থার মাধ্যমে অর্থব্যয় করলেও এই সব বিভিন্ন সংস্থার কার্যক্রমে তেমন কোন পারস্পরিক সংযোগ সাধনের ব্যবস্থা না থাকায় এ ক্ষেত্রেও ঈপ্সিত ফল লাভ হচ্ছিল না।

এই অবস্থায় ১৯৬১ সালের এপ্রিল মাসে অন্ধ্রপ্রদেশের চেব্রোলুতে অনুষ্ঠিত অখিল ভারত সর্বোদয় সম্মেলনে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ যখন একটি সুসংবদ্ধ 'পল্লী শিল্পায়ন কমিশন' (Rural Industrialisation Commission) গঠনের প্রস্তাব করলেন, তখন সেই প্রস্তাব দেশের সর্বত্রই সাদরে গৃহীত হল। কারণ সরকারও অনুভব করেছিলেন যে, এরূপ বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার দ্বারা প্রকৃত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে না। অপরদিকে, ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত 'গ্রাম-সমাজের দুর্বলতম অংশসমূহের কল্যাণ' সম্বন্ধীয় স্টাডি গ্রুপের [Study Group on the Welfare of the Weaker Sections

of the Rural Community] একটি বিশিষ্ট অনুসন্ধানী রিপোর্টে এই একই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন যে, গ্রামীণ ভারতীয় অর্থনীতির সর্বাধিক প্রয়োজন হল পল্লী শিল্পায়ন। ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতিকে বর্তমান ভগ্নাবস্থা থেকে উদ্ধার করতে হলে এবং সামাজিক ও আর্থিক জীবনে অনগ্রসর মানবগোষ্ঠীকে উন্নত জীবনের সন্ধান দিতে হলে পল্লী শিল্পায়নই সর্বাধিক জরুরী প্রয়োজন। কর্মসংস্থান ও পল্লীসমাজের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন—এই দু দিক হতেই ভারতের গত পনেরো বছরের শিল্পোন্নয়ন ও এগারো বছরের পরিকল্পনার নীট ফল হয়েছে নগণ্য। এখন, পল্লী শিল্পায়নের জরুরী প্রয়োজনীয়তার পিছনকার কারণগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

(১) কর্মসংস্থানের অবস্থা :

ভারতের মোট জনগণের ৮২.৩ শতাংশ অদ্যাপি গ্রামে বাস করে। গ্রামীণ জনসাধারণের অধিকাংশই কৃষিজীবী। কেবল তাই নয়, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সমভাবে কৃষিক্ষেত্রের উপর নির্ভরশীল জনতার চাপও বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেমন, ১৯০১ সালে মোট কর্মরত জনসাধারণের ৬২.৫% যেখানে কৃষিতে নিযুক্ত ছিল, ১৯৫১ সালে তা ৭০% হয়। তাছাড়া, জনসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই হারে কৃষিক্ষেত্রে কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে না। ফলে কৃষির উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। যেমন, ১৯২১-৫১ সালের ভিতরে যেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ৪১ শতাংশ; সেখানে কর্ষিত ভূমির পরিমাণবৃদ্ধির হার মাত্র ৭%, সেচপ্রাপ্ত জমির বৃদ্ধির হার ১১% এবং দো-ফসলী জমির বৃদ্ধির হার ১৫% হয়েছে।[১] হিসাবে দেখা যায় যে, ১৯৫১ সালে প্রায় ৯ কোটি ৮০ লক্ষ লোক কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত ছিল। তন্মধ্যে প্রায় এক-চতুর্থাংশ লোক সাধারণভাবে উদ্বৃত্তরূপে গণ্য হচ্ছে।

এ তো গেল কৃষিক্ষেত্রের অবস্থা। জাতীয় নমুনা সমীক্ষার (National Sample Survey) নবম বিবরণীতে দেশে কর্মহীনতার এক ভয়াবহ নগ্নরূপ প্রকাশ পেয়েছে :

১. Ref : Khadi Gramodyog, March 1963

২ কোটি	লোকের	দৈনিক	এক ঘণ্টার কম	কাজ আছে
৪২ ,,	,,	,,	চার ঘণ্টা বা কম ,,	,,
৩ ,,	,,	মাসে	৫ দিনের কম	কাজ আছে
৩.৯ ,,	,,	,,	১০ ,, ,,	,, ,,
৫.৩ ,,	,,	,,	১৫ ,, ,,	,, ,,

অপরদিকে, দ্বিতীয় কৃষি শ্রমিক অনুসন্ধান কমিটীর রিপোর্টে পল্লী অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান বেকারির চিত্রই প্রকটিত হয়েছে। এ সম্বন্ধে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হলেও পুনরায় বলা যায় যে, ১৯৫১ সালে যেখানে মজুরির ভিত্তিতে ২০০ দিন শ্রমিকরা কাজ পেয়েছে, আপন ব্যবস্থাপনায় কাজের দিনসংখ্যা ছিল ৭৫ এবং ৯০ দিন ছিল বেকার; সেখানে ১৯৫৬ সালে তুলনামূলক দৃষ্টিতে যথাক্রমে কাজের দিনসংখ্যা ছিল ১৯৭, ৪০ এবং ১২৮ দিন (কৃষিমজুরদের জন্য)। পরিকল্পনা কমিশনের হিসাবেও দেখা যায়, তৃতীয় পরিকল্পনার শুরুতে ৭০ লাখ লোক বেকার ছিল। এই পাঁচ বছরে নূতন কর্মপ্রাথার সংখ্যা হবে ১৬০ লাখ। সুতরাং মোট ২৩০ লাখ কর্মপ্রার্থীর মধ্যে তৃতীয় পরিকল্পনা কালে কাজের ব্যবস্থা হবে ১৪০ লাখ লোকের। অতএব, সর্বশেষে ৯০ লাখ বেকার থেকে যায়। কৃষিক্ষেত্রে নূতন কাজের সম্ভাবনা যেখানে নাই, সেখানে পল্লী অঞ্চলে ব্যাপক শিল্পায়ন ব্যতীত বাঁচার পথ নাই।

(২) আয়ের নিম্নমান:

কর্মহীনতার সঙ্গে সাথারূপে গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের উপার্জনের পরিমাণও ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে; ১৯৫১ সালে কৃষিক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিকপিছু নীট আয় যেখানে ছিল বার্ষিক ৫০০ টাকা, সেখানে কল-কারখানা ও খনিতে ছিল ১৭০০ টাকা, আর সর্বভারতীয় গড় ছিল ৬৭০ টাকা।[১] দ্বিতীয় কৃষি শ্রমিক অনুসন্ধান কমিটীর রিপোর্টে দেখা যায় যে, ১৯৫৫-৫৬ সালে কৃষিশ্রমিকদের মাথাপিছু আয় ছিল মাত্র ৯৯.৪ টাকা (১৯৫০-৫১ সালে ১০৪ টাকা), ১৫ শতাংশ জনসাধারণের দিনে

১. Khadi Gramcdyeg, March 1963

২৫ নয়া পয়সার কম খরচ করার সামর্থ্য ছিল। সুতরাং এই বুভুক্ষু গ্রামীণ জনতার আয় বাড়াবার উপায় কি ?

অপরদিকে, মোট জাতীয় আয় বৃদ্ধির সঙ্গে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিকই। কিন্তু এ ক্ষত্রেও শহর ও পল্লীবাসীর আয়ের মধ্যে ব্যবধান বৃদ্ধি পেয়েছে। মোট জনসংখ্যার ১৭ শতাংশ হয়ে সর্বভারতীয় মাথা পিছু আয়ের ২০৯ শতাংশ আয় ছিল শহরবাসীর ; অথচ, মোট জনসংখ্যার ৮৩ শতাংশ হয়েও সর্বভারতীব মাথাপিছু আয়ের মাত্র ৭৭ শতাংশ আয় ছিল পল্লীবাসীর। আরও বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, পল্লীবাসীদের মধ্যে অকৃষিজীবীদের আয় কৃষিজীবীদের আয় অপেক্ষা অধিক ছিল। অতএব, কৃষিই যে দেশে জীবিকার মুখ্য উপায় সেই দেশে কৃষিজীবীদের আয় সর্বনিম্ন পর্যায়ে পড়ে আছে এ থেকে গভীর পরিতাপের বিষয় আর কী হতে পারে ?

(৩) মূলধন ও কর্মসংস্থানের হার ঃ

পল্লী শিল্পায়নের পক্ষে তৃতীয় যুক্তি এই যে, কৃষির উপর উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার চাপ কমাতে হলে ব্যাপকভাবে পল্লী শিল্পায়নের প্রয়োজন। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, পাশ্চাত্য দেশসমূহে অনুসৃত শিল্পায়নের পথ দরিদ্র অনগ্রসর দেশে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। অবশ্য, দেশের আর্থিক কাঠামো গঠনের দৃষ্টিতে কিছু ভারী শিল্পের প্রয়োজনীয়তা সর্বদাই থাকবে। কিন্তু সাধারণভাবে অধিক পুঁজিসমন্বিত বৃহৎ শিল্প যেমন দেশে বেকারির সমস্যা সমাধানে সক্ষম হয় না, তেমনি দরিদ্র দেশের পক্ষে এত অধিক পরিমাণ পুঁজির সংস্থান করা সাধ্যাতীত। একজন লোককে কাজ দিতে হলে আধুনিক বৃহৎ ভারী শিল্পগুলিতে নিম্নপ্রকারের মূলধনের প্রয়োজন হয় ঃ

ইস্পাত শিল্প—১,৬০,০০০	টাকা
সার কারখানা—৪০,০০০	,,
সরঞ্জাম তৈরির কারখানা—২৫,০০০	,,
ভারী যন্ত্র নির্মাণ—১,০০, ০০০	,,
লৌহ ঢালাই কারখানা—১,০০, ০০০	,,

কয়লা খনির যন্ত্রপাতি—৬০, ০০০ টাকা

ভারী বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি—৫০, ০০০ „ ।[১]

হিসাবে সাধারণভাবে দেখা গেছে যে, ভারী শিল্পে মাথাপিছু প্রায় ৭৬,০০০ টাকার মূলধন বিনিয়োগ করার প্রয়োজন হয়। সুতরাং যে-কোন পরিকল্পনা রচয়িতাই ভারতের ন্যায় দরিদ্র দেশে এই বিপুল পুঁজি সংগ্রহের ঝুঁকি নিতে কতখানি রাজী হবেন তা সহজেই অনুমান করা যায়। সেইজন্য ভারতের পবিকল্পনা কমিশনের প্রাক্তন ডেপুটি চেয়ারম্যান শ্রীগুলজারিলাল নন্দ পল্লী শিল্পায়ন সম্বন্ধে সম্প্রতি এক সভায় বলেছেন, "পুঁজির অভাব ও ক্রমবর্ধমান বেকারির আর্থিক তথা সামাজিক গুরুত্ব সম্বন্ধে দেশবাসী ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের সমালোচনা সম্যক্ উপলব্ধি করে নাই। তুলনামূলক ভাবে স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগের দ্বারা অধিক সংখ্যক লোকের কাজের ব্যবস্থা করাই হবে বর্তমান অবস্থায় বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম।"[২]

বৃহৎ শিল্পে কর্মসংস্থানের সুযোগ কতটুকু সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। গত ১০০ বছরের শিল্পায়নের ফলে ভারতে আজ পর্যন্ত বৃহৎ শিল্পসমূহে প্রায় ৩৫ লাখ লোকের কর্মের সংস্থান হয়েছে। গত দশকে যখন শিল্পায়নের গতি তীব্র ছিল তখন মাত্র ৭ লাখ লোকের অতিরিক্ত কর্মের সংস্থান হয়েছে। আর এই হারে ভারতে নিকট ভবিষ্যতে সম্ভবতঃ দেড়-দুই কোটি লোকের কর্মের ব্যবস্থা হতে পারে। সেজন্য, এই পরিমাণ বিপুল পুঁজির ব্যবস্থা, বিদেশী মুদ্রার সংকট, উন্নত যন্ত্রপাতির জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরী জ্ঞানেব অভাব প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করলে বৃহৎ শিল্পায়নের পথ ভারতের পক্ষে যে বিশেষ সুবিধাজনক হবে না এ বিষয়ে আজ প্রায় সকলেই একমত।

(৪) আর্থিক ও সামাজিক বৈষম্য ঃ

বৃহৎ শিল্পায়নের পরিণাম স্বরূপ সমাজে বিবিধ প্রকারের বৈষম্য পরিস্ফুট হয়। বৃহৎ শিল্পগুলি এইভাবে পুঁজির বোঝা নিয়ে যে

১ Jagriti, 9. 11.'61

২. Jagriti, 1. 8. 63

সকল অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হয়, দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় সেগুলি সমৃদ্ধিশালী হওয়ায় আঞ্চলিক বৈষম্য দেখা যায়। ফলে দেশের কোন কোন অঞ্চল যেমন শিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্যে খুব অগ্রসর হয়, অপর অঞ্চল সমূহ তদনুপাতে অনগ্রসর থাকায় শিল্প-প্রগতির ভারসাম্য নষ্ট হয়। দেশের সর্বত্র ক্ষুদ্র ও পল্লী শিল্পের ব্যাপক প্রসার হলে এরূপ বৈষম্যের সৃষ্টি হয় না। শহর ও গ্রামের জীবনমানে আকাশ-পাতাল ব্যবধান থাকা উচিত নয়। উজ্জ্বল শহর জীবনের পাশেই মুমূর্ষু পল্লীর কাতর ক্রন্দন সুস্থ সমাজজীবনের লক্ষণ নয়।

এছাড়া, এরূপ প্রভূত পুঁজি বিনিয়োগের ফলে দেশে মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধি এবং বেকারির প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। বর্তমান ভারতের আর্থিক অবস্থাই এর প্রমাণ। পশ্চিম ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা প্রভৃতি শিল্পোন্নত দেশে মাঝে মাঝে এইরূপ কারণেই আর্থিক সংকট দেখা গেছে। রাশিয়াতেও ভারী শিল্পের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপের ফলে আর্থিক ক্ষেত্রে সংকট উপস্থিত হয়েছে। সরকারকেও এই সকল সংকট উত্তীর্ণ হতে নানাবিধ আইন-গত সংস্কারের সাহায্য নিতে হয়েছে। কেন্দ্রিত বৃহৎ শিল্পায়নের ফলে উদ্ভূত বৈষম্য দূরীকরণের জন্য তাই ব্যাপক ভিত্তিতে পল্লী শিল্পায়নের প্রয়োজনীয়তা আজ দেখা দিয়েছে।

পল্লী শিল্পায়নের অর্থ ও লক্ষ্য

পল্লী শিল্পায়নের প্রকৃত অর্থ কি? পল্লী শিল্পায়ন বলতে গ্রামশিল্পের প্রসার—কেবলমাত্র এইটুকুই কি বোঝায়? পল্লী শিল্পায়নের অর্থ হচ্ছে ভারতের সমস্ত গ্রামাঞ্চলে সমভাবে শিল্প-ব্যবস্থার পত্তন। শিল্পাঞ্চল বর্তমানে প্রধানতঃ শহরকেন্দ্রিক, তৎপরিবর্তে দেশের সর্বত্র শিল্পপ্রথাকে ছড়িয়ে দেওয়াই পল্লী শিল্পায়নের উদ্দেশ্য। পল্লী অঞ্চলে কিছু বৃহৎ শিল্প প্রবর্তন করলে তার দ্বারাও পল্লী শিল্পায়নের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। কিংবা পল্লী শিল্পায়নকে নিছক 'পল্লীর শিল্প' অথবা 'কৃষিজাত খাদ্যশস্যের শিল্প' এই ধারণার মধ্যে সীমায়িত রাখা ঠিক হবে না। বরং অসংখ্য প্রকারের শিল্প গ্রামাঞ্চলে

চলবে যাতে করে গ্রামে গ্রামে কর্মসংস্থান ও সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্য পূর্ণ হতে পারে।

দুটি জিনিসের উপর নির্ভর করবে পল্লী শিল্পায়নের ভিত্তিঃ (১) স্থানীয় সম্পদ—মানবসম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদ এবং (২) স্থানীয চাহিদা। প্রধানতঃ পল্লী অঞ্চলের সম্পদের ব্যবহারেব দ্বারা স্থানীয চাহিদা পূরণ করাই এই শিল্পায়নের কার্যক্রম। কিন্তু প্রয়োজন বোধে শহরাঞ্চল হতে লোহা, ইস্পাতজাত বিভিন্ন সরঞ্জাম যেমন আনা হবে, তেমনি পল্লীতে উৎপন্ন দ্রব্যাদি উদ্বৃত্ত হলে নিকটবর্তী শহরের বাজারেও পাঠানো হবে। এইভাবে শহর ও গ্রামের মধ্যে আর্থিক ব্যবস্থা সহজ ও স্বাভাবিক হযে আসবে। বর্তমানের ন্যায কেবলমাত্র শোষক ও শোষিতের ভূমিকা থাকবে না। পল্লী শিল্পায়নের লক্ষ্য ও অন্তিম পরিণাম এই হবে যে, বর্তমানের কেবলমাত্র কৃষিনির্ভর গ্রামীণ সমাজকে যথোচিত ভারসাম্যযুক্ত কৃষিশিল্পমূলক ও শহর-গ্রামীণ (Agro industrial and urbo rural) সমাজে রূপান্তরিত করা। এই দৃষ্টিতে দেশেব সর্বাঙ্গীণ আর্থিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতে যে ব্যাপক পরিবর্তনেব সূচনা হবে তার মূল্য হবে সুদূরপ্রসারী। বর্তমানে প্রয়োগবিজ্ঞানের (Technology) পূর্ণ সুযোগ-সুবিধাগুলি গ্রামীণ পরিবেশে গ্রামীণ সম্পদের সদ্ব্যবহারেব উদ্দেশ্যে সম্ভবমত প্রযুক্ত হতে কোন বাধা নেই। গ্রাম হতে যতখানি সম্ভব পুঁজি আহরণের পর অতিরিক্ত পুঁজির জন্য সমবায় সমিতি প্রভৃতির সাহায্য লওয়া হবে। কিন্তু পল্লী শিল্পায়নের নামে এমন কোন শিল্প স্থাপন করা উচিত হবে না যাতে পল্লী অর্থনীতির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে কিংবা পল্লী অঞ্চলের যোগান ও চাহিদার মধ্যে কোন সম্পর্ক থাকবে না। এই সতর্কতা অবলম্বন করা বিশেষ প্রয়োজন।

তদ্রূপ, শিল্পে কি ধরনের প্রয়োগবিজ্ঞানের ব্যবহার করা হবে, বৈদ্যুতিক শক্তি কোন্ ক্ষেত্রে ও কি পরিমাণে প্রযুক্ত হবে সে সম্বন্ধে কোন অন্ধ গোঁড়ামির দ্বারা চালিত হওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না। এক্ষেত্রে একমাত্র সর্ত এই হবে যে, (১) কর্মসংস্থান ও কর্মদক্ষতা এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা এবং (২) কতকগুলি সামাজিক মূল্যকে

সংরক্ষণ করা ও বৃদ্ধি করা ; যেমন, রাজনৈতিক ও আর্থিক স্ব-শাসন ও বিকেন্দ্রীকরণ ; আর্থিক শোষণ দূর করা ; আর্থিক ও সামাজিক সাম্য ; উৎপাদকবর্গের মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ববোধ জাগ্রত করা।

পল্লী শিল্পায়নের প্রবাহ ও প্রগতিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে শহরাঞ্চলের বৃহৎ শিল্পের হাত থেকে সংরক্ষণমূলক উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা চাই। এ বিষয়ে 'সাবসিডি' বা 'রিবেট'ই যথেষ্ট নয়। এতদ্ব্যতীত, পরিকল্পনার যে ধারণা ও পদ্ধতি প্রচলিত আছে তাতেও আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন।

পল্লী শিল্পায়নের জন্য একক বলতে কেবলমাত্র এক একটি গ্রাম হবে এমন কথা নয়। এ বিষয়ে অভিজ্ঞ মত হচ্ছে যে, জেলা হবে পরিকল্পনার মূল একক ; তার সঙ্গে ব্লক ও গ্রামগুলি শাখা-এককরূপে সন্নিবিষ্ট থাকবে।

পরিশেষে এ কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পল্লীর বর্তমান ভেঙে-পড়া আর্থিক ও সামাজিক জীবনে প্রাণসঞ্চারের উদ্দেশ্যে পল্লী শিল্পায়নের কল্পনাকে সার্থক করে তুলতে হলে একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন স্ব-নিয়ন্ত্রিত সংগঠনের প্রয়োজন, যার উপর সামগ্রিক দায়িত্ব অর্পণ করা সম্ভব হবে।

অনুন্নত অঞ্চলের উন্নতিবিধানের জন্য সর্বক্ষেত্রেই যে এরূপ বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় তা আধুনিক উন্নত দেশের ইতিহাসও প্রমাণ করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৩৫ সালে মাত্র ১০'৯ শতাংশ কৃষিফার্মে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু সেই বছরেই তথায় 'রুর‍্যাল ইলেকট্রিফিকেশন এ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন্' গঠনের পরে অবস্থার রূপান্তর ঘটল। আর পনের বছরের মধ্যেই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ৫০৫৩৬৭৬টি ফার্ম (অর্থাৎ ৮৬'৩ শতাংশ) বিদ্যুৎ সরবরাহের দ্বারা উপকৃত হল। পল্লী অঞ্চলে কৃষি-বহির্ভূত শিল্পব্যবস্থার ত্বরিৎ প্রগতির জন্য যথোপযুক্ত শক্তি সরবরাহের প্রশ্নও অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতে পরিকল্পনা কমিশনও অবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করে পল্লীশিল্প পরিকল্পনা কমিটী গঠনের দ্বারা সমগ্র দেশে পরীক্ষামূলক-

ভাবে ৪০টি পাইলট কেন্দ্র গঠনে ব্রতী হয়েছে। কিন্তু এতেও বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার বদলে সর্বাত্মক পরিকল্পনার দ্বারা সর্বাঙ্গীণ প্রচেষ্টা হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

পল্লী শিল্পায়নে শক্তির প্রয়োগ

গ্রামীণ অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যেই পল্লী শিল্পায়নের প্রবর্তন করা হয়েছে, এ সম্বন্ধে পুর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। পল্লী শিল্পায়নে কেবলমাত্র যে নির্দিষ্ট কয়েকটি গ্রামশিল্পই চলবে, এমন কথাও নয়। পল্লীর সর্বাঙ্গীণ চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে স্থানীয় সম্পদের পুর্ণ ব্যবহার করার জন্য স্বভাবতঃই বিভিন্ন প্রকারের ক্ষুদ্র শিল্পও প্রবর্তিত হতে পারে। এজন্য, শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সমগ্র উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনমত শক্তির (Power) প্রয়োগের প্রয়োজন হবে। গ্রামশিল্পের ক্ষেত্রেও উন্নত যন্ত্রপাতি প্রবর্তনের প্রয়োজন যেমন সবিশেষ আছে, তদ্রূপ উৎপাদনের কোন কোন বিশেষ প্রক্রিয়ায় শক্তিচালিত যন্ত্রের সাহায্য নিতে হতেও পারে।

কিন্তু পল্লী অঞ্চলে আজ পর্যন্ত এ বিষয়ে তেমন কোন সুসংবদ্ধ প্রচেষ্টাই হয়নি বলা চলে। মানবশক্তির বা পশুশক্তির ব্যবহার অবশ্য পুরাকাল হতেই প্রচলিত আছে। কিন্তু বর্তমান কালে শক্তিচালিত যন্ত্র বলতে স্বভাবতঃই বিদ্যুতের কথা অনেকের মনে আসবে। ভারতে পরিকল্পনার যুগ শুরু হওয়ার পর হতে বৃহৎ নদী উপত্যকা পরিকল্পনা-গুলি রূপায়ণের ফলে বিদ্যুৎশক্তির উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে সন্দেহ নাই। এমনকি, বিভিন্ন ছোট বড় শহরের ন্যায় গ্রামাঞ্চলের পাশ দিয়েও বিদ্যুৎবাহী স্তম্ভের সারিবদ্ধ রেখা দেখা যায়। নিরন্ন পল্লী-বাসীর অন্তরে বিজ্ঞানের এই নব অবদান কি আশার আলো জ্বালাতে সক্ষম হবে? বর্তমানে ক্ষুদ্র শহরগুলিতে বিভিন্ন ক্ষুদ্র শিল্পে বিদ্যুৎ-শক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু পল্লী শিল্পায়নের ন্যায় দেশের অতীব প্রয়োজনীয় একটি কার্যক্রমে আমরা বিদ্যুৎশক্তির সরবরাহ সম্বন্ধে কতটুকু আশান্বিত হতে পারি? অদ্যাবধি, উৎপাদিত বিদ্যুৎ-

শক্তির অধিকাংশই বৃহৎ শিল্প ও বড় বড় শহরের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাছাড়া, বৃহৎ কল কারখানা ও শহরের জন্য যে খরচের হারে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়, ছোট ছোট শহরের বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য তার চেয়ে অধিক চার্জ ধরা হয়। এ ক্ষেত্রেও, বৈষম্যমূলক আচরণ দেশের সর্বত্র শিল্পায়নের গতিকে রুদ্ধ করবে। হিসাবে দেখা যায় প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে প্রায় ৬০০০-৭০০০ গ্রামে বিদ্যুৎশক্তি পৌঁছেছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে আরও প্রায় ১০,০০০ গ্রামে পৌঁছাবে। আর তৃতীয় পরিকল্পনা কালে ১৯৬৩ মার্চ মাস পর্যন্ত ভারতের সমগ্র এলাকার মধ্যে মোট ৩২৫০০ গ্রাম ও শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছে বলে আশা করা হয়।

গ্রামের হিসাবে দেখা যায় যে, ভারতের মোট গ্রামসমূহের মধ্যে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে মাত্র ১% গ্রাম বিদ্যুৎ সরবরাহের সুযোগ পাবে। তৃতীয় পরিকল্পনার অন্তে পাঁচ হাজারের অধিক জনসংখ্যা বিশিষ্ট সকল গ্রাম ও শহরে এবং ২০০০-৫০০০ জনসংখ্যা বিশিষ্ট অঞ্চল-সমূহের ৫০% অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে বলে আশা করা হয়েছে। [জাগৃতি, ১২, ৯, '৬৩]

সুতরাং, দেশের মোট ৫,৬০,০০০ গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের যে আশু ব্যবস্থা করা সম্ভব এমন আশা করা যায় না। অবশ্য, যে সব গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্ভব হবে সেখানে যথাসম্ভব সমতার ভিত্তিতে শোষণবিহীন পদ্ধতিতে বিদ্যুতের বিবেকযুক্ত ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত হবে।

অবশ্য, পল্লী শিল্পায়নের ব্যাপক প্রগতির উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ ব্যতীত স্থানীয় ভিত্তিতে উৎপন্ন অন্যান্য শক্তির সন্ধানের জন্য যথোচিত গবেষণার কাজ চালাতে হবে। যেমন, সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলসমূহে বায়ুশক্তির (Wind power) উপযুক্ত প্রয়োগ অদ্যাবধি তেমন হয়নি বললেই চলে। অথচ, এই সহজলভ্য বায়ুশক্তির সম্ভাবনা ভারতের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে যথেষ্ট আছে।

তৃতীয়তঃ, পল্লী শিল্পায়নের ক্ষেত্রে আর একটি শক্তির উৎস আছে যার প্রচলনের জন্য অদ্যাপি তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।—গোবর ও

অন্যান্য আবর্জনা হতে উৎপন্ন গোবর গ্যাস। কৃষিপ্রধান গ্রামীণ অর্থনীতিতে গো-সম্পদ শক্তি সরবরাহের ক্ষেত্রে একটি বড় উৎসস্বরূপ। সেই গোবর গ্যাস পল্লী শিল্পায়নের জন্য অতীব উপযোগী শক্তিরূপে অদূর ভবিষ্যতে গণ্য হবে বলে আশা করা যায়। বিকেন্দ্রিত শক্তি সরবরাহের ক্ষেত্রে গোবর গ্যাস পল্লীশিল্পের জন্য একটি উৎকৃষ্ট শক্তির মাধ্যম বলা যায়। দূর ভবিষ্যতে বিজলী সরবরাহের অপেক্ষায় বসে না থেকে গ্রামশিল্পীদের জন্য এই সহজলভ্য শক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। গোবর গ্যাস পরিকল্পনার ব্যাপক রূপায়ণের দ্বারা বর্তমানের দারিদ্র্যভারপ্রপীড়িত গ্রামগুলিকে কৃষি-শিল্পমূলক আর্থিক ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করা সম্ভব হবে; যার জন্য কোনরূপ বিদেশী মূলধনের যেমন কোনও প্রয়োজন হবে না তেমনি গ্রামবাসীরা স্বল্প পুঁজির দ্বারা আপন কুটিবেই শক্তি উৎপাদনের সুযোগ লাভ করবে। পল্লী শিল্পায়নের জন্য পল্লীর অভ্যন্তরেই এরূপ এক শক্তি বিকেন্দ্রিত শোষণহীন সমাজ গঠনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হবে।

গোবর ও অন্যান্য আবর্জনা হতে 'মিথেন' জাতীয় এক প্রকারের গ্যাস সৃষ্টি হয়। এর তাপশক্তি সাধারণ কয়লা অথবা শহরাঞ্চলের আবর্জনাজাত গ্যাস হতে প্রায় দেড়গুণ অধিক। উপরন্তু, সাধারণ কম্পোস্ট সার অপেক্ষা এই সার দুর্গন্ধযুক্ত হওয়ায় ও কোন-রকম আঁশ থাকে না বলে সার হিসাবে অধিক উপযোগী। গোবর গ্যাসের ব্যবহার প্রধানতঃ তিন ক্ষেত্রে হয়ঃ (১) রন্ধনকার্য, (২) আলো প্রজ্বলন এবং (৩) ইঞ্জিনচালনা। গ্রামাঞ্চলে রান্নার কাজে যে পরি-মাণ গোবর জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয় তা সার হিসাবে জমিতে প্রযুক্ত হলে ফলন বৃদ্ধির পক্ষে খুব ফলপ্রদ হত। ভারতে প্রায় ৮০ কোটি টন গোবর উৎপন্ন হয়। এক টন গোবর হতে ৩,১২২ ঘনফুট গ্যাস তৈরী হয় যা দিয়ে প্রায় ত্রিশটি পরিবারের রান্না ও আলোব কাজ চলে। ছোট পরিবারের জন্য ৫০০-৬০০ টাকার মধ্যে কাজের উপযোগী গ্যাস প্ল্যাণ্ট বসানো যায়। এরূপ প্ল্যাণ্টে গোবর ব্যতীত মানুষের মলমূত্রের দ্বারাও গ্যাস উৎপন্ন হয়। দেখা গেছে যে,

সুসংগঠিত ভাবে করলে ১০০০ ব্যক্তির মলমূত্র হতে যে গ্যাস তৈরী হবে তা দিয়ে একটি অশ্বশক্তির ইঞ্জিন আটঘণ্টা চলতে পারে। জল-সেচের জন্য, খড় কাটা বা শস্য ভাঙা প্রভৃতি কাজে এই গ্যাস বিশেষ উপযোগী হবে। গ্যাস স্টোভও বর্তমানে প্রস্তুত হচ্ছে। সম্পূর্ণ গ্যাস ইঞ্জিন নির্মাণ সম্ভব না হলেও কেরোসিন ও পেট্রোল ইঞ্জিনকে গ্যাসোপযোগী করা হয়েছে। এই ব্যাপারে লখ্‌নউয়ের 'প্ল্যানিং রিসার্চ এ্যাণ্ড এ্যাকশন্ ইনস্টিটিউট' নামে সংস্থা গবেষণামূলক প্রচেষ্টা করছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার সমূহ এবং খাদি গ্রামোদ্যোগ কমিশনও গ্রামাঞ্চলে গোবর গ্যাস পরিকল্পনার সফল রূপায়ণের প্রতি বিশেষ তৎপর হয়েছেন। পল্লী অর্থনীতির সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য গ্রামীণ পরিবেশে গোবর গ্যাস জাতীয় শক্তির যে উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে তার যথার্থ প্রয়োগে অবনত পল্লীজীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হবে।

মধ্যবর্তীকালীন প্রয়োগবিদ্যা

পল্লী শিল্পায়নের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বর্তমানে কোন দ্বিমত না থাকলেও এর জন্য কি প্রকারের প্রয়োগবিদ্যার (Technology) সাহায্য লওয়া হবে তা নিয়ে মতদ্বৈধ আছে। তবে পল্লী শিল্পায়নের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্যক্‌নীতি নির্ধারিত হলে তার যন্ত্রবিদ্যা কী ধরনের হওয়া বাঞ্ছনীয় তা বহুলাংশে স্থির হয়ে যায়।

বৃহৎ পুঁজিনির্ভর কেন্দ্রিত শিল্পোদ্যোগের ফলে আর্থিক অসাম্যের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ভারসাম্য নষ্ট (imbalance) হতে চলেছে। কোন অঞ্চল শিল্পকারখানায় অতিশয় উন্নত হয়ে উঠেছে অথচ সেই সময়ে তারই পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি অনগ্রসরতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। এজন্য দেশের সর্বত্র সমভাবে শিল্পায়নের প্রসার ও মানবশক্তি তথা প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহারই হচ্ছে পল্লী শিল্পায়নের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। মানবশক্তি, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং মূলধন এই তিনের পারস্পরিক সম্বন্ধের উপর নির্ভর করে শিল্পে টেকনলজির মান। নিম্নের পরিসংখ্যান হতে দেখা

যাবে বিশ্বের কয়েকটি উন্নত দেশের তুলনায় ভারতের আর্থিক চিত্র :

দেশ		মাথাপিছু ভূমির পরিমাণ (একরে)		প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যা
রাশিয়া	...	২৭'৮	..	২৩
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	...	১৩'০	...	৪৯
গ্রেট বৃটেন	...	১'২	...	৫৫৪
ভারতবর্ষ	...	১'৭	...	৩৭৩

[Population Review]

এছাড়া, ভারতের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশে মূলধনেরও অভাব যথেষ্ট।

সম্প্রতি পল্লী শিল্পায়নের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য টেকনলজি সম্বন্ধে কেউ কেউ মধ্যবর্তীকালীন টেকনলজি (Intermediate Technology) গ্রহণের প্রস্তাব করেছেন। উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে এটি একটি নূতন পরিভাষা। মধ্যবর্তীকালীন টেকনলজির অর্থ এরূপ করা হয় যে, পাশ্চাত্যের শিল্পোন্নত দেশের 'উন্নত' প্রয়োগবিদ্যা এবং প্রাচ্যের 'অনুন্নত' প্রয়োগবিদ্যা এই দুই প্রকারের মধ্যবর্তী যান্ত্রিক পর্যায়। ভারতের বর্তমান অবস্থায় পল্লী অঞ্চলে যেখানে কৃষিজ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের সঙ্গে উদ্বৃত্ত মানবশক্তি বিদ্যমান, সেখানে এরূপ এক মধ্যবর্তী টেকনলজির দ্বারা দেশের সর্বত্র সমভাবে শিল্পোদ্যোগ বিস্তৃত হবার পথ প্রশস্ত হবে; মূলধনের জন্য বিদেশের দ্বারে দ্বারে ধর্না দিতে হবে না; এবং দেশে কৃষিশিল্প-কেন্দ্রিত অর্থনীতির দৃঢ় ভিত্তি গড়ে উঠবে। স্থানীয় কাঁচামাল ও শ্রমশক্তি এবং নিম্নতম মূলধন প্রয়োগে এক উৎপাদনদক্ষ শিল্পব্যবস্থা রচনা করাই হবে এরূপ টেকনলজির কৌশল। এই অবস্থায় গ্রামীণ শিল্প ও ক্ষুদ্রাকার শিল্পের মধ্যে সুসমঞ্জস সম্বন্ধ স্থাপন করতে হবে। প্রয়োজনবোধে গ্রামীণ শিল্পের প্রয়োগপদ্ধতিতে সময়োপযোগী পরিবর্তন সাধিত হতে পারে, অবশ্য বিকেন্দ্রিত অর্থনীতির আদর্শ ও লক্ষ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে।

বিদেশী প্রয়োগবিদ্যার যান্ত্রিক উৎকর্ষ বেশী হলেও তা খুব ব্যয়-সাপেক্ষ বলে অনুন্নত দেশগুলির পক্ষে তা নির্বিবাদে গ্রহণ করা সম্ভব

হয় না। অনেকে মনে করেন যে, উন্নত দেশের জন্য যা উত্তম ব্যবস্থা উন্নয়নশীল দেশের পক্ষেও তাই বুঝি উত্তম। কিন্তু আসল প্রশ্ন এই: শ্রমিকপিছু, ভারতে কী পরিমাণ মূলধন ব্যয় করা সম্ভব? আর এর উপরই কি নির্ভর করবে শিল্পে কী ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হবে তা?

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার একটি হিসাবে দেখা যায়, বিভিন্ন শিল্পে শ্রমিকপিছু পুঁজির পরিমাণ এরূপ ধরা হয়েছে:

শিল্পের নাম		মাথাপিছু পুঁজির পরিমাণ
ইস্পাত	...	টাকা ১,৬০,০০০
সার উৎপাদন	...	,, ৪০,০০০
মেসিন টুলস্	...	,, ২৫,০০০
ভারী যন্ত্রপাতি নির্মাণ	...	,, ১,০০,০০০
ফাউণ্ড্রি কারখানা	...	,, ১,০০,০০০
কয়লাখনির যন্ত্রপাতি	...	,, ৬০,০০০
ভারী বৈদ্যুতিক যন্ত্র	...	,, ৫০,০০০
ক্ষুদ্রাকার শিল্প	...	,, ৫,০০০
হস্তশিল্প	...	,, ১,৫০০
দড়ি তৈয়ারী ও রেশমশিল্প	...	,, ১,০০০

মানুষের দৈনন্দিন কর্মক্ষেত্রে যেমন, কৃষিক্ষেতে, আপিসে, রন্ধনশালায় ও গৃহে কী ধরনের টেকনলজির সাহায্য লওয়া হবে তা নির্ভর করবে তার আর্থিক সঙ্গতির উপর। ভারতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় বৃহৎ শিল্প ও খনিজ খাতে ৪১১৫ কোটি টাকা বিনিয়োগে যে পরিমাণ কর্মের সংস্থান হয়েছে তাতে মাথাপিছু পুঁজির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৩০,০০০ টাকা। এই পরিমাণ পুঁজির উপর নির্ভরশীল প্রয়োগবিদ্যায় ভারতের ন্যায় দেশে কোটি কোটি লোকের কাজের ব্যবস্থা করা বর্তমান আর্থিক স্থিতিতে অবাস্তব কল্পনা নয় কি? বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ শ্রীশুমাখের ভারতের আর্থিক সঙ্গতির পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাপক ভিত্তিতে শিল্পায়নের জন্য মাথাপিছু পুঁজির পরিমাণ ১০০০ টাকা হতে ২০০০ টাকা পর্যন্ত প্রস্তাব করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি

মন্তব্য করেছেন, "ব্যাপক ভাবে শিল্পায়ন তখনই সম্ভব যখন যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের ব্যাপারে দেশ বহুলাংশে আত্মনির্ভরশীল হবে, যাতে করে সরঞ্জাম মেরামত, বদল বা তা চালু রাখার জন্য নিকটবর্ত্তী অঞ্চলেই ব্যবস্থা করা যায়।" [Reflections on the problem of bringing industries to Rural Areas]

অবস্থার এই সর্বাঙ্গীণ বিচারে নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে, পল্লী শিল্পায়নের ক্ষেত্রে ভারতে গ্রামীণ তথা ক্ষুদ্রাকার শিল্পের উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে। তাছাড়া, পল্লী অঞ্চলে শিল্পের জন্য বিদ্যুৎশক্তির সরবরাহ আগামী দশ, পনের বছরেও খুব ব্যাপক হবে এমন আশা করা যায় না। অথচ ব্যাপক শিল্পপ্রসারের জন্য স্থানীয়ভাবে লভ্য শক্তির উৎসের সন্ধান করা সমান প্রয়োজন। গোবর গ্যাস প্ল্যাণ্ট, সূর্যতাপশক্তি ও বায়ুশক্তির ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শক্তিসমূহ বিদ্যুৎ-শক্তির অভাব বহুলাংশে দূর করতে পারে। শ্রীশুমাখের এই প্রসঙ্গে বলেছেন, "ভারতের সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য আণবিক শক্তি অপেক্ষা এই সব শক্তি সম্বন্ধে গবেষণা অধিকতর উপযোগী হবে। কেন না, আণবিক শক্তির গবেষণায় সর্বোচ্চ পরিমাণ পুঁজির প্রয়োজন হয়, যা অদ্যাবধি একটি অতি ব্যয়সাপেক্ষ ব্যবস্থা।" [Reflections ......Rural Areas] মন্তব্যটি বাস্তব আর্থিক দৃষ্টিতে অতিশয় সঙ্গত ও অর্থপূর্ণ।

একাদশ অধ্যায়

অছিবাদের আর্থিক সিদ্ধান্ত

প্রথম কল্পনা

সমাজের আর্থিক সম্পর্কবিধানের ক্ষেত্রে গান্ধীজী যে ট্রাস্টিশিপের (অছিবাদ) কল্পনা করেছিলেন তাও তাঁর সেই মৌল জীবননীতি অহিংসার ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে অপরিগ্রহ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। প্রয়োজনের অধিক গ্রহণ না করা— এই সহজ অথচ দুরূহ নীতিটিকে ব্যক্তি তথা গোষ্ঠীর জীবনে রূপ দেওয়ার জন্য গান্ধীজী বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেছেন। অছিবাদের সিদ্ধান্ত এরই অন্তর্ভুক্ত।

ভারতবাসীর সীমাহীন দারিদ্র্য ও তার পাশে রাজা মহারাজাদের অকল্পনীয় বিলাস ব্যসন গান্ধীজীকে সর্বদাই পীড়া দিত। তাই ১৯১৬ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন ভাষণে তিনি অকপটভাবে ঘোষণা করেছিলেন, "আপনারা যদি এই সব মণিমুক্তা ত্যাগ না করেন এবং সেগুলি আপনাদের স্বদেশবাসীর জন্য ট্রাস্টরূপে না রাখেন, ভারতের মুক্তি নাই।" [১]

ধনীদের উদ্দেশ করে তিনি সম্ভবতঃ এই প্রথম তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করলেন অছিবাদ সম্বন্ধে। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ধনসম্পদ অধিকারের বিরুদ্ধেও গান্ধীজী তাঁর মত ব্যক্ত করেন হরিজন পত্রিকায় ১৯৩৭ সালে কংগ্রেস যখন শাসন ক্ষমতা গ্রহণের সিদ্ধান্ত করে তখন :

"কেনই বা মৃত্যু-কর (death duty) বসানো হবে না? লাখপতিদের বয়স্ক সন্তানেরা পিতার সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর সমগ্র জাতি এর ফলে দ্বিগুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ, প্রকৃতপক্ষে জাতি বা দেশই হবে এর ন্যায্য উত্তরাধিকারী। দ্বিতীয়তঃ, ধনসম্পদের ভারে জর্জরিত থাকায় ধনীর উত্তরাধিকারীর

১. Studies in Gandhism

অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহের পূর্ণবিকাশ না হওয়ায় জাতি আর একভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।" ১

সম্পত্তির ভোগাধিকার

সমাজে সম্পদের প্রয়োজনীয়তা যে আছে এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন। কিন্তু সেই সম্পদের ব্যবহার ও অধিকার বা ভোগের প্রশ্নে নানা সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। ভারতে ঋগ্বেদের সময় ও ইউরোপে প্লেটোর কাল হতে সম্পদের মালিকানা নিয়ে প্রভূত চিন্তা হয়েছে। সমাজচিন্তা যেমন এগিয়ে চলেছে তেমনি সম্পদের মালিকানা, ভোগাধিকার প্রভৃতি ক্ষেত্রেও প্রগতিশীল ব্যবস্থার আমদানী হয়েছে। ইউরোপে শিল্পবিপ্লব তথা যন্ত্রবিজ্ঞানের বৈপ্লবিক অগ্রগতির সঙ্গে ধনতন্ত্রের উদয় হল। উৎপাদন তথা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাহ্যতঃ ব্যাপক উন্নতি সাধিত হলেও পুঁজিবাদের ফলে সমাজে দেখা দিল আর্থিক বৈষম্য, দারিদ্র্য, বেকারি, নিরাপত্তার অভাব; আব অপরদিকে ধনসম্পদে সমৃদ্ধ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এক ক্ষুদ্র গোষ্ঠী। এদেরই অঙ্গুলিহেলনে সমাজের চক্র নড়াচড়া করত। এর ফলে সামাজিক অবিচার ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগল। আর্থিক মন্দা ও বিশ্বযুদ্ধের অবতারণা ধনতন্ত্রেরই ক্রমিক পরিণতি বলা যায়।

পুঁজিবাদের এই ব্যর্থতার ফলে সাম্যবাদ তথা সমাজবাদের উদয় হল। প্রুধোঁ বললেন, সকল সম্পত্তিই চৌর্যকর্মের সামিল। আর সাম্যবাদের জনক কার্ল মার্কস সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা সংগঠনের জন্য উৎপাদন প্রথা ও রাষ্ট্রীয ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রবর্তনের ব্যবস্থা করলেন। ব্যক্তিগত মুনাফাবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে উৎপাদন ও বণ্টনকে সমাজকল্যাণের দৃষ্টিতে পরিচালিত করাই ছিল মার্কসের লক্ষ্য। কিন্তু ধীরে ধীরে এর পরিণতি স্বরূপ সর্বক্ষমতাশালী রাষ্ট্রের বা রাষ্ট্রীয়বাদের (Stateism) উদয় হল। তথাপি ধনতন্ত্রের উপরিউক্ত ব্যর্থতা আর সমাজতন্ত্রের ক্ষেত্রে সোভিয়েট রাশিয়ার

১ হরিজন, ৩০.৭.'৩৭

অত্যাশ্চর্য অগ্রগতি লক্ষিত হওয়ায় বিশ্বের দৃষ্টি সমাজতন্ত্রের দিকেই ঝুঁকতে লাগল।

বিশ্ব পরিস্থিতির এই অবস্থায় গান্ধীজী তাঁর অহিংসানীতির উপর প্রতিষ্ঠিত অছিবাদের আর্থিক সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করলেন। অন্যান্য নূতন ধারণা সমূহের ন্যায় গান্ধীজীকে এ ক্ষেত্রেও যথারীতি প্রথম অবস্থায় প্রভূত বিরূপ সমালোচনা ও বিদ্রূপের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। রাষ্ট্রের প্রভুত্বকে সংকুচিত করে ধনবানদের সময়ের সংকেত অনুধাবন ও তাঁদের শুভবুদ্ধি ও বিবেককে জাগ্রত করার পথ নির্দেশ করলেন গান্ধীজী।

অছিবাদের নীতি ও অর্থ

এখন দেখা যাক অছিবাদের আর্থিক সিদ্ধান্তগুলি কিসের উপর গৃহীত? এর অর্থই বা কি? গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন যে, একটি আদর্শ সমাজব্যবস্থার ভিত্তিভূমি হচ্ছে আর্থিক সাম্যের নীতি। তাঁর কল্পিত অহিংস স্বরাজের চাবিকাঠি হচ্ছে আর্থিক সমতা। এই গুরুত্বপূর্ণ নীতি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে গান্ধীজী লিখলেন, "সমবণ্টনের প্রকৃত অর্থ এই যে, প্রতিটি মানুষের স্বাভাবিক অভাব সমূহ পূরণের ব্যবস্থা থাকবে, কিন্তু তার বেশী নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যদি একজনের দুর্বল হজমশক্তির জন্য আধপোয়া আটার প্রয়োজন হয় আর একজনের আধসের প্রয়োজন হয়, তবে উভয়ের এই প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা থাকা উচিত।...

"প্রকৃতপক্ষে সমবণ্টনের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব হচ্ছে যে, ধনবানেরা তাঁদের উদ্বৃত্ত সম্পদের জন্য অছিবাদের নীতি গ্রহণ করবেন। প্রতিবেশী অপেক্ষা তাঁরা একটি টাকাও অধিক রাখবেন না"।[১]

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কেমন করে এটা বাস্তবে কার্যকর করা হবে? অহিংস পন্থায়? না, ধনীদের কাছ হতে বলপূর্বক সম্পদ বেদখল করে? প্রচলিত এই পন্থায় হিংসা ও প্রতিহিংসার উদ্ভব হবে আর এর ফলে সমাজই যে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এ বিষয়ে আজ বোধ হয়

১. হরিজন, ২৫. ৮. '৪০

সকলেই একমত হবেন। তাছাড়া, কেমন করে অর্থ সঞ্চয় করতে হয় সেই কৌশল যিনি জানেন তাঁর সেই বুদ্ধিবৃত্তি সমাজ হারাবে। সেজন্য, ধনবানকে পঙ্গু না করে তার বুদ্ধি ও ক্ষমতাকে বৃহত্তর কল্যাণ-কাজে নিয়োজিত করে ধনীর পরিবর্তন সাধন করাই হচ্ছে গান্ধীজীর অহিংস প্রক্রিয়া। গান্ধীজীর কথায়—

"ধনবানের কাছেই তাঁর ধনসম্পদ রেখে দেওয়া হবে, যা থেকে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য ন্যায়সঙ্গতভাবে যেটুকু দরকার তা গ্রহণ করে বাকী অংশ সমাজের কাজে ব্যবহারের জন্য ট্রাস্টীর ন্যায় আচরণ করবেন। এই যুক্তিতে অবশ্য ট্রাস্টীর তরফে সততা আছে এটা ধবে নেওয়া হয়েছে।"

কিন্তু এই সততা না থাকলে কিংবা শুভবুদ্ধি ও কর্তব্যপরায়ণতা জাগ্রত না হলে কী করা যাবে? ধনী যদি প্রকৃতই গরীবের অভিভাবক না হন কিংবা গরীব যদি ক্রমাগতই দারিদ্র্যের পীড়নে নিগৃহীত হতে থাকে তবে অহিংস পন্থায় সমাধানের কোন উপায় আছে কি?—এই প্রশ্ন হয়তো অনেকে উত্তেজিতভাবে জিজ্ঞাসা করবেন। এ বিষয়ে গান্ধীজী কোনরকম সংকোচ না রেখেই বলেন, "এই সমস্যা সমাধানের উপায় স্বরূপ আমি অহিংস অসহযোগ এবং আইন অমান্যকেই ন্যায্য ও অমোঘ পন্থারূপে অভিহিত করেছি। সমাজে গরীবদের সহযোগিতা ব্যতীত ধনী সম্পদ সংগ্রহ করতে পারেন না। গরীবদের মধ্যে যদি এই জ্ঞান প্রসার লাভ করে তবে তারাও শক্তিশালী হয়ে উঠবে; আব এই নিপীড়নমুলক অসাম্যের ফলে তারা যে অনশনের দ্বারপ্রান্তে এসে উপনীত হয়েছে তা থেকে অহিংস উপায়ে মুক্তির পথের সন্ধান পাবে।" [হরিজন, ২৫. ৮. '৪০]

এভাবে কি শিল্পক্ষেত্রে, কি ভূমির ক্ষেত্রে শ্রমিক ও চাষীরা যদি বুদ্ধির সঙ্গে আপন আপন ক্ষেত্রে শোষক মালিকদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে অহিংস অসহযোগের পথ গ্রহণ করতে সমর্থ হয় তবে পরিস্থিতিব পরিবর্তনের সঙ্গে মালিকেরও হৃদয়ের পরিবর্তন আসবে। এতে কবে বহুঘোষিত শ্রেণীসংঘর্ষের রক্তাক্ত পথের কোন প্রয়োজন হবে না। শ্রম ও পুঁজির সম্মানজনক সহযোগের পথ উন্মুক্ত হবে।

পরিস্থিতি যেমন যেমন তীব্রতর হতে লাগল গান্ধীজীও তেমনি আরও প্রাঞ্জল ভাষায় তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করতে লাগলেন। তিনি বললেন, "গরীবদের শাসনের দিন যে সমাগত তা আমি দেখতে পাচ্ছি—তা সে অভ্যুদয় অস্ত্রশস্ত্রের মাধ্যমেই আসুক আর অহিংসার মাধ্যমেই আসুক।" [১]

১৯০৪ সালে কর্মজীবনের শুরুতেই মহামতি রাসকিনের লেখা বই 'আনটু দিস্ লাস্ট' হতে গান্ধীজী যে মহান্ নীতির পাঠ নিয়েছিলেন পরবর্তী জীবনে তাকে রূপ দেওয়ার সাধনা করেছেন। সকল প্রকার শ্রমের মূল্য সমান হওয়া উচিত এই নীতির প্রয়োগের বেলায় উৎপাদন-মূলক শ্রমের গুরুত্ব সমধিক। বুদ্ধিশ্রম বা শরীরশ্রমের মধ্যে কোন-প্রকার পার্থক্য করার অর্থ হবে আর্থিক সাম্যের আদর্শ হতে দূরে সরে যাওয়া। বুদ্ধিমান মেধাসম্পন্ন মনীষীদেরও উচিত তাঁদের এই বিশেষ শক্তিকে সমাজের বৃহত্তর কল্যাণকর্মে নিয়োজিত করা। বুদ্ধিজীবীরা অধিক আয় করলেও তাঁদের আয়ের অধিকাংশই সমাজহিতার্থে ব্যয়িত হওয়া উচিত। অর্থাৎ, সমাজের প্রত্যেকের নিকট যা আছে, যার যে সম্পদ (ভূমি, ধন, বুদ্ধি, শ্রম ইত্যাদি) আছে, তা মুলতঃ নিজের প্রয়োজনপূর্তির পরে সমাজহিতার্থে ব্যবহৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়। একেই বিনোবাজী বলেছেন, 'সমাজায় ইদং ন মম।' (এ সমাজের, আমার নয়)। এইভাবে বিচার করলে দেখা যাবে সামগ্রিক সমাজ-চেতনা তথা অহিংস জনশক্তির সাহায্যে যতখানি সম্ভব সমবণ্টনের পথে এগিয়ে যাওয়াই ছিল গান্ধীজীর লক্ষ্য।

ধনবানদের হাতে সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পণের ব্যবস্থা স্বরূপ অছিবাদের নীতির কথা বলায় অনেকে আপত্তি তুললেন এই বলে যে, এর দ্বারা গান্ধীজী ধনবানদের একটি রক্ষাকবচ প্রদান করেছেন। কিন্তু এ ধারণা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বা অন্য কোন ধনসম্পদ ব্যক্তিগতভাবে কারও কাছে সঞ্চিত থাকবে গান্ধীজী তা কখনই চাইতেন না। সেজন্য ট্রাস্টিশিপের প্রকৃত অর্থ কী তা

১. হরিজন, ১. ২. '৪২

অনুধাবন করা অত্যাবশ্যক। আইনে 'ট্রাস্টী' শব্দের অর্থ ও উদ্দেশ্য পবিত্র। ব্যবহারিক সমাজজীবনে গীতায় উক্ত অপরিগ্রহ, সমভাব প্রভৃতি মহান্ নীতি কিভাবে আচরণে প্রতিফলিত করা যায় তজ্জন্য গান্ধীজী ট্রাস্টিশিপের কল্পনা করেন। আইনে ট্রাস্টিশিপের অর্থস্বরূপ বলা হয়েছে যে, সম্পত্তির যে হিতাধিকারী (beneficiary) তার কল্যাণের নিমিত্ত ট্রাস্টী সেই সম্পত্তির দায়িত্ব গ্রহণ করে তা বিশ্বস্ততার সঙ্গে পরিচালনা করবেন। গান্ধীজী আইনগত সংজ্ঞার সঙ্গে নৈতিক দায়িত্বও অর্পণ করতে চান।

সম্পূর্ণ অপরিগ্রহী সমাজ না হওয়া পর্যন্ত যার কাছে যে পরিমাণ ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে তা কেমনভাবে ও কোন্ নীতি অনুযায়ী ব্যবহৃত হবে, গান্ধীজী অছিবাদের নীতি দ্বারা সেই কথা বলতে চেয়েছেন। তাঁর অহিংসা নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অছিবাদ সেজন্য একটি অতি সুন্দর ব্যবহারিক সিদ্ধান্ত।[১]

এইভাবে সম্পত্তির মালিককে গান্ধীজী রাতারাতি বলপূর্বক বঞ্চিত করতে বা রাষ্ট্রের সর্বগ্রাসী আইনের আওতায় তাকে শৃঙ্খলিত করতে চাননি। বরং প্রয়োজনের অধিক গ্রহণ না করার জন্য স্বেচ্ছাবৃত্তি জাগাবার দিকে দৃষ্টি দিলেন। এই নূতন পদ্ধতির প্রয়োগ যদিও অদ্যাবধি তেমন হয়নি তথাপি আচার্য বিনোবা ভাবে বর্তমানে যে ভূদান গ্রামদান আন্দোলনের সূত্রপাত করেছেন তা কি এই ট্রাস্টিশিপ সিদ্ধান্তের বাস্তব প্রয়োগ নয়? বিশ্বের তাবৎ বিপ্লবের ইতিহাসে দেখা যায় যে, বিপ্লবের কর্মকাণ্ড অপেক্ষা বিপ্লবোত্তর পুনর্গঠনের কাজ কঠিন ও বিঘ্নসঙ্কুল হয়। বিদ্বেষ ও হিংসাপ্রসূত কোনরূপ প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা গান্ধীজীর এই নীতির ফলে যে অনেকাংশে কম হবে সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

শ্রেণী সংঘর্ষ, শ্রেণী সহযোগ, অছিবাদ

১৯৩১ সালে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য গান্ধীজী যখন লণ্ডনে গিয়েছিলেন তখন তরুণ ভারতীয় কমিউনিস্টদের

১. ভূদানযজ্ঞ কি ও কেন, পৃঃ ২৪৯

একটি দল তাঁকে নানা প্রশ্ন করেছিলেন। অহিংবাদ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁরা প্রশ্ন করলেন, "হিংসা বর্জন করে আপনি কেমন করে এই নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তন করবেন? কেবলমাত্র বুঝিয়ে-সুঝিয়ে?"

গান্ধীজী বললেন, "কেবলমাত্র মৌখিক বুঝাপড়ার দ্বারাই নয়। আমি আমার পদ্ধতিতে মনোনিবেশ করব। আর সে পদ্ধতি হচ্ছে অসহযোগিতা। জনগণের ঐচ্ছিক বা বাধ্যতামূলক সহযোগিতা বিনা কোন লোকই সম্পদ সংগ্রহ করতে পারে না।"

তিনি আরও বললেন, "পুঁজিপতিকে শত্রুরূপে ভাব—জনসাধারণকে আমি এ কথা বলব না, আমি তাদের বলব যে, তারা নিজেরা তাদের শত্রু। পদ্ধতিকে ধ্বংস করতে হবে, ব্যক্তিকে নয়।"

উক্ত সভায় এমন প্রশ্নও উঠল, ধনবানদের কোনরূপ কমিশন দেওয়া হবে কিনা? তার হার কি হবে? উত্তরে তিনি বললেন, "এই সব ধনবানদের ট্রাস্টীরূপে কাজ করার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি। তাঁরা কত কমিশন নেবেন তা আমি বলব না; যা ন্যায্য তাই নিতে বলা হবে। যেমন, যাঁর একশত টাকা আছে তাঁকে বলব, পঞ্চাশ টাকা নিয়ে বাকী পঞ্চাশ টাকা শ্রমিকদের দিন। কিন্তু যাঁর এক কোটি টাকা আছে তাঁকে বলব আপনি আপনার জন্য ১% ভাগ রাখুন। সেজন্য এই কমিশনের হার নির্দিষ্ট হবে না; কেন না তাতে খুব অবিচার করা হবে।" ১

গান্ধীজীর এই সব উক্তি হতে অনেকে মনে করেন যে, তিনি শ্রেণী সংঘর্ষকে এড়াবার জন্যই শ্রেণী সহযোগিতার কথা বলেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, সংঘর্ষের রক্তাক্ত পথের পরিবর্তে যদি পুঁজি ও শ্রমের মর্যাদাজনক সহযোগিতার দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, যদি পরস্পর পরস্পরকে সম-অংশীদাররূপে গণ্য করে, তবে সেইটিই শ্রেয়োতর পথ নয় কি? গান্ধীজীকে একবার এই প্রশ্নটি করা হয়েছিল: "আপনি কর্মী, শ্রমিক ও কিষাণদের কল্যাণ করতে গিয়ে শ্রেণী সংঘর্ষ কি এড়াতে পারবেন?" উত্তরে তিনি বললেন—

১ ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৬. ১১. '৩১

"নিশ্চিতরূপে আমি তা পারব, অবশ্য যদি জনসাধারণ অহিংস পন্থা গ্রহণ করে। অহিংস পন্থায় পুঁজিপতিকে ধ্বংস না করে আমরা পুঁজিবাদকে নির্মূল করার চেষ্টা করি। আমরা পুঁজিপতিকে বলি, আপনারা শ্রমিকদের পক্ষে নিজেদের ট্রাস্টীরূপে মনে করুন। এই শ্রমিকদের উপরই আপনি আপনার মূলধনের সৃষ্টি, রক্ষণ তথা বৃদ্ধির জন্য নির্ভব করেন। নতুবা মালিকের পরিবর্তনের জন্য শ্রমিককে অপেক্ষাও করতে হবে না। যদি পুঁজি হয় শক্তির আধার, তবে শ্রমও তাই। যে-কোন শক্তিই ধ্বংসাত্মক অথবা সৃষ্টিমূলক কাজে ব্যবহার করা যায়। একে অপরের উপর নির্ভরশীল। যে মুহূর্তে শ্রমিক আপন শক্তি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হবে তখনই সে আর পুঁজিপতির অধীনস্থ না থেকে সম-অংশীদার হিসাবে কাজ করবে।"[১]

এ ক্ষেত্রে আমাদের যা ভালভাবে বিচার করে বুঝতে হবে তা হচ্ছে গান্ধীজীর মনোভাব। সারা জীবন অহিংস পথের একনিষ্ঠ সেবকরূপে যিনি নিজেকে রূপান্তরিত করাব সাধনায় নিমগ্ন রযেছেন, সেই মানুষের বিশেষ চিন্তাধারা ও মনোভাবটি আমবা বুঝতে সমর্থ হই না বলেই গান্ধীজীর এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে নানা বিরোধিতা ও সমালোচনা শোনা যায়। সত্য, প্রেম ও অহিংসা যাঁর জীবনমন্ত্র তিনি কারও প্রতি কখনও বৈরী মনোভাব পোষণ কবতে পাবেন না। তিনি সকলের বন্ধু। গান্ধীজীও তাই যখন বলতেন যে অনেক পুঁজিপতিই তাঁর বন্ধু এ কথা স্বীকার করতে তিনি লজ্জিত নন তখন স্বভাবতঃই তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকেই কথাটা বিচার করতে হবে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ধনবানদের উদ্দেশ্যে কালের এই সংকেত নির্দেশ করে বলেন, "ধনবানেরা তাঁদের বর্তমান কর্তব্য সম্বন্ধে ভালভাবে চিন্তা করে দেখবেন।…তাঁদের বোঝা উচিত যে, এই সম্পদ তাঁদের নয়। সম্পদ হচ্ছে সমগ্র জাতির। তাঁরা তাঁদের ন্যায্য প্রয়োজনমত যা লওয়ার তা নেবেন ; আর বাকী অংশ সমাজের জন্য রাখবেন।"[২]

---

১. ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৬. ৩ '৩১

২. হরিজন, ১. ২ '৪২

এমনকি, কোন ট্রাস্টীর সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁর সন্তানদের হাতে আসুক গান্ধীজী এ চাইতেন না। যদি না অবশ্য তাঁর পুত্ররাও যথাযথভাবে ট্রাস্টীর গুণে নিজেদের যোগ্য করে তোলেন। কোন সমর্থ সবল যুবক পুত্র পিতার সম্পদের উপর পরগাছার ন্যায় জীবনধারণ করবে গান্ধীজী একে নীতিবিগর্হিত কাজ বলে মনে করতেন। অবশ্য ট্রাস্টীরূপে যিনি বর্তমানে কাজ পরিচালনা করছেন তিনি তাঁর পরবর্তী প্রতিনিধির নাম মনোনীত করার অধিকারী। কিন্তু এর জন্য রাষ্ট্রের অনুমোদনের প্রয়োজনীয়তা গান্ধীজী স্বীকার করেন।

যিনি মানুষের অন্তর্নিহিত সততায় বিশ্বাস করেন তিনি সর্বদাই অন্যায়কারীকে অন্যায় সংশোধনের সুযোগ দেবেন। সামাজিক পরিস্থিতির চাপ যাঁরা অনুভব করেন গান্ধীজী তাঁদের পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুযায়ী কর্মে প্রবৃত্ত হবার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন, অর্থাৎ তাঁদের পরিবর্তনের চেষ্টা করেন। অহিংস সংগ্রামের কৌশল হচ্ছে ন্যূনতম প্রতিরোধের পথ গ্রহণ করা। গান্ধীজী সেজন্য সাম্যবাদী পন্থায় পুঁজিপতিকে বাধ্যতামূলক শ্রমশিবিরে পাঠাবার পরিবর্তে নূতন ভাবধারা গ্রহণের জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করেন। এইভাবে ভাবধারা যেমন যেমন সম্প্রসারিত হতে থাকে, তেমনই নূতন সংগঠনের পথ সুগম হয়। ধনবানকে ট্রাস্টীতে রূপান্তরিত করার এই হচ্ছে অন্তর্নিহিত তত্ত্ব। তথাকথিত হিংসাত্মক পন্থায় সংঘটিত বিপ্লবের পরে সমাজের যে পরিস্থিতি হয়, গান্ধীজীর অহিংস বিপ্লব সুষ্ঠুভাবে সংঘটিত হলে সেই তুলনায় পরিস্থিতির অনুকূলতা অধিক হয়। এই দৃষ্টিতে অহিংস বিপ্লবের ঔৎকর্ষ্য সমধিক।

রাষ্ট্রের ভূমিকা

সমাজের সর্বাঙ্গীণ পুনর্গঠনে গান্ধীজী রাষ্ট্র অপেক্ষা জনতার জাগ্রত কর্মপ্রেরণার উপর অধিক নির্ভর করার, পক্ষপাতী ছিলেন তা পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে নানাভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ধনবান ও বিত্তশালীদের স্বেচ্ছায় ট্রাস্টীরূপে নিজেদের রূপান্তরিত করার আহ্বানও তিনি যথারীতি দিয়েছিলেন। কিন্তু এই অবস্থায় রাষ্ট্রের

কি কোনরূপ ভূমিকা থাকবে? নিম্নের আলোচনা হতেই বোঝা যাবে যে, গান্ধীজী যদিও রাষ্ট্রবাদের প্রচণ্ড বিরোধী ছিলেন তথাপি একজন বাস্তববাদীর ন্যায় কোন নূতন পরিবর্তনকে বিধিবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের শীলমোহর অঙ্কিত করবার বিরোধী ছিলেন না। প্রয়োজনবোধে যেমন রাষ্ট্রের সহায়তা নেবার কথা বলেছেন, তেমনই সর্বপ্রথমে জনগণের মধ্যে নবচেতনা জাগাবার কাজে হাত দিয়েছেন। অর্থাৎ, প্রথমে জনশক্তির সক্রিয় কর্মকাণ্ডের পরে উত্তরকাণ্ডে রাষ্ট্রের শীলমোহর দেওয়া। জনগণের ভূমিকা হবে মুখ্য, রাষ্ট্রের গৌণ।

ট্রাস্টিশিপের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের কর্তব্য নির্ধারণ গান্ধীজী করেছেন। গান্ধীজীকে এরূপ এক প্রশ্ন করা হয়েছিল: "মনে করুন একজন শিল্পী তাঁর পুত্রকে কয়েকটি মূল্যবান ছবি দিয়ে গেলেন। কিন্তু পুত্র প্রকৃত ট্রাস্টীর ন্যায় আচরণ না করে সেগুলি বিক্রয় করে ও সেই অর্থ নষ্ট করে ফেললে, জাতি এক মূল্যবান সম্পদ হতে বঞ্চিত হল। এই অবস্থায় আপনি কি মনে করেন না যে, রাষ্ট্র ন্যূনতম হিংসার প্রয়োগে উক্ত শিল্পকর্মগুলি নিয়ে নিলে যুক্তিসঙ্গত কাজই হবে?"

উত্তরে গান্ধীজী বলেন, "হ্যাঁ, বস্তুতঃপক্ষে রাষ্ট্র ন্যূনতম হিংসা প্রয়োগে সেগুলি নিলে ন্যায্য হবে বলেই আমাব বিশ্বাস। কিন্তু এ আশঙ্কা তো সর্বদাই আছে যে, রাষ্ট্রমতেব যারা বিরোধী হবে তাদের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র অতিমাত্রায় হিংসার প্রয়োগ করতে পারে। জনগণ যদি ট্রাস্টীর ন্যায় কাজ করে তবে আমি খুবই খুশী হব; কিন্তু যদি তারা ব্যর্থ হয় তবে আমার বিশ্বাস যে, রাষ্ট্রযন্ত্রের মাধ্যমে ন্যূনতম হিংসার প্রয়োগে তাদের অধিকৃত সম্পদ হতে বঞ্চিত করতে হবে।... ব্যক্তিগতভাবে আমি যা সমধিক পছন্দ করব তা এই যে, রাষ্ট্রের হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ নয় কিন্তু অছিবাদের ধারণার সম্প্রসারণ। কারণ, আমার মতে ব্যক্তিগত মালিকানা রাষ্ট্রীয় হিংসা অপেক্ষা কম ক্ষতিকারক।...

"রাষ্ট্র হচ্ছে সংগঠিত ও কেন্দ্রিত হিংসার প্রতিচ্ছবি। মানুষের হৃদয় বলে কিছু আছে, কিন্তু রাষ্ট্র হৃদয়হীন একটি যন্ত্র। হিংসা হতেই

এর উৎপত্তি বলে রাষ্ট্রকে কখনও হিংসামুক্ত করা যাবে না। এই জন্যই আমি অছিবাদের নীতি সমর্থন করি।"[১]

গান্ধীজী চান যে, অহিংস সমাজব্যবস্থায় রাষ্ট্রের ভূমিকা হবে ফুলের মালার সূতার ন্যায়। রাষ্ট্রীয় আইনকানুনকে সুষ্ঠুরূপে কার্যকর করার জন্য কর্তব্যে সচেতন জনশক্তির নির্মাণ অত্যাবশ্যক। অর্থনীতিবিদ্ দাঁতওয়ালা অতি সুন্দরভাবে বলেছেন: "অহিংস পদ্ধতির নিয়ম এই যে, বৃক্ষেই ফলটি (অর্থাৎ নূতন ব্যবস্থা) পরিপুষ্ট হোক। অথচ, আপনি যদি কাঁচা অবস্থায় ফলটি তুলে ফেলেন তবে সেটি কৃত্রিম তাপশক্তি (রাষ্ট্রীয় আইন) দিয়ে পুষ্ট করতে হবে।" ['Gandhism Reconsidered']

সমাজের বিভিন্ন আর্থিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র জনশক্তি যত অধিক পরিমাণে ক্রিয়াশীল হবে, রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধের বেড়াজাল যত কম হবে, সেই সমাজ বা দেশ তত স্বাধীন হবে। মানুষের নৈতিক মান তত উঁচু হবে।

অছিবাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

গান্ধীজী যখন অছিবাদের কথা প্রথম বলেন তখন এর বাস্তব সম্ভাবনা সম্বন্ধে অনেকে উপহাস করেছিলেন। গান্ধীজী তাঁর জীবদ্দশায় ব্যক্তিগতভাবে অনেক ধনবান ব্যক্তির জীবন পরিবর্তনের প্রয়াসী হয়েছিলেন। সফলও হয়েছিলেন। যমুনালাল বাজাজের নাম দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়। বর্তমানে দেশে আর্থিক পরিস্থিতির পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে বিনোবাজী যে ভূদানযজ্ঞ আন্দোলন শুরু করেছেন তা অছিবাদ সিদ্ধান্তের ব্যাপক আকারে বাস্তব প্রয়োগ যে সম্ভব তা প্রমাণ করে।

নাবালকের সম্পত্তি ট্রাস্টির হাতে গেলে নাবালক যখন প্রাপ্তবয়স্ক হবে তখন আইনতঃ তাকে সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়াই হবে ট্রাস্টির কর্তব্য। তদ্রূপ, পূর্বের তুলনায় বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য

১. Studies in Gandhism

দেশে কোটি কোটি ভূমিহীন দরিদ্রের সৃষ্টি হয়েছে ; এখন তারা জাগ্রত হয়ে আপন অধিকার ফিরে পাবার জন্য ব্যগ্র হয়েছে। অর্থাৎ তারা এতদিনে সাবালক হয়েছে। সুতরাং এখন ভূমিবান ট্রাস্টীদের কর্তব্য হবে হিতাধিকারীর (beneficiary) ন্যায় ভূমিহীন কিষাণদের ভূমি প্রত্যর্পণ করা। বিনোবাজী ভূমিবানদের নিকট এই আহ্বানই জানাচ্ছেন—"স্বেচ্ছায় তোমরা তোমাদের ভূমিব একাংশ গরীব কিষাণদের দান কর।" গ্রামদানের দ্বারা ভূমির মালিকানা গ্রাম-সমাজের হাতে অর্পণ করার নীতি গৃহীত হয়েছে। আজ সারা ভারতব্যাপী গ্রামদান আন্দোলনের যেটুকু অগ্রগতি হয়েছে, ট্রাস্টিশিপ সিদ্ধান্তের সফলতা সমপরিমাণে হযেছে বলা যায়।

এ ত গেল বর্তমান প্রয়োগ সম্বন্ধে। কিন্তু যদি ধরা যায় যে বর্তমানে ব্যক্তিগত সকল সম্পত্তি ট্রাস্ট সম্পত্তিরূপে পরিবর্তিত হল, সমাজে আর্থিক সমতা প্রতিষ্ঠিত হল, তা হলে কি গান্ধীজীর অছিবাদ নীতির আর কোন প্রয়োজনীয়তাই থাকবে না? গান্ধীজী মনে করেন যে, ভবিষ্যৎ সমাজে আর্থিক সমতা যদিও বা প্রতিষ্ঠিত হয় তবু মানুষে মানুষে বুদ্ধির তারতম্য থাকবে। বুদ্ধির কৌশলে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা সহজেই সরল বোকা লোকদের শোষণ করতে পারেন। সেজন্য সকল বুদ্ধিমান লোকের উচিত আপন আপন জ্ঞান ও বুদ্ধি ট্রাস্টীরূপে সমাজসেবায় নিয়োজিত করা। গান্ধীজীর কল্পিত ভবিষ্যৎ সমাজে "কোন ব্যক্তিই—রাজা মহারাজা, ব্যবসায়ী ও জমিদার—তাঁর সম্পত্তির একমাত্র মালিক হতে পারেন না, সে সম্পত্তি নিজের অর্জিত বা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যা-ই হোক না কেন।···কোন ব্যক্তিই তাঁর বুদ্ধিপ্রসূত লাভ আপন খেয়ালখুশিমত ব্যবহারের অধিকারী নন। অতএব তিনি কেবলমাত্র আপনার জন্যই তাঁর বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার করবেন না, সমগ্র সমাজের জন্য তা করবেন ; যে সমাজের তিনি অংশবিশেষ ও যার উপর নির্ভরশীল হয়ে তিনি বাস করেন।" [১]

অন্য কথায় বলা যায় যে, গান্ধীজী সম্পত্তির ন্যায় বুদ্ধিমত্তাকেও

১. হরিজন, ২. ৮. '৪২

সমাজের মালিকানায় আনার জন্য ইচ্ছুক ছিলেন। এই সমাজীকরণের পদ্ধতি হবে অহিংসাত্মক—বিবেকসম্মত হৃদয়পরিবর্তনের প্রক্রিয়া। সম্পদের পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে গান্ধীজী তাঁর অহিংসা নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ট্রাস্টিশিপের যে সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করছেন তা সমাজে আর্থিক পুনর্গঠনের ব্যাপারে যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধন করবে। বর্তমানের ভূদান-গ্রামদান আন্দোলন তার স্বাক্ষর বহন করবে বলে আমাদের ধারণা।

অছিবাদের বাস্তব প্রয়োগ

যে কোন প্রকার সম্পত্তির মালিকানার ক্ষেত্রে গান্ধীজী যে ট্রাস্টিশিপ-এর কথা বলেছেন, লণ্ডনের 'স্কট বেডার কমনওয়েলথ' কোম্পানীর অধ্যক্ষ আর্নেস্ট বেডার তাঁর নিজ ফ্যাক্টরীতে এই নীতির ব্যবহারিক রূপদান করেন। শ্রীবেডার তাঁর কোম্পানীর সম্পূর্ণ মালিকানা ৩২৫ জন কর্মচারীর মধ্যে হস্তান্তরিত করে দিয়েছেন।

৭৫ বৎসরের বৃদ্ধ এই উদারপরায়ণ শিল্পপতি সম্প্রতি ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন। বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, ব্যাঙ্ক মালিক ও সর্বোদয় কর্মীদের সভায় আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীবেডার বলেন যে, তাঁর কর্মচারীদের কারখানায় তাদের সমান মালিকানার ভাবনা বুঝাতে প্রায় তিন বছর সময় লেগেছিল। ১৯৫১ সালে ৯০% শেয়ার হস্তান্তরিত করেন। ১২ বছর পরে বাকী ১০% শেয়ার বণ্টন করে দেন। বেডার বলেন যে, তাঁদের এই প্রয়োগের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। কর্মচারিগণ অধিক সুস্থ ও সুখী হয়েছেন, তাঁদের আচরণও অনেক উদার হয়েছে। কর্মচারীরা অংশীদার হিসাবে বোনাস পেয়েছেন। লাভের কিছু অংশ শিক্ষা ও সার্বজনিক কাজে ব্যয় হয়েছে। অবশ্য তিনি আহ্বান জানান যে, প্রত্যেক কর্মীকে এ বিষয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে যে তাঁরা সকলে মিলিতভাবে কাজ করবেন। এইভাবে পারস্পরিক বিশ্বাস ও সহযোগিতায় ট্রাস্টিশিপের সিদ্ধান্ত কার্যকর করে এক আদর্শ সমাজ রচনা করা যায়, এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হয়েছেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

স্বাধীনতা-উত্তর যুগে গান্ধী-নীতির প্রয়োজন

'গান্ধীবাদ' বলে কোন কিছু থাকুক, গান্ধীজী নিজে এ জিনিসের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি সমাজকে কতকগুলি অতি পুরাতন শাশ্বত সত্যের সন্ধান দিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, এই শাশ্বত সত্যগুলির অনুশীলন মানুষের ব্যক্তিগত ও সামূহিক জীবনে যত অধিক পরিমাণে হবে তত অধিক পরিমাণে সমাজ সমৃদ্ধ হবে। এই নীতিগুলির প্রচলিত অর্থে অভিনবত্ব না থাকলেও সমাজ শোধনের দৃষ্টিতে এইগুলি নিঃসন্দেহে সময়োপযোগী ছিল। গান্ধীজীর দূরদৃষ্টির পরিচয় এখানেই পাওয়া যায়।

আর্থিক ক্ষেত্রে তিনি যে শোষণহীন অহিংস সমাজের কল্পনা করেছিলেন তার বাস্তব প্রয়োগ সীমিত আকারে হলেও তিনি আজীবন সমানভাবে তার জন্যে প্রচার চালিয়ে গেছেন। বিদেশী সরকারের বিরোধিতা সত্ত্বেও গান্ধীজী তাঁব স্পৃষ্ট গঠনকর্মেব কেন্দ্রসমূহে বিকেন্দ্রিত অর্থব্যবস্থার যে প্রয়োগ করেছিলেন, পরিমাণে তা বিশেষ ব্যাপক না হলেও দেশে গণচেতনা উদ্বোধনের কাজে তা সবিশেষ সহায়ক হয়েছে। ভারতের ন্যায় জনবহুল দেশের পক্ষে তিনি খাদি ও গ্রামশিল্প মূলক আর্থিক কাঠামোর যে পরিকল্পনা করেছিলেন তা স্বদেশে ও বিদেশে অনেক সমালোচনা ও বিদ্রূপের সম্মুখীন হলেও একাগ্রভাবে এই পথে যেটুকু প্রয়োগ হয়ে এসেছে তার মূল্য উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

আজ স্বাধীনতার পরে গান্ধীজীর অবর্তমানে এই বিকেন্দ্রিত অর্থনীতির প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা, কিংবা থাকলেও তা কোথায় কতটুকু সফলতার সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছে, সে বিষয়ে এই পুস্তকের শেষ অধ্যায়ে আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলেই মনে করি।

এই মূল্যাঙ্কন প্রধানতঃ দুটি ক্ষেত্রে করা হবে : (১) সরকারী ও (২) বেসরকারী। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের দৃষ্টিতে সরকারী

পরিকল্পনা কমিশন একদিকে যেমন বৃহৎ ও ভারী শিল্পের উপর যথোচিত গুরুত্ব দিলেন, তেমনই অপরদিকে ক্ষুদ্র ও গ্রামশিল্প সমূহের প্রসার ও উন্নতির জন্যও মনোনিবেশ করেছেন। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় খাদি ও গ্রামশিল্প এবং ক্ষুদ্রশিল্পের জন্য অর্থ বরাদ্দও করা হয়েছে। দেশের প্রয়োজনের তুলনায় ও সমগ্র পরিকল্পনায় আর্থিক বরাদ্দের দৃষ্টিতে এই বরাদ্দ যে খুবই স্বল্প তা উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই। কিন্তু পরিকল্পনার এক যুগ পরে দেশের বৃহত্তম অংশের আর্থিক অবস্থার যে ক্ষয়িষ্ণুরূপ প্রকটিত হয়েছে তা যে নিতান্ত উদ্বেগজনক এ কথা সরকারী মহলেও আজ আর গোপন নয়। দুটি কৃষি-শ্রমিক অনু-সন্ধান কমিটীর রিপোর্ট এবং সমাজের দুর্বলতর অংশের কল্যাণ সম্বন্ধীয় কমিটীর রিপোর্টে প্রকাশিত তথ্যসমূহ প্রণিধানযোগ্য। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যানসমূহ পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে বলে এখানে পুনরায় সেসবের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

অনগ্রসর দেশের আর্থিক উন্নতি বিধান আজ একটি বৃহৎ সমস্যা। প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, লোকবল ও মূলধন এবং কারিগরী সহায়তা—এগুলি সর্বক্ষেত্রেই প্রয়োজন। কিন্তু এই উপাদানসমূহের ন্যায়সঙ্গত প্রয়োগই হচ্ছে প্রকৃত সমস্যা। দেশে ভারী মূল শিল্পসমূহের প্রয়োজনীয়তাও কেউ অস্বীকার করবেন না। কিন্তু দেশের পরিস্থিতি বিচার করে সমগ্র পরিকল্পনায় কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর প্রাথমিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে পরিকল্পনাবিদ্‌দের সামনে সর্বদাই এ এক কঠিন বিচার্য বিষয়। দেশের বৃহত্তম জনসংখ্যার কল্যাণ ও উন্নতির প্রশ্ন উঠলে এই পরিকল্পনা যে সফল হয়নি এ কথা আজ সর্বজনস্বীকৃত। গ্রামীণ জনসাধারণের অসীম দারিদ্র্য ও ক্রমবর্ধমান বেকারির চাপে সরকারও আজ 'গ্রামীণ শিল্পপ্রকল্প' (Rural Industries Project) প্রবর্তনে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। না হলে এই ভিত্তিবিহীন মাথাভারী উন্নয়ন ব্যবস্থা যে অচিরেই নস্যাৎ হবে এ আজ দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দেরীতে হলেও গান্ধীজীর আর্থিক ব্যবস্থা শুধু স্বদেশেই নয়, বিদেশেও ক্রমেই সমর্থন লাভ করছে। আজ এশিয়া আফ্রিকার জনবহুল অনুন্নত দেশই নয়, অতি

উন্নত ইউরোপ আমেরিকার দেশসমূহের অর্থনৈতিক কাঠামোতেও সংকট ঘনায়মান। আর্থিক সাম্রাজ্যবাদ (Economic imperialism), উপনিবেশবাদ প্রভৃতির যুগ বহুকাল আগেই গত হয়েছে। সেজন্য পরাধীন অনুন্নত দেশগুলিকে শোষণ করে স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের স্বপ্ন এখন আর সম্ভব নয়। যথাসম্ভব আত্মনির্ভর ও সহযোগী আর্থিক কাঠামো রচনার যে নীতি গ্রহণের জন্য গান্ধীজী বলেছিলেন, আজ তার সার্থকতা অনুভূত হচ্ছে অধিকতর মাত্রায়। দ্রষ্টাপুরুষ গান্ধীজীর দূরদৃষ্টিতে এই সত্য অনেককাল আগেই ধরা পড়েছিল।

দেশে সর্বাঙ্গীণ উন্নতির ভারসাম্য রক্ষার জন্য ভারত সরকার আজ পল্লী অঞ্চলের উন্নতি বিধানের দিকে দৃষ্টি দিচ্ছেন। কৃষি-শিল্পমূলক শ্রীসম্পন্ন পল্লী গড়ে উঠলে তবেই আধুনিক পরিকল্পনা সফল হবে। গান্ধীজীর অহিংস সর্বোদয় সমাজের আদর্শের তাগিদে পরিকল্পনায় এই পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা না হতে পারে, কিন্তু নিছক বাস্তব অবস্থার তাগিদেই আজ এই চিন্তার উদ্রেক হয়েছে। এ না হয়ে উপায় ছিল না। তাই ত কবির এই অমোঘ সতর্কবাণী ঃ

"যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে,
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।"

('গীতাঞ্জলি')

কিন্তু পরিকল্পনাকে সফল করার পথে যা সর্বাগ্রে প্রয়োজন তা হচ্ছে জনগণের সহযোগিতা ও অভিক্রম (initiative)। দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট অনুন্নত দেশে উন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা জনগণের নিষ্ক্রিয়তা। স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে যাবার প্রেরণা তারা পায় না। এখানে সেখানে সরকারী অর্থে বা বিদেশী সাহায্যে দু' একটি হাসপাতাল, বিদ্যালয়-গৃহ তৈরি হলেই উন্নয়নের প্রবাহ শুরু হল (অর্থনীতির ভাষায় যাকে বলা হয় টেক্-অফ্—take-off stage), এ কথা বলা যায় না। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা ও অভিক্রম জাগ্রত করানো হল প্রগতির অন্যতম চাবিকাঠি। সেই কাজটি নিষ্পন্ন না হলে আমরা যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই রয়ে যাব।

তাছাড়া, পরিকল্পনার ফলে আর্থিক বৈষম্যের হার যদি হ্রাস না পায়, জাতীয় আয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও শহর ও গ্রামবাসীদের মাথাপিছু আয়ের ব্যবধান যদি বাড়তে থাকে, যা বর্তমানে আমাদের দেশের স্থিতি, তবে জনগণের উৎসাহ-উদ্দীপনা কেমন করে জাগবে? বর্ধিত আয় যদি কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় ব্যক্তিবর্গের হাতে নিবদ্ধ থাকে তবে চাষী ও শ্রমিকদের কর্মপ্রেরণা স্তিমিত হতে বাধ্য। ভারতে উৎপাদনের প্রধান উৎস হল কৃষি। শিল্পের তুলনায় কৃষিজ ক্ষেত্রে দৃষ্টি আজও কম দেওয়া হয়। জমিদারী প্রথা আইনতঃ উচ্ছেদ হলেও চাষী আজও ভূমির মালিক হবার সৌভাগ্য লাভ করেনি। স্বাধীনতার সুমিষ্ট স্বাদ আজও সে পায়নি বলে অধিক উৎপাদনের প্রেরণা তার স্তব্ধ। সরকার তার সীমিত ক্ষেত্রে সার, বীজ, ঋণ ইত্যাদি সরবরাহের প্রাণপণ চেষ্টা করলেও চাষীর হৃদয়বীণার ঠিক তারটিতে যেন সুর উঠছে না।

ভারত সরকারের সমাজ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী এস. কে. দে মহাশয় তাই একবার সখেদে বলেছিলেন যে, সমাজ না থাকলে সমাজ উন্নয়ন কার্যসূচী কেমন করে হবে? অর্থাৎ, আজ গ্রামসমাজ বলে কোন কিছু নাই। তাই গ্রাম উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি হয়েছে। এই সমাজভাবনার উদয় হবে কেমন করে? কোন্ সরকারী আইন বলে? আইনের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। তাই আজ আবার ভিন্ন শক্তির প্রয়োজন হয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর ভাবশিষ্য আচার্য বিনোবা আজ সেই জনশক্তি জাগাবার দুরূহ ব্রতে আত্মনিয়োগ করেছেন। গান্ধী-নীতির চরম সার্থকতা আজ এখানেই। শাশ্বত সত্যের ন্যায় এই নীতি যুগে যুগে প্রবর্তিত হবে। সরকার নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র জনশক্তি নির্মাণের নীতি স্বীকার করতে বাধ্য হবেন। রাজনৈতিক স্বাধীনতার পরে আর্থিক স্বাধীনতার প্রয়োজন ভারতে আজ সর্বাধিক। আচার্য বিনোবা অহিংস পন্থায় আর্থিক সমতা সংস্থাপনের কাজে দীর্ঘ বার বছর ধরে ভারতের আসমুদ্রহিমাচল পাদপরিক্রমা করে চলেছেন। গান্ধীজীর কথায়, "অহিংস স্বরাজের চাবিকাঠি হল আর্থিক সমতা।" পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনের পরে অহিংস সেবকের কাছে এই কাজই

হল তাই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কাজ। যোগ্য শিষ্যের ন্যায় আচার্য বিনোবা একনিষ্ঠ সৈনিকরূপে এই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলেন। ভারতের আর্থিক কাঠামোয় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ভূমিসমস্যার অহিংস পন্থায় সমাধানের উদ্দেশ্যে তিনি পদযাত্রায় বহির্গত হলেন। সামাজিক সমস্যা সমাধানের তিনটি উপায় আছেঃ (১) জঙ্গলের বিধান, (২) আইনের বিধান ও (৩) প্রেমের বিধান। গান্ধী-উত্তরসাধক বিনোবা স্বভাবতঃই শেষোক্ত অর্থাৎ প্রেমের বিধানকেই পন্থারূপে গ্রহণের সংকল্প করলেন। সরকার-নিরপেক্ষভাবে সমাজের আর্থিক ব্যবস্থার এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের প্রয়াস হচ্ছে বিনোবাজীর ভূদান-গ্রামদান আন্দোলন। গান্ধীজীর তিরোধানের পরে তাঁর গ্রাম স্বরাজের আদর্শকে বাস্তবে রূপদানের এ এক মহৎ আযোজন।

ভূমিসমস্যা তখন ভারতের কোথাও কোথাও রক্তাক্ত সমাধানের পথে (জঙ্গলের বিধান) পা বাড়াবার জন্য উন্মুখ হযেছিল। তেলেঙ্গানায় কমিউনিস্টদের হাতে বহু ভূমিবান জমিদার নিহত হয়েছিলেন। বলপূর্বক তাঁদের কাছ হতে জমি কেড়ে নিয়ে ভূমিহীন কিষাণদের মধ্যে বিতরণ করা হল। অপরদিকে সরকার এই হাঙ্গামা দমনের জন্য সশস্ত্র উপাযে দমননীতি চালাচ্ছিলেন। সমগ্র তেলেঙ্গানায ভীতি, ত্রাস, হানাহানির অভিযান শুরু হয়েছিল।

আইনের দ্বারা জমি হস্তান্তরের কার্যক্রম তখনও সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়নি। সেজন্য পরিস্থিতির তাগিদে হিংসাত্মক বিপ্লবের পটভূমিকা তৈরি হচ্ছিল। বিনোবাজী তখন শিবরামপল্লীতে অনুষ্ঠিত সর্বোদয় সম্মেলনে যোগদানের জন্য পদব্রজে রওনা হলেন তাঁর পরমধাম আশ্রম হতে। একজন শান্তি সৈনিকের ভূমিকায় তিনি তেলেঙ্গানা ভ্রমণের সংকল্প করলেন। বিনোবাজীর মনোজগতের চিত্র তখন কেমন ছিল? তাঁর কথায় বলিঃ

"গান্ধীজীর তিরোধানের পর চিন্তা করিতেছিলাম—এখন আমার কি করা আবশ্যক? আমি উদ্বাস্তুদের সেবাকার্যে লাগিয়া গেলাম। কিন্তু তেলেঙ্গানার কমিউনিস্টদের সম্পর্কে আমি বরাবর চিন্তা কারতেছিলাম।...কিন্তু কমিউনিস্টদের উপদ্রব ব্যাঘ্রের উপদ্রব নহে,

উহা মানুষের উপদ্রব। উহাদের কার্যপন্থা যতই ভ্রান্ত হউক না কেন উহাদের জীবনে কিছু না কিছু বিচারধারা আছে। সেক্ষেত্রে মাত্র পুলিশ পাঠাইয়া প্রতিকার হওয়া সম্ভব নহে।”[১]

অহিংস পন্থায় দেশের এই প্রধান আর্থিক সমস্যার সমাধান করতে না পারলে অহিংসাশাস্ত্র নিষ্ফল প্রমাণিত হবে। তাই দাঙ্গাবিধ্বস্ত তেলেঙ্গানার পচমপল্লী গ্রামে অহিংসার এই নবতম পরীক্ষার মহৎ অভিযান শুরু হল। সেদিনটা ছিল ১৯৫১ সালের ১৮ এপ্রিল। প্রথম ভূমিদাতা শ্রীরামচন্দ্র রেড্ডির মাধ্যমে বিনোবা যেন পথের সন্ধান পেলেন। ভূদানযজ্ঞের গঙ্গোত্রীর সৃষ্টি হল কিন্তু তথাপি তাঁর মনে সন্দেহ ও আশঙ্কা উঁকি দিচ্ছিল। “যেদিন আমি প্রথম দান পাই সেদিন রাত্রে আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম—এরূপে ভূমি চাহিয়া কি আমি সমস্ত দরিদ্র ভূমিহীনের সমস্যার সমাধান করিতে পারিব? ইতিহাসে এরূপ কাজের কোন নজীর ছিল না। কিন্তু ভিতর হইতে শক্তি পাইলাম, ভিতর হইতে বাণী আসিল, ভীত হইও না; তুমি চাহিতে থাক।”[২] এইভাবে দানযজ্ঞের আরম্ভ হল। ভারতের ভূমিহীন দরিদ্রদের জন্য তিনি ভূমিবানদের আবেদন জানাতে লাগলেন —এক-ষষ্ঠাংশ দান কর। আলো, জল, হাওয়ার ন্যায় ভূমি ঈশ্বরের (সমাজের) দান। এতে সকলের সম অধিকার হওয়া উচিত। প্রত্যেক ভূমিবানের কাছে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বললেন, “আপনার যদি চার পুত্র থাকে তবে আমাকে পঞ্চম পুত্র মনে করে আমার পাওনা আমাকে দিন। আজ যিনি দিবেন না কাল তিনি দিবেন। ভারতবর্ষে এমন কেহ নাই যিনি আমাকে ভূমিদান করিতে অস্বীকার করিতে পারেন।”

গান্ধীজী ধনীদের ট্রাস্টীরূপে থাকতে বলেছিলেন, বিনোবাজী বাস্তব ক্ষেত্রে ওই আদর্শের প্রয়োগ করে চলেছেন। তাই এ ভূমিভিক্ষা নয়, স্বামিত্ব নিরসনের দীক্ষা। সময়ের ইঙ্গিত ও কালের

১. ভূদানযজ্ঞ কি ও কেন, পৃঃ ৩১
২. ঐ, পৃঃ ৩৩

দাবী বুঝে কাজ করার জন্য ভূমিবানদের নিকট বিনোবার এই আবেদন কি ফলপ্রসূ হচ্ছে ? তেলেঙ্গানা ভ্রমণের সময় তিনি দৈনিক গড়ে ২০০ একর ভূমি, দিল্লী যাবার পথে দৈনিক গড়ে ৫০০ একর ও সেবাপুরী সম্মেলনের পরে দৈনিক গড়ে ১০০০ একব করে ভূমিদান পেয়েছেন। যে সূচ্যগ্র ভূমির জন্য মহাভারতেব যুদ্ধের অবতারণা, বর্তমান যুগে স্বেচ্ছায় এইভাবে সেই ভূমি দান করার নজীর সত্যিই অভূতপূর্ব। অহিংস পন্থায় রাজনৈতিক স্বাধীনতার আন্দোলন গান্ধীজী যখন আরম্ভ করেছিলেন তখন যেমন বাদ প্রতিবাদেব ঝড উঠেছিল তেমনি অহিংস পন্থায় আর্থিক সমতার এই আন্দোলনের প্রাবম্ভে নানা সমালোচনার অন্ত ছিল না।

কিন্তু এ শুধু আন্দোলন নয়, আরোহণ। তাই ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়াই এর লক্ষ্য। এক-ষষ্ঠাংশ দান গ্রহণের মধ্যেই আর্থিক সমতার এই আন্দোলনের গতি রুদ্ধ হবে না। সকল প্রকার সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা নিরসন করার উদ্দেশ্যে বিনোবাজী ভূমি, ধনসম্পদ, বুদ্ধি ও শ্রম—সকল কিছুই সমাজেব সেবায় দান করার আহ্বান জানালেন। ভূমিবান দেবেন ভূমি, ধনবান তাব সম্পদ, বুদ্ধিমান দেবেন বুদ্ধি আর গরীব শ্রমিক ভাইটি অর্থেব দিক হতে নিঃস্ব হলেও সে তার শ্রমের একাংশ কি দান দিতে পাবে না ? সকলেরই কিছু না কিছু আছে। তাই এই বৃহৎ মালিকানা সমর্পণের যজ্ঞে স্বেচ্ছায সকলেই দান দিন—ভূমিদান, সম্পত্তিদান, বুদ্ধিদান, শ্রমদান।

আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করা এই পুস্তকের সীমিত পরিসরেব মধ্যে সম্ভব নয়। আন্দোলনের সূত্রপাত, পূর্বপরিস্থিতি ও উদ্দেশ্য বা মূলনীতিগুলি সম্বন্ধে আলোকপাত কবে সমাজপুনর্গঠনে গান্ধীজীর আর্থিক সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তব প্রয়োগ-প্রণালী দেখানোই আমাদের লক্ষ্য। সবিস্তার আলোচনার জন্য 'ভূদানযজ্ঞ কি ও কেন', 'গ্রামদান' প্রভৃতি পুস্তক পাঠ করা যুক্তিসঙ্গত। এই বিভিন্ন 'দানযজ্ঞের' অন্তর্নিহিত তত্ত্ব এই যে, আপন প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ সমাজের উদ্দেশ্যে নিযুক্ত হোক। সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ করে তাকে প্রকৃত উৎপাদকের সহায়রূপে

ব্যবহার করা হোক। আমার কাছে যে সম্পদ আছে তার একমাত্র মালিক আমি নই। 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'—যা ভোগ করবে তা ত্যাগের দ্বারা ভোগ করা উচিত। সকল সম্পত্তির মালিক সমাজ। সম্পত্তিদান যজ্ঞের মূল বিচার অপরিগ্রহ ও অস্তেয় এই দুই ভাবধারার উপর প্রতিষ্ঠিত। সাধারণতঃ আয়ের এক-ষষ্ঠাংশ দান দিতে বলা হয়। প্রতি বছর আজীবন এই দান দেওয়ার ব্রত দাতাকে নিতে হয়। সেজন্য বিচারপূর্বক দান দেওয়ার জন্য আবেদন জানানো হয়। অর্থ সৎ উপায়ে অর্জন করা ও প্রয়োজন-অতিরিক্ত গ্রহণ না করা—দাতার অন্তরে ধীরে ধীরে এই শুভবুদ্ধি যাতে জাগ্রত হয় সম্পত্তিদান যজ্ঞের অন্তিম উদ্দেশ্য তা-ই। ভূমিবানদের জন্য ভূদান, অন্যান্য সম্পত্তি বা কারখানার মালিক প্রভৃতি ধনবানদের জন্য সম্পত্তিদান যজ্ঞের প্রবর্তনের দ্বারা বিনোবাজী ব্যাপকভাবে সমাজের সকল মানুষকেই স্পর্শ করতে চেয়েছেন। শ্রমিকদের শ্রমদান আর বুদ্ধিজীবী শিক্ষক, ডাক্তার, উকিল প্রভৃতিদের বুদ্ধিদান করার আহ্বান জানালেন। বিপ্লবের মাত্রা যত ব্যাপক হবে তত তা সমাজ পরিবর্তনের উপযোগী হবে। সমাজের জন্য স্বেচ্ছায় দান দিয়ে যাওয়া—বিপ্লবের এ এক অভিনব কার্যক্রম। সেজন্য দেশ বিদেশ হতে উৎসাহী ছাত্র, যুবক, অধ্যাপক প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা আসছেন এই অভূতপূর্ব বিপ্লবের কৌশল পর্যবেক্ষণ করতে, বিচার করতে। গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ বা সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ন্যায় আজ বিনোবাজীর এই আর্থিক সমতাবিধানের আন্দোলনও বিশ্বব্যাপী হতে চলেছে। বিনোবাজী তো বলেন, যে দেশে ভূমি কম, প্রতিবেশী কোন জনবহুল দেশের অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে স্বেচ্ছায় সেই ভূমিতে বসবাসের আহ্বান জানানো উচিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অস্ট্রেলিয়ার উচিত জাপানের উদ্বৃত্ত জনসংখ্যাকে গ্রহণ করা। ভূদান, সম্পত্তিদান, শ্রমদান প্রভৃতি আন্দোলন এই অর্থে আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করছে।

এই প্রসঙ্গে গ্রামদান আন্দোলন সম্পর্কে কিছু বিশদ বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন আছে। ভূমিক্রান্তি বা ভূমিবিপ্লবের পরিণত রূপ

হচ্ছে গ্রামদান। অহিংস গ্রামস্বরাজ নির্মাণের যে কল্পনা গান্ধীজী বহুপূর্বে করেছিলেন, গ্রামদান হবে সেই গ্রামস্বরাজের ভিত্তি। ভূমিবানদের নিকট হতে ভূমিদান গ্রহণের দ্বারা যে বিপ্লবের সূচনা, ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ করে সমগ্র গ্রামের জমিতে গ্রামসমাজের মালিকানা স্থাপন করাই হবে তার স্বাভাবিক পরিণতি। শোষণহীন, স্বাবলম্বী তথা সহযোগী গ্রাম গণতন্ত্র গঠনের জন্য স্বার্থভাবনার বদলে গ্রামভাবনা ও সমাজচেতনার বিশেষ প্রয়োজন। দুই একটি অর্থশালী পরিবার গ্রামের মধ্যে একটি কি দুটি ধানভানা কল বা অন্য কোন প্রকারের ব্যবসা শুরু করলে সমগ্র গ্রাম এর দ্বারা উপকৃত হয় না। ব্যক্তিগত উন্নতির চিন্তাকে সামূহিক কল্যাণভাবনায় পরিণত করাই হবে সমাজ উন্নয়নের সূত্র। অর্থাৎ, আমরা সাধারণতঃ পরিবারের উন্নতির চিন্তায় আবদ্ধ থাকি। গ্রামদানের অর্থ হবে পরিবারভাবনার সম্প্রসারণ করা বা গ্রাম পরিবার সৃষ্টি করা। সকলের সুখে সুখী হওয়ার সঙ্গে সকলের দুঃখের অংশের সহভোগী হওযা।

এখন দেখা যাক গ্রামদান আন্দোলনের মুল সূত্র কি কি? বর্তমানে গ্রামদান আন্দোলনকে আরও বেগবান করার উদ্দেশ্যে বিনোবাজী নিম্নোক্ত চারটি সর্ত পালন করলেই সেই গ্রামকে গ্রামদান বলে ঘোষণা করেন (সুলভ গ্রামদান)—

(১) ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা থাকবে না। গ্রাম সমাজের মালিকানায় সকল জমি থাকবে।

(২) ভূমির $\frac{১}{২০}$ অংশ দান দিতে হবে গ্রামের ভূমিহীন কৃষকদের জন্য; অর্থাৎ এক বিঘায় এক কাঠা ভূমিদান। বাকী জমি জমির মালিক চাষাবাদের দ্বারা ভোগ করবেন।

(৩) ফসলের অংশ হতে গ্রামের উন্নয়ন কাজের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজি নির্মাণের উদ্দেশ্যে $\frac{১}{২০}$ বা $\frac{৩}{২০}$ অংশ ফসল গ্রামসভার হাতে অর্পণ।

(৪) প্রতি পরিবার হতে একজন প্রতিনিধি নিয়ে গ্রামসভা গঠন। গ্রামসভার কাজ সর্বসম্মতি অথবা সর্বানুমতি ক্রমে চলবে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদ করে

বিনোবাজী কি সাম্যবাদী রাষ্ট্রের ন্যায় যৌথ সামূহিক প্রথা প্রবর্তনে প্রয়াসী? ব্যক্তিগত মালিকানায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমির টুকরো নিয়ে আজ মৃতপ্রায় পল্লীগুলিতে মামলা-মোকদ্দমা, জাল-জুয়াচুরি, বেনামী হস্তান্তর প্রভৃতি বহুবিধ প্যাঁচে সাধারণ মানুষ ভীষণভাবে নিপীড়িত হচ্ছে, সমাজে নীতি ও সততার কোন মর্যাদা রক্ষিত না হওয়ায় নৈতিক মান খুব নীচে নেমে গেছে। গ্রামদানের ফলে জমির কেনাবেচা বা বন্ধক-রাখা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। গ্রামের জমি সকলের। ভূমি লক্ষ্মীস্বরূপা। আজ যে ভূমি ক্রয় করছে কিছুদিন পরেই অবস্থার বিপাকে তাকেই হয়ত তা বিক্রী করতে হচ্ছে। এভাবে সুযোগসন্ধানী ধনবানের হাতে ভূমি ক্রমেই নিবদ্ধ হওয়াতে দেশে ভূমিহীন কিষাণের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। উৎপাদকের হাতে উৎপাদনের সাধন বা উপাদান না থাকলে উৎপাদন ব্যাহত হতে বাধ্য। এ সকলের মিলিত প্রতিক্রিয়ায় গ্রামীণ অর্থনীতিকে ক্রমেই জীর্ণ করে দিচ্ছে। গ্রামদানের ফলে গ্রামজীবনের এই আর্থিক, নৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক অধোগতি রুদ্ধ হবে। গ্রামজীবনের সর্বাঙ্গীণ পুনরুজ্জীবনের পথ সুগম হবে। বনে জঙ্গলে পশুরা যেমন আলাদা থাকে, দুর্বলকে নিধন করে পুষ্ট হয়, সেভাবে যদি আমরাও গ্রামে থাকি, একে অন্যের কথা চিন্তা না করি, তবে গ্রামের কোন উন্নতি হবে না। সেজন্য সকলকে এক হয়ে যেতে হবে। ভুমিহীনদের ভূমি দিয়ে, তাদের আপন পরিবারভুক্ত করে নিয়ে জমির মালিকানা গ্রামসভাকে সমর্পণ করতে হবে। তা হতে যা আয় হবে তার একটি অংশ গ্রামসভাকে দিয়ে গ্রামের মূলধন সৃষ্টি করতে হবে। এ সম্বন্ধে বিনোবাজী একটি অতি মূল্যবান উদাহরণ দেন: "আজকের অবস্থা কি? মূলধন আছে দিল্লীতে, কলিকাতায় ও ঘরে। গ্রামের কোন মূলধন নেই। এর অর্থ কি হল? দিল্লীতে পুঁজি আছে, তাই দেশ আছে। কলকাতায় পুঁজি আছে, তার জন্যে প্রদেশ আছে। কিন্তু গ্রামের কোন পুঁজি নেই। তাই আজ গ্রামও নেই।"[১]

অন্য আর এক দিকের চিত্র দেখা যাক। উৎপাদন বাড়াতে হবে

১ ভূদান যজ্ঞ, ১৮. ৫. '৬৩

এ কথা ঠিক। সঙ্গে সঙ্গে গরীবদের তাদের অংশ পাওয়া উচিত। তবে ফসল বাড়াবার জন্য তারা উৎসাহিত হবে। নচেৎ ফসল বাড়ল আর তা গ্রামের বাইরে চলে গেল, গ্রামবাসীদের অভাবের সময় মহাজনদের কাছ হতে আবার বেশী দামে তা কিনে আনতে হল—এতে করে গ্রামবাসীরা শোষিত হয়েই চলেছে। শোষণের এই অবাধ বাণিজ্য বন্ধ করতে হবে। সমগ্র গ্রামের মঙ্গলের কথা ভাবতে হবে।

গ্রামদানী গ্রামে গ্রামসভার উপরে এই প্রকারের সর্ববিধ দায়িত্ব এসে পড়বে। অর্থাৎ পরিবারে মাতার ন্যায় গ্রামসভা গ্রামমাতার স্থান নেবে। সকলের অভাব অভিযোগের দিকে দৃষ্টি দেবে। কোন পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তি হঠাৎ মারা গেলেও এখনকার মত তার সন্তানেরা অনাথ হবে না। গ্রামসভাই সে শূন্যস্থান পূরণ করবে। এইভাবে পবিবার ভাবনায় প্রীতি স্নেহ মমতার সম্প্রসারণ হবে। ফলে, পরস্পরের মধ্যে একটি প্রেমের সম্পর্ক স্থাপিত হবে। সমগ্র গ্রাম এক পরিবারের মত বাস করবে। গ্রামের সকল কর্মক্ষম ব্যক্তির কাজের ব্যবস্থা করা, শিক্ষা স্বাস্থ্য শিল্প বাসস্থান প্রভৃতির জন্য গ্রামের সর্বাঙ্গীণ পরিকল্পনাও করবে গ্রামসভা। বিকেন্দ্রিত সমাজ সংগঠনের জন্য এরূপ গ্রামসভাই হবে কার্যকরী পরিষদ। গ্রামের সামূহিক শক্তি বিকাশের পক্ষেও গ্রামসভা উত্তম মাধ্যম স্বরূপ হবে। এইভাবে সর্বোদয় সমাজ গঠনের জন্য যেমন প্রাথমিক একক হবে গ্রামদানী গ্রাম, তদ্রূপ গ্রামদানী গ্রামে মুল সংগঠনী পরিষদ হবে গ্রামসভা। এই নূতন সমাজব্যবস্থায় সামূহিক শক্তির যেমন বিকাশ দেখা যাবে, তদ্রূপ ব্যক্তিগত উদ্যম ও অভিক্রমও প্রতিফলিত হবে। পুঁজিবাদের অনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারিতা কিংবা সাম্যবাদের অতি-নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রীয় স্বেচ্ছাচারিতাও থাকবে না। তাই বিনোবাজী বলেন, "গ্রামদানে কমিউনিজমের গুণ আছে, দোষ নাই। এটি বুঝে নিতে হবে। এ ধরনের গ্রামদান যদি হয় তবে সমস্ত কমিউনিজমকেই গিলে ফেলা হবে এবং তা হজম হয়ে যাবে।"[১] অহিংসার এই হচ্ছে

১ ভূদানযজ্ঞ, ২২. ১২. '৬

বৈশিষ্ট্য। সাম্যবাদের ভীতি এরূপ সক্রিয় অহিংসা নীতির মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে। গ্রামদানকে তাই বিনোবাজী 'ডিফেন্স মেজার' (প্রতিরক্ষার উপায়) রূপে বর্ণনা করেন।

বেশ কয়েক বছর আগেই বিনোবাজী এর গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। বর্তমানে বিদেশী আক্রমণের ফলে আমাদের চিন্তা ভাবনা পরিকল্পনায় এক প্রচণ্ড আলোড়ন এসেছে। প্রতিরক্ষার জন্য জনগণ দান দিয়েছে স্বর্ণালঙ্কার, অর্থ ইত্যাদি। অন্য দিকে করের বোঝা বেড়েছে, ভবিষ্যতে হয়ত আরও বাড়তে পারে। কিন্তু তারও একটা সীমা আছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের আক্রমণের ভয়ে এদিকে সৈন্যবল বাড়াতে হচ্ছে; উন্নয়ন প্রকল্পগুলি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও দেশে যদি ব্যাপক দারিদ্র্য, বেকারি ও ক্ষুধার জ্বালা থাকে তবে হাজার সৈন্যশক্তি বাড়ালেও জনগণের মনোবল ভেঙে পড়তে পারে আর তার ফলে দেশরক্ষার প্রস্তুতি দুর্বল থেকে যাবে। সেনাদল যেমন একটি বল, তেমনি সুখী ও মনোবলে সমৃদ্ধ গ্রামসমষ্টিও অন্যতম বল। গ্রামের সংহতি তথা জনশক্তি সৃষ্টির জন্য গ্রামদান একটি উৎকৃষ্ট উপায়। এজন্য প্রতিরক্ষার প্রশ্ন যেখানে জরুরী, সেখানে গ্রামদানের মাধ্যমে খাদ্য ও বস্ত্রে দেশকে স্বাবলম্বী করে তোলার কাজকে গৌণরূপে গণ্য করা বিপজ্জনক হবে। অহিংস পন্থায় গ্রামদানই হবে উপযুক্ত প্রতিরক্ষা প্রাচীর। বর্তমানে দলীয় রাজনীতির দুষ্টচক্রে দেশের সর্বত্র যেভাবে বিভেদ, বিদ্বেষ ও দলাদলির মনোভাব ব্যাপ্ত হচ্ছে তার প্রতিকারের উপায় স্বরূপ গ্রামদানের নীতিতে বলা হয়েছে যে, সকল সিদ্ধান্তই সর্বসম্মতি অথবা সর্বানুমতিক্রমে গৃহীত হবে। সংখ্যাধিক্যের ভোটের জোরে সংখ্যালঘুর কল্যাণভাবনাকে পদদলিত করার বর্তমান যে পদ্ধতি প্রচলিত আছে তা খুবই ক্ষতিকারক। সেজন্য বিনোবাজী বলেন, বর্তমানের এই রাজনীতির বদলে লোকনীতির প্রচলন হোক। আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক দিক হতে গ্রামের পূর্ণাঙ্গ পুনর্গঠনে গ্রামদান বর্তমান যুগে একটি উত্তম কার্যকর পন্থা।

দলমতনির্বিশেষে ভারতের সকল প্রধান রাজনৈতিক দলই

গ্রামদানকে স্বাগত জানিয়েছেন। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তাই ভারতভূমিতে এই নূতন পদ্ধতির পূর্ণ প্রয়োগ হওয়া বাঞ্ছনীয়। স্বেচ্ছায় মালিকানা বিসর্জন দিয়ে পরিবারভাবনার সম্প্রসারণ করে সহযোগী শোষণহীন ও বিকেন্দ্রিত গ্রাম-গণতন্ত্র গঠন করাই গ্রামদান আন্দোলনের লক্ষ্য বলা যায়। এইরূপ গ্রাম-গণতন্ত্রের স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বিনোবাজী একটি সুন্দর উপমা দিয়ে বলেছেন—

"ডালিমের দানাগুলি আলাদা আলাদা থাকে ও রসে পূর্ণ থাকে; কিন্তু কোন দানা অন্য কোন দানাকে আক্রমণ করে না এবং প্রত্যেকের নিজস্ব স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। অথচ সমস্ত দানাগুলি একই ডালিমের মধ্যে থাকে।"[১] তদ্রূপ, আমাদের গ্রামসমূহ স্বাবলম্বী স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রেখে প্রয়োজনবোধে পরস্পরাবলম্বী হতে পারে।

'হিন্দ্ স্বরাজ' পুস্তিকায় গান্ধীজী বহুকাল পূর্বে যে সমাজ-সংগঠনের রূপরেখা দিয়েছিলেন, তার কর্মের দ্বারা যে বিকেন্দ্রিত সমাজের ভিত্তি স্থাপন করে গিয়েছিলেন, আজ বিনোবাজী গান্ধী-কল্পনার সেই আদর্শ সমাজব্যবস্থার বাস্তব রূপায়ণের কাজে একজন অভিনব ক্রান্তিকারী পুরুষ।

ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের চাকায় এক নূতন সমাজ ও সভ্যতার জন্ম হল, যা কেন্দ্রিত শিল্প ও শাসন ব্যবস্থার দ্বারা পৃথিবীর এক বৃহৎ জনসমষ্টিকে নির্মমভাবে শোষণ করে উন্নতির উচ্চ শিখরে আজ আরূঢ় হয়েছে। মানবদরদী সত্যদ্রষ্টা পুরুষ গান্ধীর চোখে তা নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন প্রতীয়মান হওয়ায় তিনি এক নূতন সমাজ রচনার উদ্দেশ্যে অভিনব পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ শুরু করেছিলেন। বিশ্বের সমাজ-শাস্ত্রীরা আজ তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। অতি বৃহৎ জটিল সমাজ-কাঠামোর স্থলে স্ব-নিয়ন্ত্রিত ও সুপরিচালিত ক্ষুদ্র মানবগোষ্ঠীর সমাজ[২] সংগঠনের মধ্যেই ভাবীকালের সমাজ নির্মাণের চিন্তা আজ চলছে।[৩]

---

১ ভূদানযজ্ঞ, ১৮. ৫. '৬৩

২ Face to-face Community

৩ Community of the Future—Dr. Morgan.

আর্থিক ব্যবস্থার উপর সমাজের রূপরেখা বহুলাংশে নির্ভরশীল। শোষণহীন, সহযোগী ও স্ব-নিয়ন্ত্রিত সমাজের জন্য মূলতঃ বিকেন্দ্রিত আর্থিক ব্যবস্থা অপরিহার্য। বিজ্ঞানের কল্যাণকর অবদান নিশ্চয়ই এতে সাদরে গৃহীত হবে। ভারতে গান্ধীজীর উত্তরসাধকরূপে আচার্য বিনোবাজী গ্রামস্বরাজ রচনার উদ্দেশ্যে এক 'সৌম্যতর সত্যাগ্রহ' অভিযানে রত। গ্রামদান গান্ধী-কল্পনার গ্রাম-গণতন্ত্রের মৌলিক এককরূপে বিকশিত হবে এরূপ আশা করা যায়।

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট—ক

খাদির নব পর্যায়

আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে ভারতে খাদি আন্দোলন অর্ধশতাব্দী কাল অতিক্রম করবে। অহিংস অসহযোগের নব পর্যায়ে গান্ধীজী চরখাকে জাতীয় আন্দোলনের কার্যসূচীতে গ্রথিত করায় পল্লীর কুটিরের নীরব চরখা নূতন মর্যাদায় ঝলসিত হয়ে উঠল। সে ইতিহাস ছিল ১৯২০ সালের।

ভারতের অবনত দুঃস্থ গ্রামবাসীদের হাতে ক্ষুধার অন্ন জোগাবার একটি সহজ উপায় স্বরূপ এই চরখা দেখা দিল দারিদ্র্যমুক্তির হাতিয়ার রূপে। ক্রমেই গান্ধীজীর কাছে এটা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, ভারতের আর্থিক পুনর্গঠনের জন্য গ্রামের পুনরুজ্জীবন সর্বাগ্রে প্রয়োজন। সেইজন্যই তাঁর চরখা ও অন্যান্য গ্রামশিল্পের পরিকল্পনা। চরখা তাই গান্ধী-কল্পনার গ্রামস্বরাজ প্রতিষ্ঠার কাজে অদ্যাবধি এক অপরিহার্য অঙ্গ।

স্বাধীনতার পরের যুগে দেশে পরিকল্পিত উন্নয়নের অভিযান শুরু হওয়ার সঙ্গে খাদি ও পল্লী শিল্পের ক্ষেত্রেও তার ঢেউ এসে লেগেছে। নিম্নের পরিসংখ্যাণ হতে প্রতীয়মান হবে বিভিন্ন প্রকার খাদির উৎপাদন, বিক্রয় প্রভৃতিতে প্রগতির হার খুবই আশাপ্রদ।

	১৯৫৩-৫৪	১৯৬১-৬২	বৃদ্ধির হার
উৎপাদন (কোটি বর্গগজ)	১·১৫	৭·৬২	৬০০%
বিক্রয় (লক্ষ টাকা)	১২৯·৭৮	১৮৭৭·৫৪	১৩৪৪%
কর্ম সংস্থান	৩,৭৮৬০০	১৭,৪৬২০০	৩৬৪%

বর্তমানে সারা দেশে খাদির কাজে নিযুক্ত ছোট বড় সংস্থার সংখ্যা দেড় হাজারেরও অধিক। প্রায় ২৫,০০০ এর বেশী সংখ্যক কর্মীসহ প্রায় একলক্ষ গ্রামে বারো-তেরো লাখ কাটুনী ও একলাখ তাঁতী খাদির কাজে নিযুক্ত। ব্যাঙ্ক ও ইনসিওরেন্স জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাদ দিলে বর্তমানে খাদি গ্রামোদ্যোগ সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি দেশে বৃহত্তম আর্থিক প্রতিষ্ঠান বলা যায়।

খাদির এই প্রভূত প্রগতি সত্ত্বেও মৌলিক নীতির দৃষ্টিতে অর্থাৎ স্বাবলম্বী গ্রামস্বরাজ নির্মাণের পথে আমরা কতটুকু অগ্রসর হতে পেরেছি এরূপ প্রশ্ন গান্ধীবাদী কর্মীদের মনে কিছুকাল যাবৎই দেখা দিয়েছে। বিকেন্দ্রিত শিল্প

সংগঠনের দ্বারা গ্রামে গ্রামে কিছু ভোগ্যপণ্য উৎপাদন করাই গান্ধীজীর দৃষ্টিতে যথেষ্ট ছিল না। তাঁর কথায় বলা যায়, "আমার লক্ষ্য কেবল মাত্র খাদির কাজ করাই নয়। পরন্তু গ্রামবাসীর জীবনে প্রবেশ করাই আমার লক্ষ্য।" (Khadi—Why & How)

প্রায় দশবছর কাল ভারত সরকার খাদি শিল্পের উন্নতিবিধানের উদ্দেশ্যে সুতি খাদি বস্ত্রে টাকায় তিন আনা হিসাবে (দশমিক পদ্ধতি প্রবর্তনের পর কুড়ি নয়া পয়সা হারে) বিক্রয় রিবেট প্রদান করে আসছেন। কিন্তু এর ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে নূতন উদ্দীপনা বা উৎসাহের সঞ্চার হয়নি। পল্লীবাসীর জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে খাদি গ্রামের আর্থিক পুনর্গঠনের বাহক হতে সক্ষম হয়নি। সেজন্য ১৯৫৮ সালে মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত চালিশ-গাঁও কর্মী সম্মেলনে আচার্য বিনোবাজী খাদির নব রূপায়ণের প্রস্তাব করে বলেন যে, গ্রামকে পরিকল্পনার প্রাথমিক একক স্বরূপ গণ্য করে গ্রামের প্রয়োজনের দৃষ্টিতে খাদির উৎপাদন হবে, কেবলমাত্র উদ্বৃত্ত দ্রব্যই গ্রামের বাইরে যাবে। অবসর সময়ে আপন প্রয়োজনের জন্য গরীব কিষাণেরা যে সুতা কাটবে তা যদি রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে মাথাপিছু ১২ গজ হিসাবে কাপড় বুনে দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায় তবে গ্রামবাসীরা নিজ নিজ বস্ত্র উৎপাদনের দিকে যেমন অধিকতর আগ্রহশীল হবে তেমনই এর ফলে গ্রামীণ অর্থনীতি শহরের কবল হতে মুক্ত হয়ে আত্মনির্ভরশীল হতে পারবে। এই প্রস্তাবের তাৎপর্য এই ছিল যে, কোন্ প্রগতিশীল রাষ্ট্রে সর্বজনীন শিক্ষার ন্যায় সর্বজনীন বস্ত্র উৎপাদনের ব্যবস্থা করাও সরকারের কর্তব্য।

কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রামের গরীব মেয়েরা মজুরির পরিবর্তে সুতা কাটে। সেজন্য কোথাও একটু বেশী মজুরী পেলেই কাটুনীরা মাটি কাটা বা অন্য কাজে চলে যেতে দ্বিধাবোধ করে না। সেজন্য গ্রামীণ অর্থনীতিতে সুতাকাটা বর্তমানে কৃষি-বহির্ভূত একটি সাময়িক পেশারূপে মাত্র আদৃত হয়েছে। খাদি অর্থনীতির যেটি মূল কথা—'উৎপাদন ও বণ্টনের বিকেন্দ্রীকরণের দ্বারা খাদি যেখানে উৎপন্ন হবে তার নিকটতম স্থানেই তা ব্যবহৃত হবে'—এই নীতির বাস্তব প্রয়োগ তাই তেমন ফলবতী হয়ে ওঠেনি। গ্রামে উৎপন্ন খাদি প্রধানতঃ শহরের সুদৃশ্য ভাণ্ডারে বিক্রয়ার্থে প্রেরিত হবে খাদির উদ্দেশ্য তা নয়। যিনি সুতা কাটবেন তিনি খাদি পরিধান করবেন গান্ধীজীর এই আদর্শ হতে আমরা বহু দূরে রয়েছি। কৃষিজ উৎপাদনের সঙ্গে চাষীর যে সম্পর্ক, বস্ত্র উৎপাদনের বেলায় বস্ত্রের সঙ্গে গ্রামীণ জনতার সেরূপ

সত্যকার সম্বন্ধ স্থাপিত হোক। খাদি গ্রামবাসীর জীবনের সঙ্গে যুক্ত হোক। তখনই গ্রামস্বরাজ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে।

খাদির এই সামাজিক তথা আর্থিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য রাষ্ট্রীয় সহায়তা এমনভাবে আসা উচিত যাতে তা যেন উত্তরোত্তর খাদির অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশের সহায়ক হয়, গ্রামবাসীর আর্থিক স্বাবলম্বন অর্জন সহজসাধ্য হয়। সম্পদ উৎপাদন ও ন্যায্য বণ্টনের দ্বারা ন্যায়ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা রচনা করাই যেখানে পরিকল্পনার লক্ষ্য, সেখানে গ্রামগুলি এইভাবে খাদ্য ও বস্ত্রে সুব্যবস্থিত হলে দেশে আর্থিক ভারসাম্য সুরক্ষিত হবে। গ্রামকেন্দ্রিত খাদির নবরূপায়ণকে বিনোবাজী 'গ্রামাভিমুখী খাদি' রূপে অভিহিত করেছেন। গত ৬ই এপ্রিল জাতীয় সপ্তাহের শুভদিন হতে সমগ্র দেশে রিবেটের পরিবর্তে বুনাই ব্যয় মুক্ত করার এই প্রস্তাব কার্যকর হয়েছে।

রিবেট প্রথা বন্ধ হলে খদ্দরের মূল্য বেড়ে যাবে বলে কেউ কেউ আশঙ্কা প্রকাশ করেন আর এর ফলে খদ্দরের বিক্রয় হ্রাস পেয়ে উৎপাদন তথা কর্ম সংস্থানের ক্ষেত্রেও মন্দা আসতে পারে বলে অনেকের ধারণা। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে, আশঙ্কাগুলি একেবারেই অমূলক। এই নূতন প্রস্তাবের ফলে সুবিধাজনক পরিবর্তন কি কি দেখা দেবে?

১) যে চাষী নিজে তূলা উৎপন্ন করে সূতা কাটবেন, তিনি আপন শ্রমের বিনিময়ে প্রায় বিনামূল্যেই কাপড় পাবেন। এর ফলে গরীব চাষীর গৃহে খাদ্যের সঙ্গে বস্ত্র সুলভ হবে।

২) যিনি সূতা কাটবেন তিনি তুলার মূল্যেই কাপড় পাবেন।

জাতীয় নমুনা সমীক্ষায় পল্লীবাসীর আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে যে ভয়াবহ তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে তাতে কিংবা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর একটি সাম্প্রতিক উক্তিতেও প্রকাশ যে, গ্রামে বাস করে এরূপ সত্তর জন অধিবাসী দিনে পঞ্চাশ নয়াপয়সার কম ব্যয় করতে সমর্থ। এই শোচনীয় অবস্থার পরিবর্তন সাধনে বহুলাংশে সহায়ক হবে এই নূতন প্রস্তাব। সেজন্য গ্রামবাসীর কাছে আজ এই ধ্বনি তুলতে হবে—'তূলার মূল্যে কাপড় পরুন'। ফলে অধিকতর লোক সূতা কেটে কাপড় তৈরী করার জন্য উৎসাহিত হবে।

৩) সূতা কাটেন না এমন গ্রামবাসীরা গ্রামে উৎপন্ন খদ্দর মিলের বস্ত্রের তুলনায় সস্তা মূল্যে (ব্যবস্থাপনার ব্যয় কম হওয়ায়) পেতে পারেন। ফলে পল্লী অঞ্চলে খদ্দরের চাহিদা ও বাজার বৃদ্ধি পাবে।

৪) অবশেষে সূতা কাটেন না এমন শহরবাসীরাও নিঃশুল্ক বুনাই

ব্যবস্থার ফলে বর্তমানের মূল্যেই (রিবেট বাদে) খদ্দর পাবেন। সেজন্য রিবেট বন্ধ হওয়ার ফলে মূল্যবৃদ্ধি বা বিক্রয় হ্রাস পাওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকবে না। গ্রামীণ অর্থনীতিকে পুষ্ট করার কাজে নিঃশুল্ক বুনাই প্রস্তাব যেমন অতিশয় কল্যাণদায়ক হবে, তেমনি শহরবাসীরাও এতে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। কেন না রাষ্ট্রের সহায়তা পূর্বের ন্যায় থাকছে। কেবলমাত্র সহায়তা দানের পদ্ধতির পরিবর্তন করা হচ্ছে।

৫) দেশের প্রতিটি পল্লী যদি খাদ্য ও বস্ত্রের ন্যায় জীবনধারণের অত্যাবশ্যক মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা করে নিতে সমর্থ হয় তখন সমগ্র দেশের প্রতিরক্ষার দৃষ্টিতে গ্রামগুলি হবে এক একটি শক্তিশালী স্বয়ংসম্পূর্ণ দুর্গের ন্যায়। গ্রাম পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা তাই পূর্বাপেক্ষা এখন সর্বাধিক অনুভূত হচ্ছে।

৬) গত কয়েক বছরে খাদির উৎপাদন এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে বিক্রি বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও উদ্বৃত্ত স্টক অবিক্রীত থেকে যাচ্ছে। এই অবস্থা যে কোন শিল্পের প্রগতির পক্ষেই মারাত্মক। গ্রামে উৎপন্ন খাদির অধিকাংশের বিপণন ব্যবস্থা যদি গ্রামাঞ্চলেই হয় তবে অবিক্রীত স্টকের সমস্যাও লোপ পাবে।

আর্থিক সমতাবিধানের কাজ ভারতের সাড়ে পাঁচ লাখ গ্রামে এখনও বাকী। দেশে সম্পদ বৃদ্ধির সঙ্গে যদি ধনবৈষম্যও অধিকতর হারে বৃদ্ধি পায় তবে তার দ্বারা জাতির সামগ্রিক কল্যাণ হবে না। স্বাধীনতার দেড় দশক পরেও গ্রামগুলি খাদ্য বস্ত্র · স্বাস্থ্য বাসস্থান ও শিক্ষার ক্ষেত্রে চরম অবহেলিত। এই অবস্থা চলতে থাকলে বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। তাই গ্রাম পুনর্গঠনের দুরূহ কর্মে বিকেন্দ্রিত বস্ত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে 'তুলার মূল্যে কাপড় পরুন' এই নূতন ব্যবস্থা ফলপ্রসূ হলে দেশের কৃষিপ্রধান অর্থনীতি নূতন প্রাণের স্পন্দনে ঝংকৃত হয়ে উঠবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

পরিশিষ্ট—খ

খাদির ক্রমবিকাশ

১৯০৮	গান্ধীজীর মনে চরখার কল্পনা।
১৯০৯	'হিন্দ্ স্বরাজে' চরখার উল্লেখ।
৬ই জানুয়ারী ১৯১৫	আফ্রিকা হইতে গান্ধীজীর ভারতে আগমন ও চরখার অনুসন্ধান।
১৯১৬	কোচরাব আশ্রমে হস্তচালিত তাঁতের কাজ আরম্ভ।
১৯১৭	হস্তচালিত তাঁতে মিলের সূতায় কাপড় প্রস্তুত।
১৯১৮	খাদির জন্ম—হাতে কাটা-সূতায় হাতে বুনাই কাপড় প্রস্তুত।
ডিসেম্বর ১৯১৯	অমৃতসর কংগ্রেসে হাতে কাটা সূতায় হস্তচালিত তাঁতে বস্ত্রবয়নের প্রস্তাব গ্রহণ।
সেপ্টেম্বর ১৯২০	কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে ঘরে ঘরে চরখা চালাইবার প্রস্তাব গৃহীত হয়।
ডিসেম্বর ১৯২০	নাগপুর কংগ্রেসে বিদেশী বস্ত্র বহিষ্কারের প্রস্তাব।
১লা এপ্রিল ১৯২১	অখিল ভারত কংগ্রেসের বিজয়ওয়াড়া অধিবেশন—এক কোটি টাকার তিলক স্বরাজ্য ফাণ্ড ও ২০ লক্ষ চরখার প্রচলনের প্রস্তাব।
এপ্রিল ১৯২১	খাদির ত্রিবর্ণ পতাকার মাঝখানে চরখার স্থান।
নভেম্বর ১৯২১	দিল্লী কংগ্রেসে প্রস্তাব—সদস্যদের খাদি পরিধান করিতে হইবে।
মে ১৯২২	গয়া কংগ্রেসে খাদি প্রস্তাব।
এপ্রিল ১৯২৩	নাগপুরে পতাকা সত্যাগ্রহ।
জুলাই ১৯২৩	আমেদাবাদে এ, আই, সি, সির সভায় কংগ্রেসের সদস্যদের উপর সূতা কাটিবার সর্ত আরোপ।
ডিসেম্বর ১৯২৩	কোকনাদ কংগ্রেসে অখিল ভারত খাদি সমিতি স্থাপিত।
ডিসেম্বর ১৯২৪	বেলগাঁও কংগ্রেসে কাতাই ভোটাধিকারের প্রস্তাব।
২৪শে ডিসেম্বর ১৯২৫	চরখা সঙ্ঘ স্থাপন (সভাপতি—মহাত্মা গান্ধী, সম্পাদক—শংকরলাল ব্যাংকার ও জওহরলাল নেহরু)।
১৯৩৫	চরখা সঙ্ঘের জীবন বেতন ও বস্ত্র স্বাবলম্বনের উপর গুরুত্ব আরোপ।
সেপ্টেম্বর ১৯৪৪	চরখা সঙ্ঘের নবসংস্করণ।
১৯৪৬	সমগ্র গ্রাম সেবা বিদ্যালয় আরম্ভ।
নভেম্বর ১৯৪৮	সর্বসেবা সঙ্ঘ স্থাপন।
ফেব্রুয়ারী ১৯৫৩	ভারত সরকার কর্তৃক খাদি গ্রামোদ্যোগ বোর্ড স্থাপন।
১.ই.মার্চ ১৯৫৩	সর্বসেবা সঙ্ঘে চরখা সঙ্ঘের বিলীনীকরণ।
জুলাই ১৯৫৬	অম্বর চরখা প্রবর্তন।
এপ্রিল ১৯৫৭	খাদি গ্রামোদ্যোগ কমিশন গঠিত।
ফেব্রুয়ারী ১৯৬৩	নবদ্বীপধামে বিনোবাজীর খাদির নব পর্যায় সম্বন্ধে পরামর্শ দান।
৬ই এপ্রিল ১৯৬'	খাদির নূতন পরিকল্পনা—গ্রামাভিমুখী খাদি বিক্রয়ের উপর রিবেটের বদলে 'বিনা ব্যয়ে বুনাই'য়ের আরম্ভ।

পরিশিষ্ট—গ

গ্রন্থসূচী

1. India of My Dreams, 1st Ed.—M. K. Gandhi
2. Cent percent Swadeshi. 3rd Ed.— ,,
3. Towards Non-violent Socialism, 1st Ed.— ,,
4. Khadi—Why & How, 1st Ed.— ,,
5. Ideology of Charkha, 2nd Ed.— ,,
6. Rebuilding Our Villages, 1st Ed. ,,
7. Why the Village Movement, 5th Ed.—J. C. Kumarappa
8. Economy of Permanence, Part I, II, 1st Ed.— ,,
9. Basic National Recovery, 1st Ed.—M. P. Desai
10. Why Khadi & Village Industries. 1st Ed.—Vithaldas Kothari
11. Studies in Gandhism, 2nd Ed.—Prof. N. K. Bose
12. Planning for Sarvodaya, 1st Ed.—Sarva Seva Sangh
13. Economic Aspects of Sarvodaya, 1st Ed.— ,,
14. The Paths of Planned Economy in India, 1st Ed.— ,,
15. Gandian Thought, 1st Ed.—Acharya J. B. Kripalani
16. Gandhism Reconsidered, 2nd Ed.—Prof M. L. Dantwala
17. Capitalism, Socialism or Villagism—Bharatan Kumarappa
18. Reconstruction of Society through Trusteeship, 1st Ed. —K. M. Munshi
19. A Philosophy of Indian Economic Development, 1st Ed. —Richard Gregg
20. Roots of Economic Growth, 1st Ed.—E. F. Schumacher
21. Twentieth Century Socialism—British Labour Party
22. Essays on Economic Development, 1st Ed.—Prof. Amlan Dutt
23. Paths to Economic Growth, 1st Ed.— ,,
24. Problems of Economic Growth—Congress for Cultural Freedom, 1960
25. The Community of the Future & the Future of the Community, 1st Ed.—Arthur Morgan
26. Gandhian Economic Philosophy, 1st Ed.—Bepin Behari
27. ভূদানযজ্ঞ কি ও কেন—৩য় সং—শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারী
28. গ্রামদান— ১ম সং— ঐ
29. সর্বোদয় ও শাসনমুক্ত সমাজ—১ম সং—শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
30. গান্ধী মত ও পথ—১ম সং—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

গান্ধী স্মারক নিধি (বাংলা)-র প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

মহাত্মা গান্ধী	৬·৫০ ৫·৫০
সর্বোদয়	২·৫০
সর্বোদয় ও শাসনমুক্ত সমাজ	২·৫০
পল্লী-পুনর্গঠন	৩·০০
সত্যই ভগবান (২য় সংস্করণ)	৩·০০
নারী ও সামাজিক অবিচার (৩য় সংস্করণ)	৪·৫০
গীতাবোধ	১·৫০
পঞ্চায়েত রাজ	০·৭৫
অছিবাদ	০·৬২
আমার সমাজবাদ	১·০০
অহিংসার পথে বিশ্বশান্তি	১·০০
উৎপাদক শ্রম	০·৬০
কর্মের সন্ধান	০·৭৫